প্রথম সংস্করণ—১৯০১
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯২৩

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রাকর
সরস্বতী প্রেস
১২, পটুয়াটলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদশিল্পী
ধীরেন শাসমল

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দাদা মহাশয়ের

শ্রীচরণ কমলে—

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে পাঠকদের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহার গুণদোষ পরীক্ষা তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত। এই অগ্নিপরীক্ষায় আমি যদি উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। যেমন কবি কালিদাস বলিয়াছেন, লেখক যতই শিক্ষিত হউক না কেন, সুধীগণের সন্তোষ হওয়া পর্য্যন্ত আপনার প্রতি অবিশ্বাস তাহার মন হইতে কখনই অপনীত হইবার নহে—

অপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতগণামাত্মন্যপ্রত্যয়ঞ্চেতঃ॥

শকুন্তলা।

কমলালয়।
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
১৫-৭-১৯২২।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং
গহকারক ! দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং নকাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খযমজ্‌ঝগা।

জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান·
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ,
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

মুখপত্র।

॥ ১ ॥

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"—পুরাকালে ভারতবর্ষে কোটি কোটি লোক এই মন্ত্র উচ্চারণ করে' বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হত। কিন্তু এই ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম কালক্রমে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বুদ্ধ কে তাঁর ধর্ম্ম কি, বৌদ্ধ-সঙ্ঘই বা কি, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কোটিতে একজনও দিতে পারতেন না; কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের এই ত্রিরত্নের স্মৃতি পর্য্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। "বৌদ্ধ" এই শব্দটি অবশ্য আমাদের ভাষায় ছিল, এবং বৌদ্ধ অর্থে আমরা বুঝতুম—একটি পাষণ্ড ধর্ম্ম মত; কিন্তু উক্ত পাষণ্ড মতটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনরূপ ধারণা ছিল না।

সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে; কিন্তু তার কোন বিবরণ নেই। আছে শুধু সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রে এ মতের খণ্ডন। সে খণ্ডন হচ্ছে বৌদ্ধ-দর্শনের। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বাঙলা দেশে যাঁরা দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করতেন, সেই পণ্ডিতমণ্ডলীও বৌদ্ধ-দর্শন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন। সর্ব্বাস্তিবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ, অথবা ভাষান্তরে সৌতান্ত্রিক মত, বৈভাষিক মত, যোগাচার মত ও মাধ্যমিক মতগুলি যে কি, সে সম্বন্ধে অদ্যাবধি এ দেশের পণ্ডিতসমাজের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। শঙ্করাচার্য্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে' বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জন্ম-দাতা এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদকর্ত্তা বলে জগৎ-বিখ্যাত, তাঁর বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে কেন দেওয়া হয়েছে, তা জানতে হলে, শঙ্করের জ্ঞানবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, তা জানা চাই; যা এ দেশের অধিকাংশ দর্শন-শাস্ত্রীরা জানেন না। এখন এই বৌদ্ধ-দর্শন বুদ্ধের দর্শন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং বৌদ্ধদর্শনের বিচার থেকে বুদ্ধদেবের, তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মের এবং তাঁর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই দুদিন আগে আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম।

॥ ২ ॥

আর আজ আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে প্রধানত বৌদ্ধযুগের ইতিহাসই বুঝি—আর হিন্দু কলাবিদ্যা বলতে বৌদ্ধ কলাবিদ্যাই বুঝি। আমরা

হঠাৎ আবিষ্কার করেছি যে (ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগ হচ্ছে এ দেশের সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব-মণ্ডিত যুগ। তাই বৌদ্ধ-সম্রাট অশোক এবং তাঁর অমর কীর্ত্তির দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।) তার পর আমরা সম্প্রতি এও আবিষ্কার করেছি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা সব বৌদ্ধ ছিলেন; বাঙলা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি অগ্রগণ্য ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল। বাঙলা ভাষার আদি পদাবলী নাকি বৌদ্ধ দোঁহা ও আদি ধর্ম্মগ্রন্থ "শূন্যপুরাণ"। এ যুগের পণ্ডিতদের মতে বাঙলা ভাষার ধর্ম্মশব্দের অর্থ বৌদ্ধধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মপূজা নামে বুদ্ধপূজা। বাঙলা ভাষায় যে সকল ধর্ম্মমঙ্গল আছে, সে সবই নাকি বৌদ্ধ-গ্রন্থ। এবং ময়নামতীর উপাখ্যান বৌদ্ধ-উপাখ্যান। কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও বুদ্ধের স্তব আছে। তারপর আমাদের, অধিকাংশ দেবদেবীও নাকি ছদ্মবেশী বৌদ্ধ দেব-দেবী। "তারা" যে বৌদ্ধ-দেবতা—তা ত নিঃসন্দেহ। শীতলাও শুনতে পাই তাই! চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবতা বাশুলিও নাকি বৌদ্ধ দেবতা, আর বাঙলার পাষাণের পিণ্ডাকার গ্রাম্য মঙ্গলচণ্ডী ছিল আদিতে বৌদ্ধস্তূপ। এ অনুমান সম্ভবত সত্য, কেননা, এ সকল দেবদেবী যে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণের স্বগোত্র নয়—অর্থাৎ বৈদিক নয়, তাঁদের বংশধরও যে নয়, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

বাঙালী সভ্যতার বুনিয়াদ যে বৌদ্ধ, হিন্দু স্তরের দু-হাত নীচেই যে বাঙলার বৌদ্ধ-স্তর পাওয়া যায়, আজকের দিনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বাঙলা দেশের মাটী দু-হাত খুঁড়লেই আমরা অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি বৌদ্ধ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং যদি কেউ বলে—মুসলমান যুগে বাঙালী হিন্দু হয়েছে, তাহলে সে কথা সত্যের খুব কাছ ঘেঁসে যাবে। যে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ধর্ম্মই যে আজকাল আমাদের সকল গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে, তারই স্মরণ-চিহ্ন উদ্ধার করাই যে আমাদের পাণ্ডিত্যের প্রধান কর্ম্ম হয়ে উঠেছে, এটি সত্য সত্যই একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। এ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল কি করে?—ঘটেছে এই কারণে যে, ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান ইউরোপ, ভারতবাসীর নূতন করে আবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

॥ ৩ ॥

বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমিতে তার মৃত্যু হলেও, আজও তা কোটি কোটি এসিয়াবাসীর ধর্ম্ম। শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া,

মঙ্গোলিয়া, প্রভৃতি দেশের লোকে আজও বুদ্ধদেবের পূজা করে, ও নিজেদের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলেই পরিচয় দেয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হয় সমুদ্রের, নয় হিমালয়ের অপর পারের দেশসকল থেকেই এ দেশের এই লুপ্ত ধর্ম্মের শাস্ত্র-গ্রন্থসকল উদ্ধার করেছেন, এবং তাঁদের বই পড়েই আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করেছি।

সিংহলেই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, আর পণ্ডিত-সমাজে অদ্যাবধি এই সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মই স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম বলেই গ্রাহ্য

সিংহলের মঠে মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম্মের আদি গ্রন্থগুলি সিংহলী ভাষায় নয়, পালি ভাষায় লিখিত। এই পালি ভাষা যে ভারতবর্ষের একটি প্রাকৃত—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; যদিচ সেটি যে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের ভাষা, উত্তরাপথের না দক্ষিণাপথের, বঙ্গের না কলিঙ্গের, মগধের না মালবের—সে বিষয়ে পণ্ডিতের দল আজও একমত হতে পারেন নি।

সিংহলে যে শুধু বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষিত হয়েছে, তাই নয়—উক্ত ধর্ম্মের জন্ম-বৃত্তান্ত ও তার সিংহলে প্রচারের ইতিহাসও রক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এই সিংহলী শাস্ত্রই হচ্ছে এ যুগের ইউরোপীয় বৌদ্ধ-শাস্ত্রীদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য দলিল। এবং এই শাস্ত্র থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যে সকল তথ্য উদ্ধার করেছেন—বর্ত্তমান যুগে তাই আমরা বৌদ্ধমত বলে জানি ও মানি।

॥ ৪ ॥

পালি গ্রন্থসকল আবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত খানকতক বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থের সন্ধান নেপালে পাওয়া গেল। সে সব গ্রন্থ আলোচনা করে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দেখতে পেলেন যে, সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্ম ও নেপালী বৌদ্ধধর্ম্ম এক নয়। এবং বহুকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধমত যে দু-ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ এই দুটি ধারার দুটি বিভিন্ন নাম থেকেই পাওয়া যায়। যে বৌদ্ধমত সিংহল ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে প্রচলিত, তা "হীনযান" নামে প্রসিদ্ধ; আর যে বৌদ্ধমত নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে প্রচলিত, তার নাম হচ্ছে "মহাযান"। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই দুটি বিভিন্ন মতের নাম দিয়েছেন—Northern School ও Southern School। অনেক দিন ধরে এক দলের ইউরোপীয় পণ্ডিতরা "হীনযান'কেই মূল বৌদ্ধমত ও মহাযানকে তার অপভ্রংশ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

ফলে আর একদল পণ্ডিত তার বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন। অবশেষে এই পণ্ডিতের তর্কের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে,—উভয় দলই এখন এ বিষয়ে একমত যে, হীনযান ও মহাযান, এ দুয়ের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্মের একই মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় এবং অন্যান্য বিষয়ে উভয় মতের এতটা সাদৃশ্য আছে যে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, একই আদি-মত থেকে এই দুটি বিভিন্ন শাখা বিনির্গত হয়েছে।

"মহাযান" মূল বৌদ্ধমতই হোক, কিম্বা তার অপভ্রংশই হোক, সে মত আমাদের কাছে মোটেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না। প্রথমতঃ এ শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তারপর চীনে এবং তিব্বতী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ বৌদ্ধ-গ্রন্থই সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। উপরন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে উক্ত ধর্ম্মের রূপান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করলে, আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয়-মনের ইতিহাসের জ্ঞানও লাভ করব। আর তখন হয়ত আবিষ্কার করব যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মৃত্যু হয় নি। ও ধর্ম্মমত উপনিষদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হয়েছে—জ্ঞানের ধর্ম্ম কালক্রমে ভক্তির ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহাযান-মতের সঙ্গেই অদ্যাবধি আমাদের পরিচয় শুধু নাম মাত্র।

॥ ৫ ॥

আমরা অতীতের যে ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য আজ উঠে পড়ে লেগেছি, সে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস নয়, বৌদ্ধযুগের ইতিহাস—এক কথায় জাতীয় জীবনের বাহ্য ইতিহাস। আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছি তার নাম archæology এবং antiquarianism। বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে তার কি নিদর্শন, কি স্মৃতি চিহ্ন রেখে গিয়েছে, আমরা নিচ্ছি তারই সন্ধান এবং করছি তারই অনুসন্ধান। আমাদের দৃষ্টি বৌদ্ধযুগের স্তূপ, স্তম্ভ, মন্দির ও মূর্ত্তির উপরেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের বিশাল ক্ষেত্রে মৃত-বৌদ্ধধর্ম্মের বিক্ষিপ্ত অস্থিসকলই আমরা সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আর নানা স্থান থেকে সংগৃহীত অস্থিসকল একত্র জুড়ে যদি আমরা কিছু খাড়া করতে পারি, তাহলে তা হবে শুধু বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কালমাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের আত্মার সন্ধান না নিয়ে তার মৃতদেহের সন্ধান নেওয়ায়, বলা বাহুল্য আমাদের আত্ম-জ্ঞান এক চুলও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে না। আর বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে যাঁর পরিচয় নেই,

তিনি তার দেহের সাক্ষাৎ লাভ করলেও তার রূপের পরিচয় লাভ করবেন না। বৌদ্ধ-স্তূপ তাঁর কাছে একটা পাষাণ স্তূপমাত্রই রয়ে যাবে। ইঁট কাঠ পাথরে গড়া মূর্ত্তিসকল মূক। তারা নিজের পরিচয় নিজ-মুখে দিতে পারে না, তাদের পরিচয় লাভ করতে হয়, ভাষায় যা লিপিবদ্ধ আছে তারই কাছে। সুতরাং বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম্ম ও তাঁর সঙ্ঘের অজ্ঞতার উপর বৌদ্ধযুগের বাহ্য ইতিহাসও গড়া যাবে না। আমরা বৌদ্ধ স্তূপ স্তম্ভ মন্দির মূর্ত্তির মুখে যে কথা সব দিই, সে কথা আমরা বৌদ্ধশাস্ত্র থেকেই সংগ্রহ করি। Sanchi এবং Barhut স্তূপের ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন মূর্ত্তিগুলির অর্থ ও সার্থকতা তাঁর পক্ষে জানা অসম্ভব, যাঁর বৌদ্ধ জাতকের সঙ্গে সম্যক পরিচয় নেই। অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করা আমাদের নব-ঐতিহাসিকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

॥ ৬ ॥

পূজ্যপাদ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম" ব্যতীত বাঙলা ভাষায় আর একখানিও এমন বই নেই, যার থেকে বুদ্ধের জীবন-চরিত, তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজি ভাষায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে, সেই সকল গ্রন্থের আলোচনা করেই পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয় এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই "বৌদ্ধধর্ম্মে"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করতে তিনি ৮০ বৎসর বয়েসে এক বৎসর কাল যেরূপ অগাধ পরিশ্রম করেছেন, তা যথার্থই অপূর্ব্ব। দিনের পর দিন সকাল আটটা থেকে রাত আটটা ন'টা পর্য্যন্ত তাঁকে আমি এ বিষয়ে একাগ্রচিত্তে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি। শেষটা যখন তাঁর শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তখনও তিনি হয় আরাম চৌকীতে নয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিন এই বইয়ের প্রুফ সংশোধন করতেন। এ সংশোধন শুধু ছাপার ভুলের সংশোধন নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নতুন নতুন বই পড়ে তাঁর লেখার যেখানে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করতেন, তা করতে তিনি একদিনও বিরত হন নি। তাঁর মৃত্যুর চারদিন আগেও তাঁকে আমি "বৌদ্ধধর্ম্মের" প্রুফ সংশোধন করতে দেখেছি।

এই একাগ্র এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থখানি যতদূর সম্ভব নির্ভুল হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও তার ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে এতদূর মতভেদ আছে, এ বিষয়ে এত সন্দেহের এত তর্কের অবসর আছে যে, এ বিষয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না, যা চূড়ান্ত বলে পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য

হবে। যে ধর্ম্মের ইতিহাস আটদশ ভাষার বিপুল সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করতে হয়, বলাবাহুল্য সে ইতিহাসের খুঁটিনাটি নিয়ে বিচার তর্ক বহুকাল চলবে, এবং সম্ভবত তা কোন কালেই শেষ হবে না। তবে সে ইতিহাসের একটা ধরবার ছোঁবার মত চেহারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর এ গ্রন্থে পাঠক সেই চেহারারই সাক্ষাৎ পাবেন।

॥ ৭ ॥

আমি পূর্ব্বে যা বলেছি তাই থেকে পাঠক অনুমান করতে পারেন যে—

আমি শুধু পণ্ডিতসমাজের নয়, দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি। আর আমার বিশ্বাস সাধারণ পাঠকসমাজ এই গ্রন্থ থেকে অনায়াসে বিনাক্লেশে সে জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারবেন।

এ গ্রন্থ সাধু ভাষায় লিখিত। কিন্তু এ সাধু-ভাষা আজকের দিনে যাকে সাধুভাষা বলে—সে ভাষা নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা যে ভাষার সৃষ্টি করেন, এ সেই ভাষা। এ ভাষা যেমন সরল তেমনি প্রাঞ্জল, যেমন শুদ্ধ তেমনি ভদ্র। এতে সমাস নেই, সন্ধি নেই, সংস্কৃত শব্দের অতি-প্রয়োগ নেই, অপ-প্রয়োগ নেই, দুষ্ট-প্রয়োগ নেই, কষ্ট-প্রয়োগ নেই, বাগাড়ম্বর নেই, বৃথা অলঙ্কার নেই। ফলে এ ভাষা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি সহজবোধ্য।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, বুদ্ধ-চরিতের তুল্য চমৎকার ও সুন্দর গল্প পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। জনৈক জর্ম্মাণ পণ্ডিত Oldenburg বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, বুদ্ধচরিত ইতিহাস নয়, কাব্য। এ কথা সত্য। কিন্তু এ কাব্যের মূল্য যে তথাকথিত ইতিহাসের চাইতে শতগুণে বেশী, তা বোঝবার ক্ষমতা জর্ম্মাণ পাণ্ডিত্যের দেহে নেই। এ কাব্য মানুষের চির আনন্দের সামগ্রী। অতীতে যে বুদ্ধচরিত কোটী কোটী মানবকে মুগ্ধ করেছে, ভবিষ্যতেও তা কোটী কোটী মানবকে মুগ্ধ করবে। এ কাব্যের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য পাণ্ডিত্যের কোনও প্রয়োজন নেই, যার হৃদয় আছে ও মন আছে, এর সৌন্দর্য্য তার হৃদয় মনকে স্পর্শ করবেই করবে। যে দেশে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর যে দেশের লোকে তাঁর জীবন-চরিত অবলম্বন করে' বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্য রচনা করেছে—সে দেশও ধন্য, সে জাতিও ধন্য। আমি আশা করি, বাঙলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই গ্রন্থ থেকে বুদ্ধ-চরিতের পরিচয় লাভ করে' নিজেদের ধন্য মনে করবেন।

১৬।২৩ — শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

॥ নতুন মুদ্রণের ভূমিকা ॥

ব্যক্তিগত জীবন, জীবনাশ্রিত দর্শন এবং দর্শনাশ্রিত ধর্ম এই নিয়েই বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধধর্মের সমষ্টি। ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল বলে বুদ্ধের জীবন জীবনীর পর্যায়ে উঠেছিল, জীবনাচরণ তত্ত্বকে সৃষ্টি করেছিল বলে তা দর্শনের অঙ্গীভূত হয়েছিল এবং সেই তত্ত্ব বহুজনের মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধারণ করেছিল বহু মানুষের চিত্তসত্তাকে। বৌদ্ধধর্ম তাই মঙ্গলের ধর্ম—'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ'। এই মঙ্গল প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন পঞ্চশীলাচরণ। 'শান্তিনিকেতন গ্রন্থে ব্রহ্মবিহার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষা এখানে উদ্ধৃত করি :

"তিনি [বুদ্ধদেব] বলেছেন, শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল। পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিন্নমাদিয়ে, যা তোমাকে দেওয়া হয়নি তা নেবে না। এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ খাবে না, এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্য শ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন—ইধ অরিয়-সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি।......

এই শীলগুলি হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে মঙ্গল বলেছেন, তা "মঙ্গলসুত্তে" কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই :

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে—

বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন,

অসৎগণের সেবা না করা সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা করা এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

যে দেশে ধর্মসাধনা বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঙ্গল।

বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্প শিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতাকে পূজা করা, স্ত্রীপুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা এই উত্তম মঙ্গল।

পাপে অনাশক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ এই উত্তম মঙ্গল।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথা শ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

ক্ষমা প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সংকার্য এই উত্তম মঙ্গল।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।"

২।

বুদ্ধদেবের সমগ্র জীবন এই শীল আচরণ, এই মঙ্গল প্রার্থনা এবং এই মঙ্গল প্রসারের মহাকাব্য। যে অহিংসা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকথা—বুদ্ধজীবন সেই অহিংসার ধারক। তাঁকে অবলম্বন করে ভারতের সঙ্গে বিশ্বের মৈত্রী সম্পর্কটি যতখানি স্ফূর্তিলাভ করেছিল—তা বোধ করি অন্য উদাহরণে দুর্লভ। এখনও বুদ্ধদেব বিশ্বপ্রসারী। সেই পুণ্য চরিতকথা সংক্ষেপে আমরা এখন নিবেদন করি।

এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আনুমানিক ৫৬৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলের কপিলবস্তু নগরের লুম্বিনী উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমায় এক শাক্য পরিবারে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। পিতা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী। জন্মের পর তাঁকে পালন করেন বিমাতা (মতান্তরে পিসিমা) গৌতমী। এজন্য তিনি গৌতম নামে পরিচিত। আবার শাক্যবংশে জাত তপস্যাকৃত মহামুনি গৌতম শাক্যমুনি নামেও পরিচিত হন। তাঁর জন্মের পর পিতা শুদ্ধোদনের জীবনে যে বহু সার্থকতা দেখা দেয়, ফলে তিনি সিদ্ধার্থ বা সর্বার্থসিদ্ধি নামেও পরিচিত হন। সাধনার বলে অবিদ্যাকে বিনাশ করে

'বোধি' বা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী সিদ্ধার্থ অবশেষে 'বুদ্ধ' নামে কীর্তিত হন। বৌদ্ধ-জাতকমালায় সিদ্ধার্থ জন্মই তাঁর শেষ জন্ম বলে পরিকীর্তিত হয়েছে, কারণ বোধির ফলেই তিনি লাভ করেছিলেন অর্হত্ত্ব।

জ্যোতিষীগণ তাঁর জন্মের পরেই নাকি গণনা করে বলেছিলেন এই পুত্র হয় অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী না হয় মহাজ্ঞানী পুরুষ হবে। তবে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু বা সন্ন্যাসী দেখলে এই পুত্র সংসারত্যাগী হবে। দুঃখ-ব্যাধি-সন্ন্যাসী দর্শন থেকে তাঁকে দূরে রাখার সর্ববিধ ব্যবস্থা করলেন পিতা। বিবাহ দিলেন যশোধরার (অন্য নাম গোপা বা ভদ্রকচ্চানা) সঙ্গে। কিন্তু সমস্ত সাবধানতা ব্যর্থ হল। সিদ্ধার্থ বৃদ্ধ, দুর্বল, ব্যাধিগ্রস্ত, সন্ন্যাসী—সবই দেখলেন। শেষদিন সন্ন্যাসী দেখে পিতার কাছে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনা নামঞ্জুর হল। ভোগবিলাসের উপকরণ বহুগুণিত হল। কিন্তু অন্তরে গৌতম তখন সন্ন্যাসীই হয়ে গেছেন। অশ্বানুচর ছন্দককে ডাকিয়ে কণ্ঠক নামক অশ্বের পৃষ্ঠে রাজপোষাক, রাজভোগ, রাজবধূ সব কিছুকে ত্যাগ করে, গৃহত্যাগ করলেন। রাজপুত্র রাহুলও পরিত্যক্ত হলেন।

প্রথমে এলেন বৈশালী। পরে আরাড় কলোম ও রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শ্রাবস্তী হয়ে এলেন রাজগৃহে। এখানে দেখা হল নৃপতি বিম্বিসারের সঙ্গে —'নৃপতি বিম্বিসার/নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল পাদনখকণা তাঁর।' মগধরাজের কাছ থেকে গয়ায় গিয়ে কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, বপ্র, ভদ্রিয় এবং মহানাম—এই পঞ্চসন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। এর আগে আরাড় মুনির সাংখ্যমতে তিনি তুষ্টিলাভ করেননি বলে নৈরঞ্জনা নদীতীরে কৃচ্ছ্রসাধনে রত হলেন। দীর্ঘ তপশ্চর্যার পর তিনি উপলব্ধি করলেন— মাত্রাতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনে সাধন সিদ্ধ হয় না। তপস্যা ত্যাগ করলেন গৌতম, তাঁকে ত্যাগ করলেন পঞ্চসন্ন্যাসী। দীর্ঘ ছয় বছরের তপস্যার শেষে গোপরাজকন্যা (মতান্তরে শ্রেষ্ঠিকন্যা) সুজাতা (অন্যনাম নন্দবলা) এসে পায়স নিবেদন করলে তাঁর শরীরে শক্তি সঞ্চার হল। পুনর্বার শুরু হল বোধি লাভ না করা পর্যন্ত দুশ্চর তপস্যা। অসৎ মার পরাস্ত হল তার সকল কৌশল সত্ত্বেও। বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রির প্রথম প্রহরে পরিজ্ঞাত হলেন আপন পূর্বজীবনের কথা, দ্বিতীয় প্রহরে লাভ করলেন দিব্যচক্ষু, তৃতীয় যামে দর্শন করলেন ভবচক্র (এর ফলেই সৃষ্টি হল প্রতীত্য সমুৎপাদ-বাদ), চতুর্থ প্রহরে সর্বজ্ঞতা লাভ করে লাভ করলেন অর্হত্ব।

আপন মুক্তি বুদ্ধের প্রার্থনা ছিল না। 'করুণাঘন' মহামানব প্রার্থনা

করলেন বিশ্বের মুক্তি। তাই শুরু হল প্রব্রজ্যা। অনুপম লাবণ্যধারী বুদ্ধের চরণে প্রণিপাত হলেন জাতিধর্মবর্ণপ্রস্থান নির্বিশেষে ধনী-নির্ধনেরা। তাঁর ব্যক্তিগত সংযম, সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও সুভাষণ অচিরে জয় করে নিল সহস্র সহস্র আশ্রিতের হৃদয়। প্রথমে এলেন ঋষিপত্তন বা বর্তমান সারনাথে যা বারাণসীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানেই পূর্বোক্ত পঞ্চ সন্ন্যাসীর সামনে নবধর্ম বা মধ্যম পন্থার ব্যাখ্যা করলেন। সেই প্রথম প্রবর্তিত হল বৌদ্ধধর্ম চক্রের সূত্র।

আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মুমুক্ষু মানুষ পরমকারুণিক তথাগতের জ্ঞান মৈত্রী এবং করুণার নবধর্মে দীক্ষিত হয়ে বিশ্বমানবাত্মার দুঃখত্রাণে হয়ে উঠল উদ্যোগী। দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে স্থাপিত হল মঠরাজি, বিহার। বুদ্ধানুপ্রাণিত এক হিংসাহীন, দ্বেষহীন, ঈর্ষাহীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অহিংসা সত্য ও সেবায় এই নবধর্ম হল ব্রতী। গ্রোসিষ্ণু হিন্দুশাস্ত্র পর্যন্ত বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে গ্রহণ করল আর্যপ্রধারায়—'কেশবকৃত-বুদ্ধ-শরীর জয় জগদীশ হরে।'

সারনাথের প্রথম বর্ষা উপভোগান্তে বুদ্ধ এলেন রাজগৃহে বিম্বিসারের অনুরোধে। এখানে অতিবাহিত করলেন পরবর্তী তিন বর্ষা। এখানেই কোলিত এবং উপতিষ্য নামে যে দুই ব্রাহ্মণ আচার্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন, তাঁরাই পরে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়ন নামে খ্যাত। এবারে এলেন বুদ্ধ পুনশ্চ কপিলবস্তুতে। দেখা করলেন পিতার সঙ্গে (একাধিকবার)। সাক্ষাৎ হল পত্নীর সঙ্গেও। অজন্তাগুহার ১৭ সংখ্যক চিত্রটি আমাদের মনে আসে—রাহুলকে অগ্রবর্তী করে পত্নী যশোধরা স্বামীকে ভিক্ষা দিলেন। দীক্ষিত হলেন পুত্র রাহুল এবং ক্ষৌরকার উপালি। যোগদান করলেন ভিক্ষু আনন্দ।

বৈশালীতে পঞ্চম বর্ষা যাপনের সময় তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন একদা গণিকা আম্রপালী। একদা গৌতম পালিকা গৌতমীকে সঙ্ঘে প্রবেশের জন্য তিন তিনবার বাধা দিয়েছিলেন। পরে তাঁকে গ্রহণ করে ভিক্ষু আনন্দকে বলেছিলেন—এটা ভাল হল না। সঙ্ঘে রমণী প্রবেশ করায় এই ধর্ম পাঁচশো বছরের বেশি স্থায়ী হবে না। তিনিই আম্রপালীকে গ্রহণ করলেন পরম ঔদার্যে। এভাবে কৌশাম্বী, বেরঞ্জা, সাঙ্কাশ্য প্রভৃতিতে নানা উপদেশ দান করলেন বিভিন্ন সময়ে। শ্রাবস্তীতে যোগ দিলেন অনাথ পিণ্ডদ। নালক বা বা মহাকচ্চায়ন, পিপ্পলি (মহাকাশ্যপ) এবং অঙ্গুলিমাল একে একে সঙ্ঘে প্রবেশ করে ধর্মপ্রচারে লিপ্ত হলেন। নন্দ, অনিরুদ্ধ, ভদ্দিয়, কিল্বিলও যোগ দিলেন। কিন্তু আজীবন বুদ্ধবিদ্বেষী হয়ে গেলেন দেবদত্ত। শত্রু রয়ে গেলেন রাজা প্রসেনজিৎ-তনয় বিডূডভ।
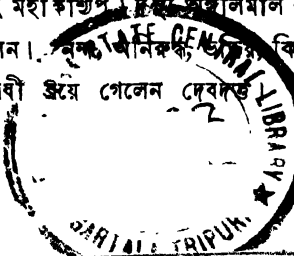
সারা ভারত ভ্রমণ করে বুদ্ধদেব জীর্ণ হয়ে উঠলেন। বৈশালী থেকে কুশীনারা যাবার পথে পাবা গ্রামে চণ্ড (চুন্দ) নামে কর্মকারের (স্বর্ণকার ?) গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলে চণ্ড নাকি তাঁকে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে শূকরমদ্দব (শূকর মাংস বা ছত্রাক) খেতে দেয়। চিরশ্রদ্ধাবান্ বুদ্ধ সাদরে তা ভক্ষণ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হিরণ্যবতী নদী কায়ক্লেশে অতিক্রম করে মল্লদের শালবনে এসে উপস্থিত হন। তাঁর নির্দেশে সেখানে প্রস্তুত করা হল তাঁর শেষ শয্যা। আর তাঁর আদেশে শিষ্য আনন্দ ছুটে গিয়ে কুশীনগরে এই সংবাদ দিয়ে আসলেন যে—তথাগতের অন্তিমকাল আগতপ্রায়। ছুটে এলেন জনৈক সুভদ্র মনের শেষ সংশয় দূরীকরণের জন্য। সমবেত শিষ্যাবলীকে শেষ উপদেশে পরিতৃপ্ত করলেন অশীতিপর বৃদ্ধ বুদ্ধ: 'বয়ধম্মাসংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ'—সংহত পদার্থমাত্রই নশ্বর, এ সকল বস্তুই অনাত্মীয়। অপ্রমাদের সঙ্গে তোমরা নিজ কার্য (মুক্তির পথ) সম্পাদন কর। 'আত্মদীপো ভব.' সেদিনও বৈশাখী পূর্ণিমা ৪৮৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দের। মহাপরিনির্বাণ ঘটল।

৩।

বৌদ্ধদর্শন কোনো নিরালম্ব তত্ত্ব নয়, এর সঙ্গে জীবনের গভীরতর প্রশ্নের আছে নিগূঢ় সংযোগ। জীবনে দুঃখ আসে কেন এবং সেই দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের উপায় কি ?—এই প্রশ্ন যাঁর মনকে আলোড়িত করেছিল তীব্রভাবে, সে মহামানবের দুঃখলেশশূন্য এক শীতল ছায়ার উপলব্ধিই হল বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তির গোড়ার কথা।

এর জন্য তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ গৃহের আচরণে তিনি দেখেছেন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত পশুবধের নৃশংসতাকে। বেদধর্ম প্রধানত একারণেই তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য মনে হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর প্রার্থিত দুঃখমুক্তির পরিবর্তে বেদধর্ম দুঃখ সৃষ্টি করে চলেছে। হিন্দুর আত্মার স্বরূপ তাঁর জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে নি। শেষে সাধনাতে অভিজ্ঞতায় মধ্যপন্থাকেই ভেবেছেন সিদ্ধির একমাত্র উপায়। অ্যারিস্টটল বোধহয় একেই বলতে চেয়েছেন—Virtue lies in the golden mean'।

বস্তুতপক্ষে বুদ্ধ নিজে কিছু দার্শনিক শিক্ষা দিতে চাননি। পরলোক বা আত্মা বা ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলে তদুত্তরে তিনি নীরব থাকতেন। আবার তিনি নিজে কোনো গ্রন্থ রচনাও করে যান নি। কিন্তু তপস্যার সপ্তম রজনীর চতুর্থ মাসে তিনি যে চার আর্যসত্য উপলব্ধি করেন, তা-ই শিষ্য-

প্রশিষ্যক্রমে পরবর্তিকালে নানা ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ-দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্যাখ্যার বিভিন্নতায় এই দর্শন অন্তত ত্রিশটি বৌদ্ধদর্শন প্রস্থানের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এদের মধ্যে হীনযানীরা প্রধানত সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এবং মহাযানরা প্রধানত মাধ্যমিক ও যোগাচার শাখাকে গুরুত্ব দিয়েছেন—ভারতীয় দর্শনেও এই চতুঃশাখাই গুরুত্ব পেয়েছে।

বুদ্ধ-উপলব্ধ চার আর্য সত্য হল—দুঃখ আছে, তার কারণ আছে, এর নিবৃত্তি আছে এবং এই নিবৃত্তির উপায়ও আছে। দুঃখ আছে এবং দুঃখের কারণ আছে এর ব্যাখ্যাই বুদ্ধের বিশ্বতত্ত্বকে সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেছেন অবিদ্যাই হল দুঃখের মূল কারণ (বেদান্তের অবিদ্যা আর বুদ্ধের অবিদ্যা এক নয়)। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ এই দ্বাদশ গ্রন্থিশৃঙ্খলিত চক্রের যে আবর্তন তা-ই ভবচক্র—এর একটি থেকে অন্যটি সৃষ্ট তাই এর অপর নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ—'ইমস্মিং সতি ইদং হোতি। ইমস্স উপ্‌পাদানা ইদং উপমজ্জাতি।' বুদ্ধের মতে যিনি এই প্রতীত্যসমুৎপাদকে জানেন তিনিই ধর্মকে দেখেন (সুত্তপিটক—মজ্ঝিম নিকায়)।

তৃতীয় আর্যসত্যের ব্যাখ্যা দেখে বোঝা যায় বুদ্ধ নিজে দুঃখবাদী ছিলেন না। তিনি বলেছেন সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হলেই দুঃখের বিনাশ হবে। এটাই জীবের শেষ লক্ষ্য—Summum bonum এখানেই নির্বাণ যে পূর্ণবিলুপ্তি, তা যে আনন্দের এক পূর্ণ অবস্থা, এক অচিন্তনীয় অপরিবর্তনীয় অবস্থা, তার ব্যাখ্যাও পেলাম। মনে রাখতে হবে বুদ্ধ স্থায়ী আত্মা স্বীকার করতেন না। নির্বাণ হল কামনা বাসনার অবসান। কেউ বা বলেন 'নির্ব্বাণং পরমং সুখং।' বৈভাষিক দার্শনিক অবশ্য বলেন—এ এক শূন্যাবস্থা—নির্ব্বাণং শান্তং শূন্যং। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। যে যা বলছেন, সব মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। কারণ বুদ্ধ নিজেই বলেছেন 'আমি যা নই, যা আমার প্রচারিত তত্ত্ব নয় তাই আমার উপর আরোপ করে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।' (মজ্ঝিম নিকায়—২১। অনুবাদ: হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ধর্ম্মপদ,' হরফ সংস্করণ)।

দুঃখের পরিনির্বাণের জন্য বুদ্ধ আটটি নৈতিক বিধানের কথা বলেছেন। এই অষ্টাঙ্গিক শিক্ষা হল—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংলাপ, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। মহর্ষি পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগের কথা স্বভাবতই এই সূত্রে মনে পড়ে যায়। কিন্তু

বুদ্ধদেবের বৈশিষ্ট্য হল আত্মসাধনার উপর জোর—'অত্তদীপো বিহরথ অত্তসরনা অনঞ্ঞ সরনা'—নিজের দীপালোকে পথ চল, অন্যের উপর নির্ভর ক'রো না। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল ঐ আত্মসাধনা এবং আত্মত্যাগে উদ্দীপনার সরণি। প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি এই তিন স্কন্ধে বিন্যস্ত ঐ অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ লক্ষ্য হল সমাধির অবস্থা। এতে পৌছতে পারলেই হিংসা দ্বেষোত্তীর্ণ এক নিরাসক্ত বোধিমন উপলব্ধ ও অর্জিত হয়। এই অবস্থাই হল নির্ব্বাণ।

ভারতীয় দর্শনে যে চার প্রধান বৌদ্ধ দর্শনকে স্বীকার করা হয়েছে তার মধ্যে হীনযানী সম্প্রদায়ের সৌত্রান্ত্রিক দর্শন—বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নেই একথা স্বীকার করেন না। আবার মহাযানীদের সর্বশূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদও তাঁরা মানেন না। মাধ্যমিক মতে সকল বস্তু শূন্য এবং যোগাচার দর্শন বা বিজ্ঞানবাদও হল ঐ বাহ্যার্থশূন্যতাবাদ। এঁরা বলেন বাহ্যবস্তু অসৎ কিন্তু মন হল সদ্বস্তু। মনের সত্তাকে যে মুহূর্তে অস্বীকার করা হয় সেই মুহূর্তেই সে সব মিথ্যা হয়ে যায়।

৪।

এখান থেকেই এসেছে বৌদ্ধ অধ্যাত্মবাদের চিন্তা। নীতিমূলক দর্শন হলেও বুদ্ধের অধ্যাত্মতত্ত্ব (Metaphysics) কর্মবাদ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, নৈরাত্মবাদ ও ক্ষণিকত্ববাদের আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এরও সর্বশেষ পরিণতি ঐ নির্বাণেই যা দ্বারা মানুষ জীবন ও বিশ্বের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করে।

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধসংঘের প্রধান দুটিশাখা হীনযানী এবং মহাযানীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হীনযান নামটি অথবা এই মতবাদের সৃষ্টি তথাগতের মহাপরিনির্বাণের অনেক পরে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি যখন অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় এর প্রধান একটি শাখা স্থবির বা থেরবাদ এবং অন্যটি আচার্য বা আচারিয়বাদকে গ্রহণ করে। প্রথমটি অধিকার করে হীনযানীগণ এবং দ্বিতীয় আচারিয়বাদ থেকে উদ্ভূত মহাসাংঘিক সম্প্রদায় মহাযান শাখার অন্তর্গত হয়। অথচ বুদ্ধ নিজে ভবব্যাধিক চিকিৎসক মাত্র, জ্ঞানতত্ত্ব বা অধিবিদ্যা নিয়ে তাঁর তেমন মাথাব্যথা ছিল না। নাগার্জুনই প্রথম বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। হীনযানীরা বুদ্ধপ্রোক্ত নীতিসমূহ কঠোরভাবে মানতে চান এবং বুদ্ধের পূজায় আগ্রহীও নন। মহাযানীগণরা বুদ্ধদেবকে দেবতা জ্ঞানে তাঁর মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করতে লাগলেন। এমনকি বহু তান্ত্রিক উপচারও তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করলেন। হীনযানীগণের

ব্যক্তিগত নির্বাণ তাঁদের কাছে অবশ্য সর্বজীবের নির্বাণে লক্ষ্যে পরিণত হল। তাঁরা বুদ্ধের 'মৈত্রেয়ী' অবতারে ভবিষ্যতে আবির্ভাবের কথাও বিশ্বাস করেন। হীনযানীগণ realist কিন্তু মহাযানীগণ idealist বা ভাববাদী প্রধানত। অর্থাৎ তাঁরা বুদ্ধত্বলাভকেই আচরণীয় ভাবেন। হীনযানীগণ অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনায় বিশ্বাসী এবং দুঃখ, অনাত্মন্ ও অনিত্য—এই দর্শনে আস্থাশীল। সিংহল বর্মা ও শ্যামদেশে হীনযানী ধর্ম অদ্যাবধি প্রচলিত।

হীনযান যদি হয় ক্ষুদ্র শকট অর্থাৎ অল্প সংখ্যক নির্বাণকামী তবে মহাযান হল 'বৃহৎ শকট' অর্থাৎ বহু নির্বাণকামীর আশ্রয়স্থল। মহাযানী সাহিত্য শুদ্ধ এবং মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। যেমন প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, ললিত বিস্তার, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক প্রভৃতি। কয়েকজন মহাযানী প্রখ্যাত আচার্য হলেন অসঙ্গ, বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত অথবা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ। শূন্যবাদী ও ভক্তিবাদী মহাযানীরা জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মকে বিস্তারে আগ্রহশীল।

৫।

আমাদের মনে আছে বুদ্ধদেব নিজে কোনো বই লিখে যাননি। এমনকি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ করার কোনো চেষ্টাও হয়নি। বুদ্ধ নিজেও এ বিষয়ে কাউকে উৎসাহিত করেন নি। উত্তরপ্রদেশাগত শিষ্যদ্বয় জমেন ও উতেকুল যখন তাঁর বচনাবলীকে সর্বভারতে স্বীকৃত সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত করে ধরে রাখার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন বুদ্ধ নিষেধ করে বলেছিলেন—ন ভিক্‌খবে বুদ্ধবচনং ছান্দসো আরোপেতব্বং—ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচনকে তোমরা ছান্দস ভাষায় আরোপিত করো না। কিন্তু তাঁর পরিনির্বাণের পর পাছে বুদ্ধবাণীতে বিকৃতি ঘটে যায় সেজন্য তার যথাযথ সংরক্ষণের জন্য শিষ্যগণ রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হয়ে তাঁর উপদেশাবলী আবৃত্তি করেন। এই হল প্রথম বৌদ্ধসংগীতি (First Buddhist Council)। এর একশো বছর পরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতিতে এই ধর্মের প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রয়াস গ্রহণ করেন দেবপ্রিয় অশোক। তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির পরেই তিনি তাঁর পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠিয়ে বুদ্ধদেবের ধর্মমতকে বহির্ভারত ও বৃহত্তর ভারতে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করেন। কণিষ্কের আমলে গৃহীত চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতে এই ধর্ম আরও প্রসার লাভ করে। তিনিও মধ্যএশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে এই ধর্ম প্রচারের জন্য দূত পাঠান।

ধীরে ধীরে সিংহল শ্যাম কম্বোজ প্রভৃতি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, তিব্বত, ব্রহ্ম, ভুটান, সিকিম, নেপাল, চীন, কোরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, জাপান, মধ্য-এশিয়ায় এই ধর্ম ক্রমবিস্তার লাভ করে। মজার ব্যাপার এই যে হিন্দু ধর্মের প্রসারে কুক্ষিগত হয়ে বুদ্ধের আপন জন্মভূমিতে এই ধর্ম আজ নির্বাসিতপ্রায়।

প্রথম 'সংগীতি'তে সংগৃহীত বুদ্ধবচনাদি যতদিন লিপিবদ্ধ হয়নি ততদিন পর্যন্ত তিনটি পিটকে আচার্য-পরম্পরা চলে আসছিল মুখে মুখে পঠন-পাঠনের সাহায্যে। পরে এগুলি লিখিত হয় এবং তিনটি পিটক বা মঞ্জুষায় সংগৃহীত হয়। এই তিন পেটিকা বা পিটক হল বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। এদের লক্ষ্যও ত্রিবিধ। প্রথমটিতে যথাপরাধ উপদেশ, দ্বিতীয়টিতে যথানুরূপ উপদেশ এবং শেষটিতে দেওয়া হয়েছে যথাযথ উপদেশ। আদি সংকলন করা হয় পালি ভাষায়। এই ভাষায় বিনয় পিটক ছয় ভাগে, সূত্র পিটক পাঁচভাগে এবং অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত।

এখানে পালিভাষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা অসংগত হবে না, কারণ এই ভাষাটি সম্পর্কে অনেকেরই কেমন যেন একটা ভুল ধারণা আছে। উজ্জয়িনী অঞ্চলে এই ভাষার বীজ থাকলেও এর নামটি দেন সিংহলী পণ্ডিত বুদ্ধঘোষ (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। পারিভাষিক থেকে 'পালি ভাসা' আসা যেমন অসম্ভব নয় তেমনি পংক্তি>পত্তি>পট্টি>পল্লি>পালি অর্থাৎ পংক্তি বা reference-এর ভাষা হিসাবেও এটি আসতে পারে। এভাষা যে কখনও কোনো বিশেষ অঞ্চলে কথিত হত, মনে করার কারণ নেই। এটি আসলে একটি সাহিত্যিক ভাষা—literary language. এর অবশ্য নির্দিষ্ট ব্যাকরণ আছে এবং পালি ভাষায় রচিত বিরাট সাহিত্যের ধর্মাবেদন ব্যতীত কাব্যাবেদনও প্রচুর। 'থেরীগাথা' একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলন। এর প্রথম অধ্যায়ের 'পুন্না'য় বণিক দুহিতা পূর্ণার যে বাণী সংকলিত হয়েছে তা তো যেন উপনিষদেরই বাণীর প্রতিরূপ।

পুন্নে পূরস্সু ধম্মেহি চন্দো পন্নরসেরিব।
পরিপুন্নায় পঞ্‌ঞায় তমোকৃখন্ধং পদালয়॥

কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার এর অনবদ্য অনুবাদে লিখেছেন—

পূর্ণে! পূর্ণ কর প্রাণ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সম।
পূর্ণ প্রজ্ঞালোকে দূর কর তুমি অজ্ঞতার তমঃ॥

'ধম্মপদ' পালির সবচেয়ে প্রাচীন এবং বিখ্যাত গ্রন্থ। গীতার পরেই ভারতীয় সাহিত্যের এর স্থান।

৬।

বঙ্গদেশে এবং বঙ্গভাষায় বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্মভিত্তিক গ্রন্থরাজিরও একটা ইতিহাস আছে। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ এবং তাঁরা ছিলেন স্বভাবতই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওদন্তপুরী, সোমপুর এবং বিক্রমশীল মহাবিহার। এই যুগের বৌদ্ধ মূর্তি পরবর্তিকালে বিপুল সংখ্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। অসংখ্য বিহার, বৌদ্ধ পণ্ডিতাচার্য এ যুগেরই সম্পদ। তাঁদের মতো চন্দ্রবংশও ছিল বৌদ্ধধর্মানুরাগী। চন্দ্রবংশীয় লিপির সূচনায় ছিল বুদ্ধের সশ্রদ্ধ উল্লেখ। হরিকেল রাজ্য ছিল বৌদ্ধতান্ত্রিক পীঠসমূহের অন্যতম। কম্বোজ রাজবংশ ভিন্নপ্রদেশ থেকে এলেও ছিল বৌদ্ধধর্মানুগত। যদিও এর প্রথম রাজা রাজ্য পাল বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁর পুত্র নারায়ণ পাল ছিলেন বাসুদেবভক্ত।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের তেমন প্রসার না হলেও প্রতিপত্তি বেড়েছিল সন্দেহ নেই। চতুর্থ শতকের সূচনাতেই আমরা দেখেছি চীনা বৌদ্ধ শ্রমণেরা বঙ্গদেশে যাতায়াত করছেন। ইৎসিঙের মতে মহারাজ শ্রীগুপ্ত চীনা শ্রমণদের জন্য চীন মন্দির নির্মাণ করিয়ে চারশটি গ্রাম দান করেন। ইনিই সম্ভবত গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে আমরা পুণ্ড্রবর্ধন, কজঙ্গলি, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধ বিহারসমূহের নানা তথ্য পেয়েছি। আবার এ তথ্যও আমাদের অজানা নয় যে হিউয়েন সাঙ এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের মতে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধ বিদ্বেষী। আসলে এমন একটি ক্রমপ্রসার্যমান ধর্মের বিস্তারে আনুগত্য ও বিরোধিতা দুটি থাকাই সম্ভব। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বিবর্তনে সেই সপক্ষতা-বিপক্ষতাই আমরা লক্ষ্য করে থাকি।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্গভাষায় বুদ্ধচর্চায় প্রবল আগ্রহের ইতিহাস। সে ইতিহাস দীর্ঘ। আমরা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কিছু আলোচকের প্রসঙ্গ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করার সুযোগ নিচ্ছি।

বাংলায় প্রথম সাহিত্য সৃষ্টির সৃজনমূলক পর্বেই বৌদ্ধধর্ম এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। চর্যাগীতি পদাবলী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথম বাংলা-শব্দের আংশিক অভিধান সর্বানন্দের অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব' (১১৫৯-

৬০ খৃ.), মধ্যযুগে ধর্মপুরাণ প্রভৃতিতে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ থাকলেও উনিশ শতকে বাংলার সার্বিক নবজাগরণের সঙ্গে সাহিত্যে যে সংস্কৃতিগত চর্চা লক্ষ্য করা গেল—বৌদ্ধ সংস্কৃতি তার অনেকখানি অংশই জুড়ে নেয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখেরা বৌদ্ধ সংস্কৃতির আলোচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনই ভারতেই মুখ্য চার ধর্মের সার্বিক আলোচনায় উদ্যোগ গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় এক নতুন পর্বের সূচনা করেন। ভাই সাধু অঘোরনাথের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। সাধু অঘোরনাথ লিখেছিলেন 'শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব'। এটি তাঁর মৃত্যুর (১৮৪১-৮১) পর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের সম্পাদনায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে প্রথম সার্থক পূর্ণাঙ্গ এই গ্রন্থটি এদেশে কোন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান (মহাবোধি সোসাইটি বা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা) প্রতিষ্ঠার পূর্বেই প্রকাশিত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' এর পরের বছরই (১৮৮৩) প্রকাশিত হয়। অবশ্য কেশবচন্দ্র স্বয়ং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শাক্যসমাগম বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তা ধর্মতত্ত্ব পত্রিকার ২রা চৈত্র ১৮০১ শকে প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন—

> 'সংসারজয়ী মহাপুরুষ শাক্য আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করুন। হে ঈশ্বর, ফেরোর যন্ত্রণায় যেমন তোমার মুসা মিসর ছাড়িয়া সশিষ্য নূতন দেশে চলিয়া গেলেন, সেইরূপ হিন্দুদিগের উৎপীড়নে মহামুনি শাক্যদেব সশিষ্য দেশান্তর চলিয়া গেলেন।...পৌত্তলিক হিন্দুস্থান তাহাকে মানিল না...।'

কৃষ্ণকুমার তাঁর বইটি রচনায় Sacred Books of the East-কে আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধচরিত' নাটক (প্রথম অভিনয় ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৫, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭) এবং কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' কাব্য (১৮৯৫) বাংলা সাহিত্যের দুই সৃষ্টিধর্মী বুদ্ধ বিষয়ক রচনা। গিরিশচন্দ্র এডুইন আর্নল্ডের Light of Asia বইটি অবলম্বনে তাঁর নাটকটি লেখেন।

কৃষ্ণবিহারী সেনের অশোক চরিত (১৮৯২) বাংলভাষায় অশোক সম্পর্কে প্রথম রচনা। এর পরিশিষ্টে আছে 'অশোক চরিত' নাটকটি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আর্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত' (১৮৯৯), বিজয়চন্দ্র

মজুমদারের 'থেরীগাথা' প্রভৃতি কাব্যাবলী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধচর্চার নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের Civilisation of India, নামক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে বিশদ আলোচনা আছে তা উল্লেখযোগ্য মনে করি।

এই পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১) প্রকাশের আগে বাংলায় উল্লেখযোগ্য বুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থাদি। এরপরে কালীবর বেদান্তবাগীশের 'শঙ্কর ও শাক্যমুনি' (১৯০০ খৃ), ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর 'মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্র' (বাংলা অনুবাদ—১৯০১ খৃ.), অম্বিকাচরণ সেনের 'বৌদ্ধধর্ম্ম ও নির্ব্বাণ ধর্ম্ম' প্রবন্ধ (১৯০৬-১০) বিমলচন্দ্র ঘোষের 'বৌদ্ধধর্ম ও নববিধান' (১৯১৭) বুদ্ধচর্চার অন্যতম নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ইচ্ছে করেই আলোচনার বাইরে রাখছি কারণ—'বৌদ্ধ সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত শিষ্য বলতে যদি কেউ থাকেন তো রবীন্দ্রনাথ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো রাজেন্দ্রলাল-দীক্ষিত শিষ্য বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে ভালো গবেষণা করেছেন জানি। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সাহিত্যরস আছে তার নিষ্কর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি, না এদেশে, না বিদেশে।'—সুকুমার সেন, 'পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ'—১ম সংস্করণ, পৃ: ৩৪-৩৫।

৭।

ঠাকুর পরিবারে বৌদ্ধধর্মচর্চার সূত্রপাত করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে। তিনি নিজে তাঁর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়ে সিংহলে গেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা সংগ্রহ করে আনেন বৌদ্ধধর্মের সারবাণী। সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' বইটি সেই প্রাণবাণীর প্রেরণাতেই রচিত। বাংলা সাহিত্যে এই বইটির বৈশিষ্ট্য নানাকারণে আলোচনার যোগ্য। বইটিতে তিনি একদিক থেকে যেমন ইতিহাস, অন্যদিক থেকে তেমনি তত্ত্বকেও বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। সুধাংশুবিমল বড়ুয়া ঠিকই বলেছেন—'তিনি হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বৌদ্ধ মতের উপর কোন প্রকার হিন্দুমত আরোপের প্রয়াস করেন নি, বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি বরাবর লক্ষ্য রেখেছেন। এখানেই বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথের সার্থকতা'—'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি' (১৩৭৪ সংস্করণ, পৃ: ২৯)।

বইটিতে পালিসাহিত্যের থেরবাদসহ মূলধর্মের মুখ্যতত্ত্বগুলি আলোচিত

আলোচিত হয়েছে। সিংহল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও প্রভাব বইটি রচনার পিছনে যে সক্রিয় ছিল, তা বলা বাহুল্য।

সত্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ (১০ ভাদ্র ১৩০৭)। এটি ছিল বীজাকারে রচিত। পরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধিত আকারে 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সাহিত্য পরিষৎ এর বক্তৃতায় (যা সাহিত্য পরিষৎ-ই প্রকাশ করেন) তিনি বৌদ্ধধর্মকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের আলোকই দেখেছিলেন। বুদ্ধজীবনের নানাপ্রসঙ্গ—যেমন তাঁর নীতি উপদেশ ধর্মচক্র, ব্রাহ্মণ আধিপত্যের কুফল, স্ত্রীপুরুষের আচরণ, বুদ্ধের প্রাত্যহিক জীবন ও পদব্রজে ধর্মপ্রচার—সবই এই বক্তৃতায় বীজাকারে বিধৃত ছিল। আনন্দকে বুদ্ধের উপদেশ বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন—

> 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথে চল, বিষয়াসক্তি, অহমিকা, অবিদ্যা, হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যতদিন আমার শিষ্যেরা শুদ্ধাচারী হইয়া ধর্ম্মপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে। ·· পরে যখন সত্য জ্যোতিঃ সংশয়-মেঘ-জালে আচ্ছন্ন হইবে, তখন যোগ্যকালে অন্যতর বুদ্ধ উদিত হইয়া আমার উপদিষ্ট ধর্ম্ম পুনরায় উদ্ধার করিবেন।'

সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম্মে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেলে তিনি শেষ জীবনে নানা তথ্যের সংযোগে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হন এবং দ্বিতীয় প্রকাশিতব্য সংস্করণের একটি ভূমিকাও রচনা করে রাখেন [এই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য]। ভূমিকা রচনার তারিখ ১০ই জুলাই ১৯২২। ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটায় (৯ জানুয়ারী ১৯২৩) তাঁর কন্যা ও জামাতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও প্রমথ চৌধুরী এটি প্রকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 'প্রকাশক শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী। ২০নং মে-ফেয়ার, বালিগঞ্জ' আখ্যাপত্র সহ এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সাল-এ। এই পুনর্মুদ্রণ সেই সংস্করণ থেকে গৃহীত। এতে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী যে ভূমিকাটি রচনা করেন (১ জুন ১৯২৩) তা গ্রন্থের মুখপত্র হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল। সেটিও এর সঙ্গে মুদ্রিত হল পাঠকদের গোচরার্থে। এই ভূমিকায় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশে সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগের কথা প্রমথ চৌধুরী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বেই সমসাময়িককালে ইউরোপে বৌদ্ধধর্মকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শুরু হয়। ম্যাক্সমুলার একদা নিজেকে বুদ্ধানুগামী বলে ঘোষণা করেছিলেন। টমাস্ মান্, হেরম্যান হেসে, হেরম্যান ওল্ডেনবার্গ, কার্ল নিউম্যান প্রভৃতিরা বৌদ্ধশাস্ত্রাদি আলোচনা করে এর সারতত্ত্বকে

জগদ্বাসীর সম্মুখে প্রচার করেন। এদেশেও বিভিন্ন মনীষী বুদ্ধজীবনকে নিয়ে গ্রন্থরচনায় উদ্যোগী হন। সত্যেন্দ্রনাথ এঁদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেও তিনি পরিচিত হন। 'বৌদ্ধধর্ম' বইটিতে তাঁর ঋণস্বীকারের উল্লেখ থেকে জানতে পারি Rhys-Davids (Dialogues of the Buddha), Kern's Manual of Buddhism, Vincent A. Smith (Asoka), Fryer (The Buddhist Discovery of America, Harper's Magazine (July, 1901), Rajendralal Mitra (The Antiquities of Orissa) প্রভৃতি ইংরেজি গ্রন্থের সঙ্গে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বৌদ্ধধর্ম', অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর তথ্যাদি আহরণ করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে একটি কবিমন বাস করত। তার প্রমাণও এই বইয়ে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। একাধিক পালিসূত্রকে তিনি অনবদ্য বাংলার অনুবাদ করেছিলেন। পাঠক গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে তার প্রমাণ পাবেন।

৮।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর পঁয়ষট্টি বছর পার হয়ে গেছে, অথচ এই মূল্যবান গ্রন্থটি এতাবৎ পুনর্মুদ্রণে কেউ এগিয়ে আসেন নি। বিদ্যোৎসাহী প্রকাশক শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রখ্যাত প্রকাশনা করুণা প্রকাশনী থেকে এটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে সংস্কৃতিবান সকল মানুষের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে রইলেন। প্রমথ চৌধুরীর মূল্যবান ভূমিকাটির সঙ্গে আমাকে একটি প্রাসঙ্গিক পরিচায়িকা লিখে দিতে তিনি অনুরোধ করেন সত্যেন্দ্রনাথের উপর গবেষণারত আছি এই সংবাদ পেয়ে। সম্পাদক হিসাবে আমাকে গ্রহণ করেন তিনি আমার নিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেওয়ায় তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীঅমিত রায়, শ্রীমতী সুব্রতা ঘোষ-এর আনুকূল্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। আমার জিজ্ঞাসাকে যারা দীর্ঘদিন ধরে জাগরূক করে রেখেছেন সেই গ্রন্থকারদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীহাররঞ্জন রায়, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সুকুমার সেন, সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের, প্রণবকুমার মিত্র, সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, মহেশচন্দ্র ঘোষ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, Oldenburg প্রভৃতির রচনাবলী থেকে আমি প্রভূত উপকৃত হয়েছি।

সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিদের পরিতৃপ্তি ঘটলেই এই পুনর্মুদ্রণ প্রকাশের সার্থকতা অনুভূত হবে।

বারিদবরণ ঘোষ

বৌদ্ধধর্ম্ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১। বৌদ্ধধর্ম্ম কি?

ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস মানবধর্ম্মের ভিত্তিভূমি বলিয়া সামান্যতঃ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্য, খৃষ্টান, মুসলমান ধর্ম্ম, পৃথিবীর প্রধান এই তিন ধর্ম্ম ঐ ভিত্তির উপরে স্থাপিত। কিন্তু ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে, অনাত্মবাদী নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া, কোটি কোটি মনুষ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে? আমি এই প্রসঙ্গে বুদ্ধোপদিষ্ট আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের কথা বলিতেছি, পরবর্ত্তী কালে সে ধর্ম্মের আকার প্রকার পরিবর্ত্তনের কথা স্বতন্ত্র। বুদ্ধদেব যে প্রকাশ্যভাবে আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেন তাহা নহে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে তাঁহার ধর্ম্মকে নিরীশ্বর বলা অসঙ্গত বোধ হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ লক্ষণ জানিতে হইলে, "ধর্ম্মচক্রের" উপর স্বভাবতঃ আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কেননা বুদ্ধত্ব লাভের পরক্ষণেই প্রকাশ্য সভায় তাহা বুদ্ধের প্রথম উপদেশ। ইহাতে ঈশ্বর-বিষয়ক প্রসঙ্গের কোন নিদর্শন নাই। ইহা হইতে আমরা যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি, তাহার নাম দুঃখতত্ত্ব।

দুঃখ কি?

দুঃখের উৎপত্তি কোথায়?

দুঃখের নিবৃত্তি কিসে হয়?

বুদ্ধদেব এই দুঃখ-নিবৃত্তির যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ। সে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ, আপনার যত্ন চেষ্টায় সে পথে চলিতে হইবে। সেই পথের যাত্রী যাঁহারা, তাঁহাদের নির্ভর-দণ্ড আত্মপ্রভাব; ইহাতে দেব-প্রসাদের কোন কথা নাই। এই ধর্ম্মচক্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেব সহস্র সহস্র উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি সূত্র-পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু দু' একটি বাদে তাহাতে ব্রহ্মবিষয়ক কোন উপদেশ নাই; তাঁহার সঙ্ঘের নিয়মাবলীর মধ্যেও দেবার্চ্চনার কোন বিধিব্যবস্থা দেখা যায় না। একটীমাত্র সূত্র আছে, যাহাতে ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা হইতে

তাঁহাকে ব্রহ্মবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করা ঠিক হয় না; সে সূত্রটির নাম "তেবিজ্জ সুত্ত" (ত্রিবিদ্যা সূত্র)।* এই সূত্রে আমরা দেখিতে পাই, প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মনোভাব কিরূপ ছিল, কি ভাবে তিনি আর্য্যদেবতা ব্রহ্মকে বৌদ্ধ মন্দিরে স্থান দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সূত্রে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তিনি ব্রহ্মকে নিমিত্তমাত্র করিয়া, প্রকৃতপক্ষে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান গৌণ, নীতিশাস্ত্র উহার মুখ্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। তিনি জ্ঞান ধ্যান কিম্বা ভক্তিযোগে ব্রহ্মে পৌঁছিতে যত্নশীল নহেন। ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার নিজের কি ধারণা, ঐ সূত্রে তাহার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। উহাতে যে দুই ব্রাহ্মণ যুবক বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসম্মিলনের প্রয়াসী, কিন্তু ব্রহ্মের সহবাস লাভ বৌদ্ধধর্ম্মের মোক্ষপদ নহে। সে ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য যে নির্ব্বাণমুক্তি,—ব্রহ্মেতে বিলীন হওয়া তাহার অর্থ নহে। নির্ব্বাণ কি?—নির্ব্বাণ শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায়, কিন্তু মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, নির্ব্বাণের অর্থ দুঃখনির্ব্বাণ, অর্থাৎ দুঃখক্লেশের ঐকান্তিক পরিসমাপ্তি। এই অবস্থায় জীব দুঃখযন্ত্রণা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের সার উপদেশ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কর্ম্মগুণে, নিজ পুণ্যবলে, আত্ম-প্রভাবে, স্বার্থ বিসর্জ্জনে, সত্যোপার্জ্জনে, প্রেম দয়া মৈত্রী বন্ধনে, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলনিদান নির্ব্বাণরূপ মুক্তি লাভের অধিকারী। যে পথে চলিতে হইবে, তাহা বুদ্ধপ্রদর্শিত আষ্টাঙ্গিক ধর্ম্মপথ। গম্যস্থান নির্ব্বাণমুক্তি—সারথী আত্মশক্তি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নৈতিক জীবনের মধ্যেই বিচরণ করে—তাহার শেষ সীমা দুঃখনির্ব্বাণ। সুতরাং তেবিজ্জ সুত্ত হইতে আলোচ্য বিষয়ের কোন অকাট্য মীমাংসা করা সম্ভব নহে।

জীবাত্মা, পরমাত্মা, সৃষ্টি, পরকাল সম্বন্ধে যে-সকল প্রহেলিকা মানব-হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে, বুদ্ধদেব এই সকল গূঢ় প্রশ্নের উত্তরদানে বিমুখ ছিলেন। তাঁহার কোন শিষ্য তাঁহার নিকট এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, তিনি কোন উচ্চবাচ্য করিতেন না, মৌনভাব ধারণ করিতেন।

মালুঙখ্যপুত্র যখন এই সকল তত্ত্বে জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন তখন বুদ্ধদেব কহিলেন :—

—হে মালুঙখ্যপুত্র, আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি, তুমি আমার শিষ্য

---

* পরিশিষ্টে এই সূত্র সমালোচিত হইয়াছে।

হও, আমি তোমাকে বলিয়া দিব জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ আত্মা এক কি বিভিন্ন, মৃত্যুর পর তথাগত নবজীবন ধারণ করিবেন কি না? এই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আমি উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি?

—না, গুরুদেব, তাহা দেন নাই।

—হে মালুঙখ্যপুত্র, তুমি আহত হইয়া চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ, তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ, তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি যাহা প্রকাশ করি নাই, তাহা অপ্রকাশিত থাকুক; যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা প্রকাশিত হউক।"

মিলিন্দ-প্রশ্নে যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী নাগসেনের যে কথোপকথন আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের এই মৌন ভাবের কারণ সমালোচিত হইয়াছে।

নাগসেন কহিতেছেন, "এমন সকল প্রশ্ন আছে, নিরুত্তর থাকাই যাহার উত্তর;—সে সকল প্রশ্ন কি?—না,

জগৎ নিত্য কি অনিত্য?

দেহ আত্মা এক, কি পৃথক?

মরণোত্তর তথাগত জীবিত থাকিবেন কি না?

এই সমস্ত প্রহেলিকা এক পাশে ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদের কোন উত্তর নাই—উত্তরে কোন লাভ নাই। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে তথাগত বাক্যব্যয় করিতে উৎসুক ছিলেন না।"

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে, বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্ম্ম ঈশ্বরবাদ নহে—উহা নীতিমূলক ধর্ম্ম। উপনিষদ যেমন জ্ঞানপ্রধান, আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ নীতিপ্রধান ধর্ম্ম। তবে কি এই নীতিশাস্ত্র বুদ্ধদেবের স্বকপোল কল্পিত কোন অভূতপূর্ব্ব নূতন ব্যাপার? তাহাই বা কি করিয়া বলিব? ইহাতে এমন কিছু নূতন তত্ত্ব লক্ষিত হয় না, যাহা বুদ্ধযুগের পূর্ব্বে অবিদিত ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ Rhys Davids যথার্থই বলিয়াছেন—

বুদ্ধযুগের বহুপূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণগণ তত্ত্ববিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের গূঢ়তম প্রশ্নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন, এবং তাহার মধ্যে কোন না কোন সম্প্রদায়ে যে গৌতমের তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অধিকাংশ মত ইতিপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি কঠোর তপশ্চরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা নীতিশিক্ষাকে উচ্চতর আসন দিয়াছিলেন, এবং

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের উপদিষ্ট মতগুলিকে বিধিবদ্ধ আকার দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মবীরের ন্যায় তিনিও তাঁহার সমসাময়িক প্রভাবের বশবর্ত্তী ছিলেন, এবং তাঁহার দার্শনিক মতবাদ যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।”

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, তবে ব্রাহ্মণ সমাজে বুদ্ধের এত প্রতিপত্তি কেন হইল? তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা স্বধর্ম্ম—বৈদিকধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি কারণে এই নৈতিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বুদ্ধ-পতাকার তলে দলে দলে ছুটিয়া আসিলেন? তাহার অনেকগুলি কারণ আছে—কয়েকটি এই স্থলে সূচিত হইতেছে।

প্রথম, তাঁহার ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম উদারতা।

অক্কোধেন জিনে কোধং
অসাধুং সাধুনা জিনে—

এই যাঁহার গুরুমন্ত্র, যাঁহার নীতিশৈলোপরি 'বিশ্বমৈত্রী' প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার ধর্ম্ম যে জগন্মান্য হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

দ্বিতীয়, যে আকারে ও যে প্রকারে সেই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সহজ প্রাঞ্জল গ্রাম্য ভাষা, সময়োপযোগী প্রসঙ্গ, সুযৌক্তিক, সুবোধ্য, প্রাণস্পর্শী, মধুর ভাষণ,—এই সব ছিল তাঁহার সম্বল। তিনি যাহা বলিতেন লোকেরা তাহা আগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিত, এবং অন্তরের সহিত গ্রহণ করিত।

তৃতীয়, যাহা প্রচার-কার্য্যে বিশিষ্টরূপে ফলদায়ী হইত, তাহা বুদ্ধদেবের নিজত্ব, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও অকৃত্রিম সরলতা, তাঁহার চরিত্রমাধুরী, ও মনোমুগ্ধকারী মোহিনী শক্তি। বুদ্ধদেব আপনাতে কোন ঐন্দ্রজালিক দৈবশক্তি আরোপ করেন নাই, অথচ তাঁহার কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহার গুণে এই ধর্ম্ম এত অল্পকালমধ্যে এত অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচারিত হইল!

শাক্যমুনি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সে সময়ে বৈদিক পূজার্চ্চনা কতকগুলি জটিল কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই ক্রিয়াকাণ্ডের উপদেশদাতা যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তাহাদের আধিপত্যের সীমা নাই। তিনি ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদিগের জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদিগের বাহ্যাড়ম্বরময় ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে, তাঁহার সরল ধর্ম্ম—সত্য, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, মৈত্রী, আত্মসংযম, সদাচার,—প্রচলিত সহজ গ্রাম্য ভাষায়, জাতিকুলনির্ব্বিশেষে আপামরসাধারণ

সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন।* তিনি এইরূপ উৎসাহ এবং ওজস্বিতা সহকারে প্রায় ৪৫ বৎসর কাল অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী, এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক স্বমতানুযায়ী ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের পর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার হস্তের বীজ লইয়া দেশদেশান্তরে ছড়াইবার জন্য বাহির হইলেন।

তাঁহার জীবনরহস্যে, তাঁহার হৃদয়স্পর্শী মধুর ভাষণে যে কি অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা তাঁহার জীবনবৃত্তে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

২। বুদ্ধ-চরিত।

বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত "ললিত বিস্তর", অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত, মহাবগ্‌গ, জাতক ও অন্যান্য পালী, সিংহলী, তিব্বতী গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থে (বুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা বিবৃত আছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না।) এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বুদ্ধজীবনী বিষয়ে যেমন কতক কতক ঐক্য আছে, তেমনি বিস্তর পার্থক্যও লক্ষিত হয়। ঐক্যমূলক ঘটনাগুলি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থ পরস্পর তুলনা করিয়া বাছিয়া বাছিয়া বুদ্ধের ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী যতদূর সংগ্রহ করা সম্ভব, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অতীব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাহা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিবরণী তাঁহাদের রচিত চিত্রেরই প্রতিলিপি।**

বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ন্যূনাধিক পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে নেপাল ও উত্তরবিহারের মধ্যস্থিত খণ্ড খণ্ড রাজ্যের মধ্যে শাক্য জাতির নিবাস-ভূমি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, তাহার রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন, তাহার রাজধানী কপিলবস্তু রোহিণী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত। নদীর এক পারে শাক্যজাতি, অপর পারে কোলজাতি—এই দুই জাতি একই বংশবৃক্ষের শাখা প্রশাখা বলিয়া অনুমিত হয়। কোল-রাজ্যের রাজধানী দেবদহ। এই দুই জাতি নদীর জল লইয়া ও অন্যান্য কারণে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকিত, কিন্তু বুদ্ধযুগের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, তাহারা অপেক্ষাকৃত শান্তি সদ্ভাবে বাস

* আমি একথা বলিতে চাহি না যে বুদ্ধদেব প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তাহাতে ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছিল সন্দেহ নাই। শুধু ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান কেন, তিনি সকল প্রকার অভিমানেরই বিরোধী ছিলেন।

** ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত "বুদ্ধদেব" হইতে আমি এই ভাগ সঙ্কলনে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। মূল সংস্কৃত ও পালী শ্লোকসকল ইহাতে উদ্ধৃত, এই এক মহৎ লাভ।

করিতেছে—বিবাহসূত্রে তাহাদের আদান প্রদান চলিতেছে। অঞ্জন. যিনি দেবদহের রাজকুমার, তাঁহার কন্যাদ্বয় মায়া ও মহাপ্রজাপতি রাজা শুদ্ধোদনের দুই রাণী। মায়া দেবীর গর্ভে. কপিলবস্তু ও দেবদহের মধ্যবর্ত্তী লুম্বিনী উদ্যানে* বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। শুদ্ধোদন পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখিলেন, গৌতম-গোত্রজ বলিয়া সিদ্ধার্থের অপর নাম গৌতম,—প্রথম বয়সে এই তাঁর ডাকনাম ছিল। তা ছাড়া বোধিসত্ত্ব, তথাগত, শাক্যমুনি প্রভৃতি তাঁর উপাধির অন্ত নাই। কালক্রমে আর সব নাম এক "বুদ্ধ" নামে বিলীন হইয়া গেল।

গৌতমের জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে মায়া দেবীর মৃত্যু হয়। তখন কুমারের প্রতিপালনের ভার উঁহার বিমাতা মহাপ্রজাপতির প্রতি অর্পিত হয়।

কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন, সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট চতুঃষষ্ঠি কলা ও অনেকপ্রকার লিপি-রচনা শিক্ষা করেন। সিদ্ধার্থের পাঠ সমাপন হইলে, তিনি কপিলবস্তু নগরে প্রত্যানীত হন। কতিপয় বৎসর পরে পুত্রের যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া, শুদ্ধোদন উঁহার বিবাহের আয়োজন করেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যত রূপবতী, গুণবতী, বিবাহ-যোগ্যা কন্যা আছে, সিদ্ধার্থের বিবাহ-সভায় তাহাদের নিমন্ত্রণ করা হোক্।

তদনুসারে অনেকানেক মনোরমা স্বরূপা কন্যকা সিদ্ধার্থের হস্তপ্রার্থী হইয়া আসে। তাহাদের একটা মেলা বসিয়া গেল। কথা হইল তাহাদের রূপ গুণ অনুসারে কুমার প্রত্যেক কুমারীকে এক একটা পুরস্কার দিবেন। সুন্দরীগণ কুমারের সমক্ষে আনীত হইলে তাঁহারা ক্ষণকালের তরে দাঁড়াইয়া একে একে চলিয়া গেলেন, কুমারও প্রত্যেকের হাতে হাতে তাঁহার যোগ্যতানুসারে এক একটি পুরস্কার দিলেন, কিন্তু কাহারও মুখপানে সতৃষ্ণভাবে চাহিয়া দেখিলেন না। সব শেষে সুপ্রবুদ্ধের কোল-কন্যা যশোধরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া কুমারের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জন্য কি কোন পুরস্কার নাই"? কুমার একটু হাসিয়া আপন কণ্ঠ হইতে একটি মুক্তার মালা খুলিয়া যশোধরার গলায় পরাইয়া দিলেন। অমনি সভাস্থ সকলে জয়জয়কার করিয়া উঠিল। প্রাচীন প্রথা অনুসারে বরকে অশ্ব চালনা ও অপরাপর ব্যায়াম ক্রীড়ায় পরীক্ষা দিতে হইল; সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যশোধরাকে পত্নীরূপে বরণ করেন, পরে কন্যাকর্ত্তার সম্মতিক্রমে রাজা মহা সমারোহে এই

* বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনীর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ অশোক-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই বিবাহের ফলে সিদ্ধার্থের রাহুল নামে একটি পুত্র জন্মে।

সিদ্ধার্থ দয়ার অবতার হইয়া জন্মিয়াছিলেন। আহারের জন্যই হউক আর আমোদের জন্যই হউক, পশুমারণ কর্ম্মে তাঁহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা ছিল। দেবদত্ত প্রভৃতি তাঁহার বাল্য সহচরগণ মৃগয়ার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল, কিন্তু জীবহত্যা নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য বলিয়া তিনি তাহাতে কিছুতেই যোগ দিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প আছে যে, একদা সিদ্ধার্থ তাঁহার আত্মীয় দেবদত্তের সহিত গ্রামান্তরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দেবদত্ত ধনুর্ব্বাণ হস্তে শিকারের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন; তিনি একটি উড়ন্ত হংসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক বাণ ছুঁড়িলেন আর পাখীটি বাণবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি সিদ্ধার্থ দৌড়িয়া গিয়া পাখীটাকে ধরিয়া সেই বাণ আস্তে আস্তে টানিয়া বাহির করিলেন, নানা গাছ গাছালী ঔষধ প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ হইল। দেবদত্ত বলিলেন "আমি পাখী মারিয়াছি, ওটা আমারই প্রাপ্য"—সিদ্ধার্থ তাহাতে সম্মত নহেন। এই পাখী লইয়া দুজনার কাড়াকাড়ি হইতে লাগিল, শেষে ধার্য্য হইল, এই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য এক বিচার-সভা ডাকা হোক্। বিচারকর্ত্তারা কেহ সিদ্ধার্থের পক্ষে কেহ দেবদত্তের পক্ষে মত দিলেন, পরিশেষে প্রধান বিচারপতি বলিলেন যে, "পাখীটিকে যিনি প্রাণদান করিয়াছেন উহা তাঁহারই প্রাপ্য, যিনি বধ করিতে উদ্যত তিনি কখনই তাহা পাইবার যোগ্য নন, অতএব উহা সিদ্ধার্থকে দেওয়া বিধেয়"। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিচারে তাহাই নিষ্পত্তি হইল। সিদ্ধার্থ অনেক ঔষধপত্র দিয়া, অনেক যত্নে পাখীটির প্রাণ রক্ষা করিলেন, তাহার ক্ষতস্থান প্রকৃতিস্থ হইল, পরে সে গাহিতে গাহিতে মুক্ত আকাশে উড়িয়া গেল।

বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থের বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার মনে সেই বৈরাগ্যের ভাব বলবত্তর হইয়া উঠে। শুদ্ধোদন পুত্রের এইরূপ মনোভাব জানিতে পারিয়া তার প্রতিবিধান কল্পে অনেক চেষ্টা করিলেন। তাঁহার জন্য বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন—নৃত্য গীত বাদ্য প্রমোদ হিল্লোলে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। যুবরাজ কিছুতেই পোষ মানেন না। এই সময় এমন কতকগুলি ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহাতে তাঁহার মনের আগুন যেন ইন্ধনযোগে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

একদিন যুবরাজ নগরের বাহিরে উদ্যানভূমি দর্শন করিবার মানস করেন।

শুদ্ধোদন নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যুবরাজ উদ্যান দর্শন করিতে যাইবেন, পথ ঘাট সকল যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়। যে পথ দিয়া তিনি গমন করিবেন ঐ পথ ছত্র, ধ্বজ পুষ্পাদি দ্বারা বিভূষিত ও গন্ধোদক দ্বারা অভিষিক্ত করা হউক; পথের ধারে পূর্ণ কুম্ভ ও কদলী বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হউক। রাজার আদেশে উদ্যান পথ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও সজ্জিত হইল। কিন্তু ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্র—কে তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে? নগরোদ্যানে ভ্রমণকালে কতকগুলি অপ্রীতিকর দৃশ্য তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

প্রথম দিন একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাঁহার ভ্রমণ-পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সারথীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তি জরাদ্বারা অভিভূত হইয়া, জীর্ণ শীর্ণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোন কর্ম্মকাজ করিবার শক্তি নাই, বনমধ্যে যেমন জীর্ণ কাষ্ঠ পড়িয়া থাকে, ইহার দশাও সেইরূপ।

অপর একদিন দক্ষিণ দ্বার দিয়া তিনি উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় একটি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সারথী বলিলেন, "এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসন্ন এবং আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।"

আর একদিন দেখিলেন তাঁহার সম্মুখ দিয়া এক শব-যাত্রীর দল চলিয়াছে। মৃতদেহ একটি পালঙ্কোপরি স্থাপিত এবং তাহার চারিদিকে শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনবর্গের বিলাপ-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সারথী বলিলেন, "দেব, এই লোকটির মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি গৃহ, পিতা, মাতা আত্মীয়স্বজনবর্গ—ইহাদের সকলকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে। আহা, তাহার আপন প্রিয়জনদের কাহাকেও আর সে দেখিতে পাইবে না।"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাধি, জরা, মৃত্যু কি ইহাদের কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম? সারথী উত্তর করিলেন, "যুবরাজ, তাহা নহে, মনুষ্যমাত্রেই এই সকলের অধীন। আপনি, আমি, আপনার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই এই পথ অনুসরণ করিবে। ব্যাধি, জরা, মৃত্যু কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "যৌবনে ধিক্, যাহার পশ্চাৎ জরা ধাবমান হয়। আরোগ্যে ধিক্, যাহা বিবিধ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত, যাহা স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় অলীক। জীবনে ধিক্, যাহা এইরূপ নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর। এই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু অতিক্রম

করিবার যদি কোন উপায় থাকে, তাহা যেমন করিয়াই হউক আবিষ্কার করিতে হইবে।"

অন্য একদিন সিদ্ধার্থ উত্তর দ্বার দিয়া উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি শান্ত দান্ত সংযত ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যিনি এই কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এই লোকটি কে?" সারথী বলিল, "ইনি একজন ভিক্ষুক, বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া সাধু জীবিকা অবলম্বন করিয়াছেন। সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন, এবং দীনহীন ভাবে সামান্য আহার সংগ্রহ করিতেছেন।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "এই আমার মনের মানুষ! ইনি যে পথে চলিতেছেন সেই মার্গ যিনি অনুসরণ করেন, তিনিই ধন্য।" এই লোকটিকে দেখিবামাত্র সিদ্ধার্থ তাঁহার আসন্ন জীবন চিত্র যেন মানসপটে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি পথে বাহির হইতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। কথিত আছে যে যুবরাজ চতুর্থবার উদ্যান ভ্রমণে সন্ন্যাসী দর্শনানন্তর প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দূতমুখে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল—তিনি বলিয়া উঠিলেন: "হায়, এ কি এক নূতন বাঁধনে আমি বাঁধা পড়িলাম, এই কঠিন বন্ধন ছেদন করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রজাবর্গের আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়া বিষণ্ণ বদনে বাড়ী ফিরিলেন।

এদিকে যেমন সিদ্ধার্থ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, ওদিকে তেমনি তাঁহার পিতা যে-কোন উপায়ে হউক তাঁহাকে আটেঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা। তিনি স্বীয় রাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যে ভাল ভাল নর্ত্তকী গায়িকা, যত সব চতুরা রমণী পুরুষের মন ভুলাইতে সুপটু, তাহাদের সকলকে ডাকাইয়া যুবরাজের প্রাসাদে একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে আপন মনোগত অভিপ্রায় খুলিয়া বলিলেন। ইহারাও রাজাজ্ঞানুসারে আপন আপন সম্মোহন বাণ যুবরাজের প্রতি প্রয়োগ করিতে বিরত হইল না; কিন্তু সিদ্ধার্থ এই সকল অস্ত্রে অক্ষত রহিলেন। এই সমস্ত যাদুকরী ব্যবসায়িনীরা কিছুতেই তাঁহাকে বশ মানাইতে পারিল না। তাহাদের এইরূপ বিলাসিতার কুহকজাল বিস্তৃত দেখিয়া, যুবরাজ ক্রমে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এবং ভাবিতে ভাবিতে

তাহার একটুকু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে দেখেন সেই সকল যুবতীগণ যে-যেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। আলুথালু কেশ, অপরিচ্ছন্ন বেশ,—কোথায় সেই অঙ্গসৌষ্ঠব, কোথায় সেই হাবভাব লাবণ্য! তাঁহার চক্ষে এই দৃশ্য এমন কুৎসিত কদাকার বোধ হইলে যে, তিনি যত শীঘ্র পারেন এই অলীক আমোদ প্রমোদের মায়াজাল কাটিয়া দূরে পলাইবার পন্থা ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন যে বিদায়ের কালে তাঁহার শিশুটিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইবেন ও কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিবেন, কিন্তু শয়ন-গৃহের দরজা খুলিয়া দেখেন যে, শিশুটি ফুলশয্যায় তাহার মায়ের কোলে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। শিশুকে লইতে গেলে তাহার মাও জাগিয়া উঠিবেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, তাঁহার যাওয়াই বন্ধ হইয়া যাইবে; তাই তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপে চুপে সরিয়া গেলেন।

পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে তাঁহার শ্বেতাশ্ব কণ্টক সজ্জিত ছিল। তিনি তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া সারথী ছন্দকসহ সিংহদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। দ্বারপালেরা কেহই তাঁহাকে রোধ করিল না। এই তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণ। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৯ বৎসর।

জাতকে লিখিত আছে যে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। সেই রাত্রে তাঁহার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক যোজন দূরে অনোমা নামক নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে অশ্ব হইতে নামিয়া রাজমুকুট দূরে ফেলিয়া দিলেন, ও অঙ্গ হইতে মণিমুক্তা আভরণ সকল খুলিয়া ছন্দকের হস্তে দিয়া কহিলেন, "ছন্দক, এই সমস্ত আভরণ নাও, আর কণ্টককে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও; আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম"। ছন্দক বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, "প্রভু! আমাকে ফিরাবেন না আমিও গৃহত্যাগী হইয়া আপনার অনুগামী হইব।" কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে ফিরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন বলিলেন "তোমার এখনো সন্ন্যাস গ্রহণের সময় হয় নাই, তুমি না ফিরিলে আমি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছি মনে করিয়া আমার পিতা ও বাড়ীর আর সকলে কি ভাবিবে? তুমি যাও, এবং রাজবাটীর সকলকে বল আমার সমস্তই মঙ্গল। আমি বহুকাল ধরিয়া যে প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পালন করিতে চলিলাম, আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইলেই আমি বাড়ী ফিরিব, আমার জন্য কেহ যেন চিন্তাকুল না হন।"

কুমারের আদেশক্রমে ছন্দক অগত্যা অশ্ব ও আভরণ লইয়া শোকার্ত্তহৃদয়ে

রাজভবনে ফিরিয়া গেল, এবং রাজাকে সংবাদ দিল যে, যুবরাজ গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসীবেশে কোথায় চলিয়া গেলেন তাহার কোন ঠিকানা নাই।

গৌতম ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে বিশ্রাম করতঃ পরিশেষে মগধ-রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। বিম্বিসার তখন ঐ প্রদেশের প্রবল-প্রতাপ নরপতি ছিলেন। সিদ্ধার্থ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার শরীরে আলোকসামান্য তেজঃপুঞ্জদৃষ্টে নাগরিকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা রাজসভা পর্য্যন্ত পৌছে। বিম্বিসার একদিন প্রাতঃকালে বহু পরিজন সমভিব্যাহারে বহুমূল্য ভেট লইয়া সিদ্ধার্থের সমীপে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার সুবিমল দেহকান্তি দর্শনে বিমোহিত হইলেন। পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভু! আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন। যদি আপনি আমার অনুবর্ত্তী হন, আপনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইবেন। আপনি যাহা চান সকলি পাইবেন।" তৎপরে তাঁহাকে বহুবিধ মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া কহিলেন "আমার সঙ্গে আসুন, এই দুর্ল্লভ কাম্যবস্তুসকল উপভোগ করিয়া সুখী হইবেন।" এই সাধুকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আপনার পার্শ্বচর করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে রাজা এইরূপ অশেষ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ মধুর প্রিয় বাক্যে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনার সর্ব্বথা মঙ্গল হউক, এই সকল ভোগ্য বিষয় আপনারি থাকুক, আমি কোন কাম্যবস্তুর প্রার্থী নহি। বিষয়-বাসনা আমার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। আমার লক্ষ্যস্থান স্বতন্ত্র।" পরে তিনি রাজার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "কপিল-বস্তুর রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি।" বিম্বিসার তখন বলিলেন "স্বামিন্, আমি তবে বিদায় হই। আপনি যদি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আমি আপনার ধর্ম্মের আশ্রয় লইব।" এই বলিয়া বিম্বিসার তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজার সহিত সিদ্ধার্থের এই প্রথম পরিচয়। এক্ষণে তিনি বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির নানা উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাজগৃহ ভাগীরথীর রমণীয় অধিত্যকায় অবস্থাপিত এক অপূর্ব্ব সাধনক্ষেত্র। বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ পঞ্চ শৈলখণ্ডে পরিবেষ্টিত, বাহিরের উপপ্লব হইতে সুরক্ষিত,

প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যে পরিবৃত, বিজনতাসুলভ অথচ নগরীর সন্নিকর্ষবশতঃ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের অনুকূল ইত্যাদি কারণে, ঐ সকল গিরিগুহায় বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী বাস ক'রত। তাহাদের মধ্যে আলাড় কলম ও রুদ্রক নামক দুইজন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের সঙ্গে গৌতমের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রথমে তিনি আলাড় কলমের নিকট গমন করেন। আলাড়ের তিনশত শিষ্য ছিল। গৌতম তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিকটে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সে শিক্ষায় তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি রুদ্রকের নিকট কিছুকাল ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তাহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। এই দুই গুরূপদিষ্ট জ্ঞানমার্গে তাঁহার অভীপ্সিত গম্যস্থানে পৌছিতে না পারিয়া, তিনি সিদ্ধিলাভের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে এই একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, তপশ্চর্য্যার দ্বারা দেবতাদেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব হয়, এবং দৈবশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি লাভ ও প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করা যায়। আলাড় ও রুদ্রকের নিকটে দর্শন শিক্ষা করিয়াও গৌতম যখন সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক সেই লোকবিশ্রুত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত গিয়া দেখিবেন তিনি কি ফল লাভ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সন্নিকট উরুবেলা বনে গমন করিয়া, নৈরঞ্জনা নদীতীরে পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্য্যে ছয় বৎসর যাবৎ ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "শূন্যে আলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়" তাঁহার এই তপস্যার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। এই কঠোর তপশ্চরণে তাঁহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। ক্রমে তাঁহার কর্ণছিদ্র রুদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার আহার সংযত করিয়া আনিলেন, এমন কি শেষে একটিমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, এবং এইরূপ উপবাস ও শরীর শোষণে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেলেন। অবশেষে একদিন চিন্তামগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল যে তাঁহার যথার্থই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এই অবস্থায় একটি রাখাল বালক তাঁহাকে এক বাটী দুগ্ধ আনিয়া দিল, সেই দুগ্ধ পান করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে হতাশ হইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মিত আহারাদি করিতে লাগিলেন, এবং তপস্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। এই সঙ্কট সময়ে, "যখন তাঁহার পক্ষে অপরের সমবেদনা

বিশেষ আবশ্যক ছিল, যখন অনুরক্ত জনের প্রীতি ভক্তি ও উৎসাহবাক্য তাঁহার সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে বল দিতে পারিত, তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেল। তপশ্চরণ পরিত্যাগ করার দরুন তিনি তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইলেন, এবং এই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিফলতার তীব্র জ্বালা একাকী সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।"

এই অসহায় অবস্থায় তিনি নৈরঞ্জনাতীরে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গিয়া ধ্যানমগ্ন হন। ইহার অব্যবহিতপূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসিনী সুজাতা নাম্নী একটি সাধ্বী রমণী এই বনে আগমন করেন। সুজাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"আমার একটি শিশু সন্তান হইলে বনদেবতার নিকট পূজা দিব"। যখন তিনি এই ঘোরতর উপোষণাদি কৃচ্ছ্রসাধনে ম্রিয়মাণ তপস্বীকে দেখিলেন, তিনি তাঁহাকে বনদেবতা ভাবিয়া তাঁহার সম্মুখে ভেট লইয়া আসিলেন। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, কি আনিয়াছ?" সুজাতা কহিল —"আমি আপনার জন্য এই পরম উপাদেয় পরমান্ন আনিয়াছি। ভগবন্! সদ্যঃপ্রসূত শত গাভীদুগ্ধে আমি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি, তাহাদের দুগ্ধে পঁচিশ, তাহাদের দুগ্ধে আবার বারোটি গাভী পরিপুষ্ট। এই দ্বাদশ গাভীর দুগ্ধ পান করাইয়া আমার পালের মধ্যে ছয়টি ভাল ভাল গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ দুহিয়া লই। সেই দুগ্ধ উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে সুগন্ধী মশলা দিয়া পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার ব্রত এই যে, দেবতার অনুগ্রহে আমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিলে, এই অন্ন উৎসর্গ করিয়া দেবার্চ্চনা করিব। প্রভু! এখন সেই পরমান্ন লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন"।* সিদ্ধার্থ সুজাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ, সেইরূপ আমিও যেন আমার জীবনব্রত সাধন করিতে সক্ষম হই।" এই দুগ্ধপানে তিনি শরীরে বল পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে গিয়া যোগাসনে আসীন হইলেন। সেই রাত্রে ঐ বৃক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। সেই অবধি ঐ বৃক্ষ বোধিবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন, তখন তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥

*Light of Asia—Edwin Arnold

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

এ আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া,
চর্ম্ম অস্থি মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া।
না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্ল্লভ জগতে,
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হতে।

এই আসনে বসিয়া বোধিসত্বের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেন। তিনি বৃক্ষতলে ধ্যানযোগে জগতের যে কার্য্যকারণশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা এই :—

অবিদ্যা হইতে সংস্কার।
সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (Consciousness)।
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ।
নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়)।
ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ।
স্পর্শ হইতে বেদনা।
বেদনা হইতে তৃষ্ণা।
তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি)।
উপাদান হইতে ভব।
ভব হইতে জন্ম।
জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ ও যন্ত্রণা।

অবিদ্যাই সকল দুঃখের মূল। অবিদ্যা নাশে সংস্কার বিনষ্ট হয়; পরে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে, জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়; পরিশেষে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, সর্ব্ব দুঃখ বিদূরিত হয়। এইরূপে দুঃখের মূলকারণ ও মূলচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের কারণ, এবং অবিদ্যার অপগমেই দুঃখের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের এইরূপ প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি "বুদ্ধ" এই নাম ধারণ করেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই তিনি নিম্নোদ্ধৃত উদান গান করিয়াছিলেন :—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সম্ অনিব্বিসম্
গহকারকং গবেস্সন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখার গতং চিত্তং তণ্‌হানং খয় মজ্‌ঝগা।

জন্মজন্মান্তর পথে, ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তি চয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর কয়েক সপ্তাহ বুদ্ধদেব ঐ অঞ্চলেই অবস্থান করিলেন। সপ্তম সপ্তাহে ত্রিপুষ ও ভল্লিক নামক দুইজন বণিক পাঁচশত শকট ও বিবিধ পণ্যসহ উৎকল হইতে ঐ পথে আসিতেছিলেন; দেখেন যে কাষায় বস্ত্রপরিহিত, অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান একটি তাপস-কুমার এক বৃক্ষতলে আসীন। ভোজন-বেলা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, উহারা মধুপিষ্টক প্রভৃতি নানা সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য একটি পিণ্ডপাত্রে সাজাইয়া কুমারকে নিবেদন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পিণ্ডপাত্র গ্রহণ করুন।" বুদ্ধদেব উহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পিণ্ডপাত্র গ্রহণ করিয়া উহাদের নিকট সদ্ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলেন। উহারা ভগবৎ-কথিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই দুই বণিক বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্যরূপে পরিগণিত।

বুদ্ধত্ব পাইবার পূর্ব্বে গৌতম বোধিবৃক্ষতলে যখন যোগাসনে আসীন ছিলেন, তখন "মার" অর্থাৎ পাপাত্মা সয়তান বা কামদেব স্বীয় পুত্র-কন্যা দলবল লইয়া, কত ভয়, কতপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিতেছিল,—যীশুখৃষ্টের প্রতি সয়তানের আক্রমণ যেরূপ বর্ণিত আছে, এও কতকটা সেইরূপ,—কিন্তু কিছুতেই তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেব যোগাসনে অটল রহিলেন, অপ্সরাগণের সহস্র মায়া পরাহত হইল এই সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, যখন তিনি সম্বুদ্ধ হইলেন, তখন তিনি

সোদ্ভাবিত ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া. একাকী সন্দিগ্ধ মনে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহা লোকের মধ্যে প্রচার করিবেন কি না, এই তর্ক তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, এই সব বিষয়াসক্ত চঞ্চল-চিত্ত লোকেরা তাঁহার কথা কি বুঝিবে? অবশেষে ব্রহ্মাসহাম্পতি* স্বর্গ হইতে নামিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন, এবং উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারে উৎসাহিত করিলেন;—বলিলেন যে তিনি কর্ণধার হইয়া রক্ষা না করিলে লোকেরা সংসারের মোহার্ণবে মগ্ন হইয়া অধঃপাতে যাইবে। ব্রহ্মার প্ররোচনায় বুদ্ধদেব সত্যধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইলেন। কিন্তু কাহার নিকট কোথায় যাইবেন? প্রথমে আলাড় কলম ও রুদ্রক—তাঁহার ভূতপূর্ব্ব দুই গুরুর নাম—তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহাদের নিকট তিনি অনেক শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রখর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন. ভাবিলেন তাঁহারা তাঁহার উপদেশ গ্রহণের যোগ্য পাত্র বটে; কিন্তু সন্ধান করিয়া দেখিলেন তাঁহাদের উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহার পূর্ব্বতম পঞ্চ শিষ্যের কথা স্মরণ করিলেন, ও জানিতে পারিলেন তাঁহারা বারাণসীর মৃগদাব নামক স্থানে ঋষিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার মানসে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করেন। গিয়া এই পঞ্চ ভিক্ষুর বাসস্থানে উপনীত হইলেন। প্রথমে শিষ্যেরা স্থির করিয়াছিল যে তাঁহাকে বসিবার আসন দিবে না, তাঁহার কোনরূপ আতিথ্যসৎকার করিবে না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন বুদ্ধদেব তাহাদের সমীপে আগমন করিলেন, তখন তাহার তেজঃপুঞ্জ রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া তাহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল, ও আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল; তথাপি পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া কেহ তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকে, কেহ তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করে, ইহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, আমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিও না, তথাগত এখন সম্বুদ্ধ হইয়াছেন, দিব্য জ্ঞানলাভে আপ্তকাম হইয়াছেন। আমার উপদেশ গ্রহণ কর।" এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধের পদে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "ভগবন্! দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন।" কথিত আছে যে, এমন সময় অকস্মাৎ সপ্তরত্নময় শত আসন সেই স্থানে কে যেন বিছাইয়া দিল, বুদ্ধদেব একখানি

* এই দেবতা বুদ্ধের একজন হিতৈষী সহচর বলিয়া বর্ণিত।

আসনে উপবেশন করিলেন। উপরোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোভাগে আসীন হইল। সেই সময় তাঁহার শরীর হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি নির্গত হইয়া দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল, স্বর্গ হইতে দেবতারা দলে দলে নামিয়া আসিলেন; স্বর্গধাম শূন্য হইয়া গেল। এই শুভ মুহূর্ত্তে সুমন্দ গন্ধবহ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, সুরভি পুষ্পসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। সহসা দিগদিগন্ত ধ্বনিত করিয়া ভৈরব রবে ভেরী বাজিয়া উঠিল, আর জনকোলাহল সব থামিয়া গেল। তখন বুদ্ধদেব কথারম্ভ করিলেন। তিনি পালী ভাষায় কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু উপস্থিত অসংখ্য লোকের মধ্যে প্রতিজনে ভাবিল যে, তিনি তাহারই মাতৃভাষায় তাহাকে উপদেশ দিতেছেন। সেই উপদেশের প্রতি কথা তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরে অনুবিদ্ধ হইল। তাঁহারা তাঁহার সেই কথামৃত পানে জ্ঞানতৃপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

সে উপদেশের সার মর্ম্ম এই :—

মনুষ্যেরা মোহবশতঃ বিপথে পদার্পণ করে; একদিকে বিষয়-লালসা ভোগাসক্তি, অন্য দিকে অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীর-শোষণ। আমি মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছি, সেই আষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখিতে পাইবে যে দুঃখক্লেশের মূলচ্ছেদ হইবে—শান্তি ও নির্বাণমুক্তি তোমাদের আয়ত্ত হইবে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাই "ধর্ম্মচক্র"। তাহাতে চারিটি গভীর তত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে, সেগুলি এই :—

প্রথম।—সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ, জরামরণ দুঃখময়। যাহা ভাল লাগে না তাহার সঙ্গে মিলনে দুঃখ, ভালবাসার পাত্রের বিয়োগ দুঃখময়।

দ্বিতীয়—বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ।

তৃতীয়।—এই বিষয়তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করাতেই দুঃখনিবৃত্তি।

চতুর্থ।—দুঃখনিবৃত্তির আষ্টাঙ্গিক পথ আছে, সেই পথ আশ্রয় করিয়া চলিলেই তোমরা বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

সে পথ এই অষ্টপ্রকার :—

১। সম্যক্ দৃষ্টি
২। সম্যক্ সঙ্কল্প (সঙ্কল্প ঠিক রাখা)
৩। সম্যক্ বাক্য (সত্য সরল প্রিয় বাক্য বলা)

৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত (সদাচরণ)

৫। সম্যক্ আজীব (সর্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধু জীবিকা অবলম্বন)

৬। সম্যক্ ব্যায়াম (আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ সাধন)

৭। সম্যক্ স্মৃতি (ধারণা ঠিক রাখা)

৮। সম্যক্ সমাধি (জীবনের সুগভীর তত্ত্বসকলের ধ্যান ধারণা ও নিদিধ্যাসন)

এই আষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে, পথে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি যে কয়েকটি সংযোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে, তাহা ছেদন করিতে হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট পুণ্যপথে চলিলে দুঃখ, শোক অতিক্রম করিয়া তোমরা নির্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হইবে।* তথাগত এইরূপে বারাণসীতে সর্বপ্রথমে "ধর্মচক্র" প্রবর্তন করিলেন। বুদ্ধদেবের এই হৃদয়স্পর্শী জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহার উপদিষ্ট নবীন পন্থার অনুবর্তী হইল ; তাঁহাদের পূর্বতন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ আবার নবীকৃত হইল। সর্ব্ব প্রথমে বয়োবৃদ্ধ কৌণ্ডিণ্য, যাঁহার জীবনের ত্রিকাল অতীত হইয়াছে, তিনি "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। অবশিষ্ট চারজন প্রথমে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের মনে যাহা কিছু সংশয় ছিল, আরো তর্ক-বিতর্কের পর তাহা বিদূরিত হইল ; তাহারাও একে একে বুদ্ধদেবের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইল। বুদ্ধের এই প্রথম পঞ্চ শিষ্য** ভবিষ্যতে বৌদ্ধ সমাজে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া, কালক্রমে অর্হৎমণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিলেন।

বারাণসীতে অবস্থিতি কালে প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চভিক্ষু তাঁহার উপদেশক্রমে দীক্ষিত হন। ক্রমে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; বর্ষানন্তর ৬০ জন শিষ্য হইল, তখন তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে একত্র করিয়া এই উপদেশ দিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার উপদেশ লাভে এইক্ষণে পঞ্চরিপু দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছ। এখন তোমাদের কর্তব্য যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া উচ্চ নীচ সকল লোকের মধ্যে আমার উপদিষ্ট সত্য ঘোষণা কর। আমি এক্ষণকার মত উরুবেলার বনে গিয়া আমার ব্রত উদ্‌যাপন করি।" উরুবেলায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া তিনি কতিপয় নূতন শিষ্য সংগ্রহ করিলেন, এবং সেখান হইতে রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে সশিষ্য যাত্রা করিলেন। রাজা বহু

* এই দুঃখতত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে প্রতীত্য-সমুৎপাদ বলিয়া অভিহিত।

** পঞ্চশিষ্যের নাম কৌণ্ডিণ্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প (বপ্পা), মহানাম এবং অশ্বজিৎ।

সম্মানপূর্ব্বক বুদ্ধদেবের দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া, পরদিন তাঁহাকে ভিক্ষু-মণ্ডলী সহ রাজবাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধদেব যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন, এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে, রাজা বিম্বিসার বেণুবন (বাঁশবন) নামক এক সুরম্য উদ্যান গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বৌদ্ধসমাজকে দান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। বুদ্ধদেব এখানে অনেক বৎসর বর্ষাকাল যাপন করেন, এবং তাঁহার অনেক উপদেশ এখান হইতেই প্রদত্ত হয় বলিয়া এই স্থান বৌদ্ধদের মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধ।

ইত্যবসরে এক সময়ে তিনি কপিলবস্তু গিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে রাজ্য হইতে প্রজাবৎসল যুবরাজ যখন বৈরাগ্য-দীপ্ত হৃদয়ে বাহির হইয়াছিলেন, সে এক কাল,—আর এক্ষণে সন্ন্যাসীবেশে, মুণ্ডিত কেশে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া গৌতম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, তিনি যেখানে ছিলেন সত্বর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং কাতর স্বরে কহিলেন, "এই কি আমাদের শাক্যকুলপ্রদীপ যুবরাজ সিদ্ধার্থ? তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছ, এ কি কখন সহ্য হয়? হা বৎস! এরূপ কেন হইল?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমার কুলধর্ম্ম এই।" মহারাজ কহিলেন, "সে কি কথা? কোন্ বংশে তোমার জন্ম? ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজ-পুরুষেরা কি তোমার পিতৃপুরুষ ছিলেন না? তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কখনও কি শুনিয়াছে?" গৌতম কহিলেন "আমার বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধেরা আমার পূর্বপুরুষ। তাঁহাদেরই চিরন্তন প্রথানুসারে আমি ভিখারী বেশে এই রাজদ্বারে সমাগত হইয়াছি। কিন্তু মহারাজ, আত্ম-প্রভাবে এবং প্রেমবলে, এই যে মলিনবসন দীনহীন ভিখারী, মহাপ্রতাপশালী রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও আজ তার উচ্চাসন। আমি যে অক্ষয় অমূল্য রত্ন ভেট লইয়া আসিয়াছি, তাহা পিতৃদেবের চরণে সমর্পণ করি আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন।" শুদ্ধোদন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় রাজা প্রজা মন্ত্রীবর্গ সভাস্থ সকলকে তিনি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। চতুরার্য্যসত্য, অষ্টার্য্যমার্গ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অহিংসা, অনুকম্পা, মৈত্রী, শাশ্বত শান্তিরূপিণী নির্ব্বাণ মুক্তি—এই সকল সত্য অমৃতধারার ন্যায় বর্ষিত হইল। সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন প্রীত হইলেন; তাঁহার সকল সংশয় দূর হইল, সকল ক্ষোভ মিটিয়া গেল।

যখন রাজপুত্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজপরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই উপস্থিত হইল, কেবল যশোধরা নাই। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "যশোধরা কোথায়?" তিনি আসিবেন না শুনিয়া গৌতম রাজার সহিত স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন, যশোধরা মলিনবেশে রুক্ষ আলুলায়িতকেশে ঘরে বসিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার চিরসম্বরিত প্রেমাশ্রু উথলিয়া উঠিল,—তিনি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে রাজাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভাগিনী যশোধরা এতকাল পতিবিরহে দীনবেশে, অনাহারে, অনিদ্রায়, কষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন, রাজাকে সে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বুদ্ধের মন গলিয়া গেল। তখন তিনি যশোধরা পূর্ব্বজন্মে কিরূপ গুণবতী ছিলেন, তাহার এক 'জাতক' গল্প বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণে যশোধরার হৃদয়মন আকৃষ্ট হইল, এবং বৌদ্ধদের মধ্যে সন্ন্যাসিনীশ্রেণী স্থাপিত হইবার পর তিনি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

কপিলবস্তু জনপদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধ-উপদেশ গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা সঙ্ঘভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে চারিজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। আনন্দ।

২। অনিরুদ্ধ।

৩। দেবদত্ত।

৪। উপালী।

প্রথম তিনজন তাঁহার আত্মীয়। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দের নাম করিতে হয়, যিনি বুদ্ধের মরণ কাল পর্য্যন্ত পার্শ্বচররূপে তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় রত থাকিয়া গুরুদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব স্বীয় ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহাকে উপস্থায়ক (Personal Assistant) পদে নিযুক্ত করেন।

দ্বিতীয়, রাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র অনিরুদ্ধ, যিনি বৌদ্ধতত্ত্বদর্শী সুপণ্ডিত বলিয়া বৌদ্ধসমাজে খ্যাতি লাভ করেন।

তৃতীয়, বুদ্ধের শ্যালক দেবদত্ত, ইনি ভিন্ন-প্রকৃতির লোক ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অবধি বুদ্ধের সহিত ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়।

দেবদত্তের ইচ্ছা এই যে তিনি নিজে এক নূতন সম্প্রদায় পত্তন করিয়া গৌতমের পদারূঢ় হন। এই উদ্দেশে তিনি পাঁচশত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক
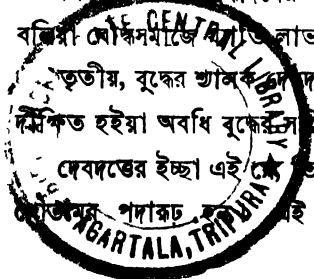
স্বতন্ত্র সঙ্ঘ স্থাপন করিবার উদ্যোগ করেন। মগধ-রাজকুমার অজাতশত্রু ইঁহাদের জন্য গয়ানদীর তীরে এক বিহার নির্মাণ করিয়া দেন। জনশ্রুতি এই যে, দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু নানাপ্রকার ছল, বল, কৌশলে স্বীয় পিতার প্রাণ সংহার করেন। অনন্তর তিনি মগধের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

রাজাকে আপনার পক্ষে টানিয়া লইয়া, দেবদত্ত বুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। তিনি যে বুদ্ধ-পদপ্রাপ্তির উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল জানিয়া বুদ্ধকে সরাইবার অন্য পন্থা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে, মগধরাজকে ফুসলাইয়া গৌতমের বিপক্ষে উত্তেজিত করিলেন, পরে তাঁহার সাহায্যে নানাবিধ গুরুমারা ফাঁদ পাতিলেন। কিন্তু যেদিকে যান কোন দিকেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। তিনি রাজার নিকট হইতে একদল ধনুর্ধারী সেনা লইয়া গৌতমকে মারিতে পাঠান—তাহারা গৌতমের নিকট যাইবামাত্র তাহাদের ধনুর্বাণ হাত হইতে খসিয়া পড়ে। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, ও বুদ্ধদেব তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া এই সৈন্যদলকে শিষ্যদলভুক্ত করেন। পরে দেবদত্ত স্বয়ং পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া শৈলশৃঙ্গ হইতে সুবৃহৎ শিলাখণ্ড অবসর বুঝিয়া বুদ্ধের মাথার উপর নিক্ষেপ করিলেন—আর অমনি তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। বুদ্ধকে পদদলিত করিতে যে উন্মত্ত বন্যহস্তী প্রেরিত হয়, সে তাঁহার সম্মুখে গিয়া নিরীহ শান্ত ভাব ধারণ করিল। এইরূপে দেবদত্তের গুরুবধ-চেষ্টা সর্ব্বৈব ব্যর্থ হইল।

রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার পর অজাতশত্রু পিতৃহত্যা মহাপাপে জর্জ্জরিত হইয়া দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্তে বিন্দু-মাত্র শান্তি রহিল না। ইত্যবসরে একদিন পূর্ণিমা তিথিতে রাজগৃহে এক মহোৎসব হয়। তদুপলক্ষে রাজমন্ত্রীগণ বৈদ্যরাজ জীবকের পরামর্শে অজাতশত্রুকে বুদ্ধের নিকট লইয়া যান। তাঁহার উপদেশ শ্রবণে রাজার চৈতন্য জন্মে এবং তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীয় পাপসকল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

এই ঘটনার পর অবধি দেবদত্তের প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসে; তখন তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘে ভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বুদ্ধের নিকট সঙ্ঘের কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তিত করিবার প্রস্তাব করেন। বুদ্ধদেব তাঁহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায়, দেবদত্ত

অসন্তুষ্ট হইয়া গয়ানদীতীরস্থ স্বীয় বিহারে ফিরিয়া যান। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চতুর্থ, রাজ-নাপিত উপালী। উপালী জাতিতে নাপিত, কিন্তু স্বীয় ধর্ম্মপ্রাণতা ও বুদ্ধিবলে তিনি বৌদ্ধমণ্ডলীর নেতৃবর্গের অগ্রগণ্য হয়েন। বৌদ্ধ-সঙ্ঘে যে জাত্যভিমান স্থান লাভ করে নাই, তাহার এই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কপিলবস্তুতে বুদ্ধদেবের অবস্থান কালে একদিন যশোধরা তাঁহার পুত্র রাহুলকে রাজপুত্রের মত বেশভূষায় সাজাইয়া তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। রাহুলের বয়স তখন সাত বৎসর। মাতা তাহাকে বলিলেন, "ঐ যে সাধু দেখ্‌ছিস্, ঐ তোর পিতা। ওঁর কাছে কত টাকাকড়ি ঐশ্বর্য্য আছে,—কাছে গিয়া তোর বাপের ধন ভিক্ষা চাস্।" রাহুল বলিল—"আমার পিতা? রাজাই ত আমার বাবা, আর কে?" যশোধরা বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন। রাহুল বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া আপন পৈতৃক সম্পত্তি ভিক্ষা করিল। বুদ্ধ কহিলেন, "বৎস! সোণা, রূপা, মণিমাণিক্য আমার কাছে নাই। আমার কাছে যে সত্যরত্ন আছে, তাহা আমি দিতে পারি, যদি আমাকে কথা দেও যে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।" এই বলিয়া রাহুলকে তাহার ধারণানুসারে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, এবং বালক পিতৃ-উপদেশ গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-সমাজভুক্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইলেন। সিদ্ধার্থ গেল, আনন্দ গেল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অনিরুদ্ধ গেল, এখন তাঁহার পৌত্রটীকে তাঁর পার্শ্ব হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল, তাঁহার রাজ্যাধিকারী আর কেহই রহিল না। রাজা সিদ্ধার্থের প্রতি এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করাতে সিদ্ধার্থ নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! যাহা হইয়াছে মার্জ্জনা করিবেন, ভবিষ্যতে এরূপ আর হইবে না। পিতৃব্যের অনুমতি বিনা অল্পবয়স্ক বালকের দীক্ষাবিধি নিষিদ্ধ—আমি এই নিয়ম করিয়া দিতেছি।" এইরূপ অনেক আশ্বাস দিয়া কিছুদিন পরে পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি রাজগৃহের বেণুবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

বুদ্ধদেবের মহাবোধি বৃক্ষতলে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কপিলবস্তু গমন ও তথা হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত প্রায় আঠার মাস কাল অতিবাহিত হয়। এই স্বল্পকালব্যাপী বুদ্ধজীবনীর ইতিবৃত্ত বৌদ্ধগ্রন্থসকলে আনুপূর্ব্বিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা-বলীর কাল নির্ণয় করা সুকঠিন, কেন না সেই সমস্ত গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন মিল নাই। যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তাহা আর কিছুই নয়—গৌতম

বুদ্ধের স্মরণীয় কোন কৃত্য অথবা স্মরণীয় কথাবার্ত্তা, উপদেশ। এই স্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে—কেবল দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই ভাগ উপসংহার করিব।

বৌদ্ধধর্ম্মে সদ্যোদীক্ষিত স্বরাপরন্তের একটি বণিক তাঁহার প্রতিবাসী আত্মীয়-বর্গকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়া গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করাতে বুদ্ধ কহিলেন,—"আমি শুনিয়াছি স্বরাপরন্তের লোকেরা বড় দুষ্ট, রাগী ও অত্যাচারী; তাহারা তোমার অপবাদ ও নিন্দা করিলে তুমি কি করিবে?"

—আমি চুপ করিয়া থাকিব।

—তাহারা যদি তোমাকে ধরিয়া মারে?

—আমি তাদের মারিব না।

—যদি তোমাকে বধ করিবার চেষ্টা করে?

—মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় নাই, শমন ত আসিবেই, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? অনেকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্ম অনেক সময় মৃত্যু চায়, কিন্তু আমি তা করিব না। তাকে ডাকিয়াও আনিব না, আর আসে ত বারণও করিব না।

এই উত্তরে গুরুদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচার কার্য্যে বাহির হইতে অনুমতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আর এক সময় একটি যুবতী স্ত্রী তাহার পুত্রটি হারাইয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহার নাম কিসাগোতমী। অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হয় এবং একটি পুত্র জন্মে। শিশুটি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল, আর চলিতে শিখিবার বয়সেই সর্পদংশনে মারা পড়ে। গোতমী মৃত শিশুটি কোলে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, যদি কেহ কোন ঔষধ দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে পারে। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহাকে বলিল,—"তুমি যে ঔষধ চাহিতেছ আমার কাছে তা নাই। কিন্তু আমি জানি একজন তোমাকে ঔষধ দিতে পারেন। ঐ গৈরিকবসনধারী বুদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে যাও, বলিয়া দিবেন।" গোতমী বুদ্ধের নিকট যাইয়া বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার নাম শুনিয়া বড় আশা করিয়া আপনার কাছে এসেছি, এখন একটা ঔষধ বলিয়া দিন যাতে আমার এই ছেলেটি প্রাণদান পায়।" বুদ্ধদেব কহিলেন—"আচ্ছা বলিয়া দিব, যদি আমি যে জিনিষ বলিতেছি আমায় তা আনিয়া দিতে পার; আর কিছু নয়, এক মুঠা সরিষার বীজ।" যখন গোতমী আগ্রহের সহিত তাহা

আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইল, তখন তিনি কহিলেন, “কিন্তু একটি সর্ত আছে। এমন ঘর থেকে আনিতে হইবে, যেখানে বাপ, মা, স্বামী, পুত্র কিম্বা ভৃত্য, ইহার কোন একজনের মৃত্যু হয় নাই।” গোতমী তাহাই অঙ্গীকার করিয়া মৃত শিশু কোলে বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। এক মুঠা সরিষা দিতে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বাড়ীতে মা-বাপ-স্বামী-পুত্র কি ভৃত্য কেহ মরিয়াছে কি না?” তাহারা বলিল, “বলেন কি? জীবন্ত লোক অল্প, মৃতের সংখ্যাই অধিক।” কেহ বলে আমার একটি পুত্র মরিয়াছে, কেহ বলে আমার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে; কেহ বলে আমার ভৃত্যটি মরিয়াছে। অবশেষে যেখানে একটি লোকও মরে নাই, এমন গৃহ না পাইয়া রমণী বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, সরিষার বীজ এনেছ কি?” গোতমী বলিলেন, “প্রভো, আনি নাই। যাদের জিজ্ঞাসা করি তাহারা বলে জীবন্ত লোক অল্প, মৃতব্যক্তিই অনেক।” তখন বুদ্ধ তাঁহাকে জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিল, তখন সান্ত্বনা লাভ করিয়া বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইলেন।

বৌদ্ধভিক্ষুরা একদিন বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভগবন্! সন্ন্যাসাশ্রমী ভিক্ষুরা স্ত্রীলোকদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে?”

বুদ্ধদেব কহিলেন—তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিও না।

—যদি তাহারা সম্মুখে আসিয়া পড়ে?

—তাদের দেখিয়াও দেখিও না, এবং তাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।

—যদি তাহারা আমাদের সহিত কথা কহে তাহা হইলে কি করিব?

—যদি কথা কহিতেই হয়, মনে কোন কুভাব না থাকে, পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত থাকিবে।

বুদ্ধদেব আরও কহিলেন:—

“বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে মাতৃতুল্য, যুবতীকে ভগিনীতুল্য, অল্পবয়স্ক বালিকাকে দুহিতা সমান জ্ঞান করিবে।

“পরস্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা তপ্তলৌহখণ্ড দ্বারা চক্ষু উৎপাটন করা ভাল।

“সাবধান! সংযমী হও, কামরিপুকে হৃদয়ে স্থান দিও না। রমণীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া তোমরা শ্রমণের ব্রত পালন করিবে।”

এইরূপে তাঁহার জীবনের অশীতি বৎসর গত হইল; এই দীর্ঘকাল বিনা

দুঃখে কষ্টে, বিনা সঙ্কটে অবাধে কটিয়া গেল, এমন মনে করা ঠিক নয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার উপর দিয়া কত বিঘ্ন বাধা গিয়াছে, তিনি কত বিপত্তির মধ্যে পড়িয়াছেন বলা যায় না; তথাপি তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। গৃহস্থেরা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবিচ্ছেদে তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাঁহার কত অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় আধিপত্য নাশ ভয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাঁহার শিষ্য দেবদত্ত একবার তাঁহাকে যে বিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এই জীবনী হইতে বুদ্ধদেবের নিত্য নিয়মিত জীবনকৃত্য আমরা কতকটা কল্পনা করিতে পারি,—কিন্তু শুধু কল্পনা নহে, অনেকানেক বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা তাহা বর্ণিত দেখিতে পাই। তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কোন পরিচারকের সাহায্য ব্যতিরেকে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। তখন হইতে ভিক্ষার্থে গ্রামে যাইবার পূর্ব্বে যে সময়টুকু থাকিত, তাহা নির্জ্জনে ধ্যানে যাপন করিতেন। বাহির হইবার সময় হইলে তিনি ভিক্ষুকদের ন্যায় বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে কখনো একাকী, কখনও বা অনুচরসহ সন্নিহিত গ্রামে কিম্বা নগরে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিনির্গত হইত। বিহঙ্গমের কলরবে এবং আকাশ হইতে মধুর ধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ নিনাদিত হইত। তাঁহার শুভাগমনের নিদর্শন দৃষ্টে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, পুষ্পমালা উপহার লইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইত। তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইত যে, কে তাঁহার আতিথ্য করিবে। অনুগ্রহ করিয়া আজ আমার গৃহে পদার্পণ করুন, আপনার জন্য, আপনার অনুচরবর্গের জন্য আহার প্রস্তুত,—এই বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া, উপস্থিত জনের মধ্যে কোন গৃহস্বামী তাঁহাকে অনুচরবর্গসহ গৃহে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের আতিথ্য করিতেন। আহার শেষ হইলে বুদ্ধদেব সমবেত লোকসকলকে উপদেশ দিতেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ বা গৃহস্থের উপদেশ গ্রহণ করিত; আর যাঁহাদের তদপেক্ষা উচ্চাভিলাষ, তাঁহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। পরে উঠিয়া তিনি নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন; সেখানে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দিবসের গতাগত কার্য্যসকল স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিতেন। তৎপরে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ উপদেশ দিতেন "সত্যপরায়ণ হও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। পৃথিবীতে বুদ্ধদর্শন দুর্লভ। বুদ্ধের উপদেশ লাভের সুযোগ অবহেলা করিও না।" পরে তাঁহার পুষ্পবাসিত কক্ষে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। সন্ধ্যার সময় ইচ্ছা

হইলে স্নান করিতেন। তদনন্তর লোকেরা আশপাশের গ্রাম বা নগর হইতে আসিয়া তাঁহার বাসস্থানে সম্মিলিত হইলে পর, তিনি তাহাদের ধীশক্তি ও ধারণা অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; তাহারা তাঁহাকে আপন আপন আধ্যাত্মিক অবস্থা জ্ঞাপন করিত; যাহার যাহা জানিবার ইচ্ছা, তিনি তাহা পূর্ণ করিতেন; যাহার যে কোন বিষয়ে সংশয়, তাহা মিটাইয়া দিতেন। এইরূপে একপ্রহর রাত্রি কাটিয়া যাইত; পরে সকলকে সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে বিদায় দিতেন। অবশিষ্ট কাল কতক ধ্যান, কতক বা নিদ্রায় যাপন করিতেন, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া কাহার কি আবশ্যক, কাহাকে কিরূপ উপদেশ দিতে হইবে, কি উপায়ে লোকের দুঃখ মোচন ও কুশল বর্দ্ধন করিবেন, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দিবসের কার্য্য স্থির করিতেন।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ তিন মাসের ঘটনাবলীর সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহা হইতে এবং অন্যান্য প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে দেখা যায়, যে বর্ষার চারিমাস ছাড়া অবশিষ্ট কয়েক মাস তিনি প্রায় প্রত্যহ আট দশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার বল, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রবুদ্ধ হইবার পর প্রায় ৪৫ বৎসর তিনি শ্রাবস্তী, বৈশালী, রাজগৃহ, কুশীনগর, এই সকল প্রদেশে স্বীয় মতানুযায়ী ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। এইরূপে দক্ষিণ-পূর্ব পাটনা হইতে উত্তর-পশ্চিম সরস্বতী পর্য্যন্ত এক দিকে প্রায় দেড়শত ক্রোশ, অন্য দিকে পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যাপিয়া তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বহুবিধ জনপদের সমাগমে তিনি মানবপ্রকৃতি—মনুষ্যের ভাবগতি, রীতিনীতি, সুখদুঃখ, আশা ভরসা তলাইয়া বুঝিবার বিস্তর সুযোগ পাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

বুদ্ধদেবের যখন অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রারম্ভ হইতে চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর, তখন তিনি পাটলিপুত্র, আধুনিক পাটনা নগরের স্থানে গঙ্গা পার হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন রাজা অজাতশত্রুর মন্ত্রীগণ পাটলিপুত্রের দুর্গ নির্মাণে ব্যস্ত, মগধের ভাবি রাজধানীর সেই প্রথম পত্তন। তাহার রাজ্যশ্রী সহস্রবৎসর স্থায়ী হইবে, বুদ্ধ এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান। সেখান হইতে বৃজিজাতীয় লিচ্ছবিদের আবাসস্থান বৈশালী গমনপূর্ব্বক অম্বপালী গণিকার আম্রবনে বিশ্রাম করেন ও নাগরিকদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া গণিকার ভবনে গিয়া আহারাদি করেন। সেই সময় অম্বপালী তাঁহার উদ্যানগৃহ

বৌদ্ধ সঙ্ঘে উৎসর্গ করে। বৈশালীর কূটাগারে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি, যথা চারপ্রকার ধ্যান, চতুঃশমপ্রধান ধর্ম্ম, চারি ঋদ্ধিপাদ, আধ্যাত্মিক পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, অষ্টাঙ্গ মার্গ ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিলেন ও পরদিন ভিক্ষার পর বৈশালী ছাড়িয়া চলিলেন। বৈশালী হইতে তিনি ভণ্ডগ্রাম ও আর কতকগুলি গ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে কুশীনগর যাত্রা করেন—ইহা কপিলবস্তু হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কুশীনগর যাত্রাকালে 'পাবা' গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী আম্রবনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। এই ভূমি চুন্দ নামক জনৈক কর্ম্মকার বৌদ্ধসমাজে দান করিয়াছিলেন। চুন্দ ভিক্ষুকদের জন্য তণ্ডুল ও বরাহমাংস প্রস্তুত করিল। প্রবাদ এই যে, সেই মাংস ভোজন করিয়াই বুদ্ধদেব পীড়িত হন এবং এই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। অপরাহ্ণে কুশীনগরের পথে কিয়দ্দূর চলিয়া শ্রান্তিবোধ হওয়াতে তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং আনন্দকে বলিলেন—"আমার বড় তৃষ্ণা লাগিয়াছে, জল আনিয়া দেও।" আনন্দ জল আনিয়া দিলেন। অল্প দূরে ককুখা নদী বহিতেছিল—তীরে পৌঁছিয়া নদীতে শেষবারের মত স্নান করিয়া লইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া এবং লোকে পাছে চুন্দের প্রতি দোষারোপ ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে এই আশঙ্কায় আনন্দকে বলিলেন "আমার মৃত্যুর পর চুন্দকে বলিও সে বড়ই পুণ্যফল উপার্জ্জন করিয়াছে; জন্মান্তরে তাহার কল্যাণ হইবে। তাহার প্রদত্ত অন্নাহার করিয়া আমি মৃত্যুরূপ আরোগ্য লাভ করিলাম, নির্ব্বাণমুখে উপনীত হইলাম। আমার বুদ্ধত্বের পূর্ব্বে সুজাতার আতিথ্য সৎকার, আর এক্ষণে এই চুন্দার পক্বান্ন উপহার—এ দুইই আমার সমান আদরণীয়। এ বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে, কহিও যে এ কথা আমার নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছ।" অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে কুশীনগরসমীপস্থ হিরণ্যবতী নদীতীরে পৌঁছিয়া গৌতম তথায় কিয়দ্দণ্ড বিশ্রাম করিলেন, এবং মল্লদের এক শালবনে গিয়া বৃক্ষতলে ডান কাতে শয়ান থাকিয়া মৃত্যুর পর আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আনন্দের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় আনন্দের বিলাপধ্বনি শুনিয়া বলিলেন "ভাই আনন্দ, আমার জন্য শোক করিও না। আমি তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যার জন্ম তারই মৃত্যু—যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়—এমন কি কোন জিনিস আছে যাহার বিনাশ নাই? শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক, এক সময়ে প্রিয়জনদের ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু আমার মৃত্যু হইল ভাবিও না। আমার প্রচারিত সত্যসকল, আমার উপদেশ ও অনুশাসন আমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছি—সেই সকল আমার প্রতিনিধি

—সেই তোমাদের পথ প্রদর্শক। আনন্দ, তুমি অতি যত্নে আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছ—আশীর্বাদ করি তোমার কল্যাণ হউক। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথে চল, বিষয়াসক্তি, অহমিকা, অবিদ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যতদিন আমার শিষ্যেরা শুদ্ধাচারী হইয়া সত্যপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে। পাঁচ সহস্র বৎসর পরে যখন সত্যজ্যোতিঃ সংশয়-মেঘজালে আচ্ছন্ন হইবে, তখন যোগ্যকালে অন্যতর বুদ্ধ উদিত হইয়া আমার উপদিষ্ট ধর্ম্ম পুনরায় উদ্ধার করিবেন। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন "সে বুদ্ধের নাম কি?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মৈত্রেয়।"

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন বুদ্ধের প্রতি কাহারো কিছু সন্দেহ আছে কি না। তদুত্তরে আনন্দ কহিলেন—"গুরুদেব! আশ্চর্য্য এই যে, এত লোকের মধ্যে কাহারো একটি বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। সত্যের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস অটল, কাহারো মনে তিলমাত্র সংশয় নাই।" পরে বুদ্ধদেব ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "যার জন্ম, তার ক্ষয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—সত্যই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া চিরকাল বাস করিবে। তোমরা যত্নপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া আপন মুক্তিসাধন কর।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইল—প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা সহাম্পতি এবং শক্রের কণ্ঠ হইতে আকাশবাণী হইল—"হায়! বুদ্ধদেব মর্ত্ত্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল।"

তদনন্তর চক্রবর্ত্তী নৃপতির মরণোত্তর যে অন্ত্যেষ্টি-বিধান শাস্ত্রবিহিত, সেই বিধানানুসারে বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কুশীনগরের প্রধান প্রধান নাগরিক কর্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার দেহাবশেষ গ্রহণ করিতে অনেকানেক রাজ্য হইতে ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দগ্ধদেহের ভস্মরাশি আট ভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেকের উপর এক একটি স্তূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইল।

———

বংশাবলী।

শাক্যরাজ জয়সেন
সিংহহনু × কাঞ্চনা
শুদ্ধোদন × মায়া ও মহা প্রজাপতি
৪ ভাই*
প্রমিতা
অমৃতা
সিদ্ধার্থ × যশোধরা
নন্দ
রূপানন্দ
রাহুল
কোলরাজ দেবদহ
অঞ্জন
কাঞ্চনা
×
সুপ্রবুদ্ধ
দণ্ডপাণি
মায়া
মহা প্রজাপতি
দেবদত্ত
যশোধরা
*১। শুক্লোদন
দেবদত্ত
আনন্দ
২। অমৃতোদন
মহানাম
অনিরুদ্ধ
৩। ধোতোদন
৪। ঘনিতোদন
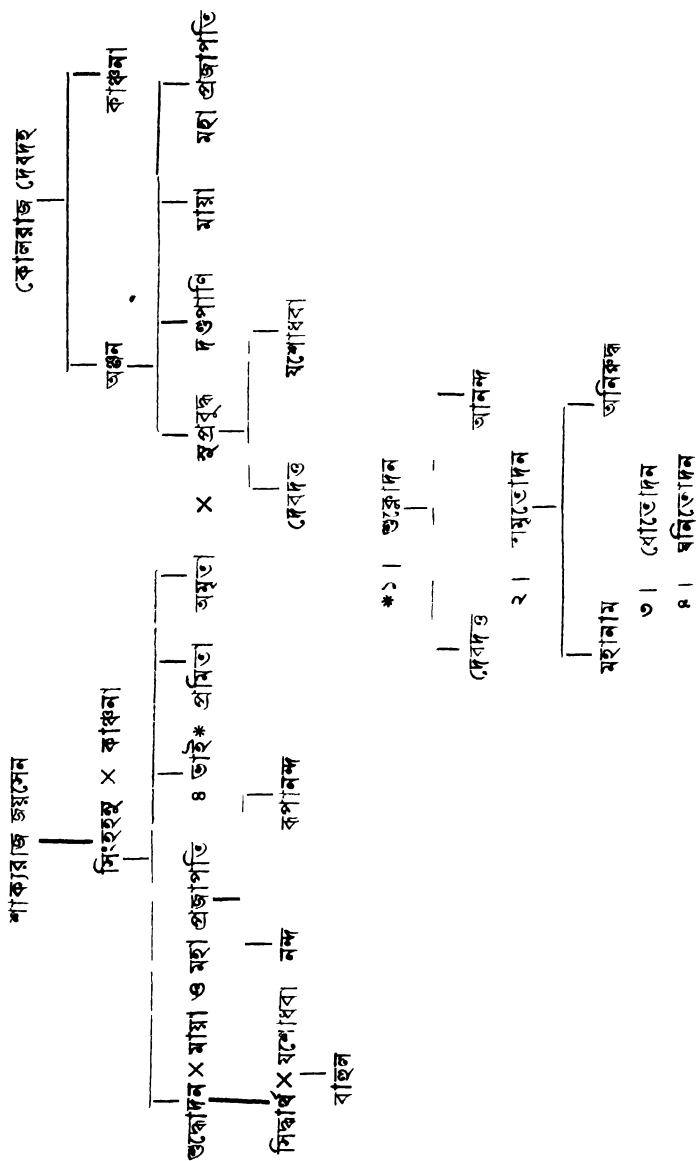
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ইতিহাসের কালনির্ণয়।

বুদ্ধদেব ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়, বৌদ্ধেরা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত এদেশে বিদ্যমান ছিলেন ও কোন্ সময়েই বা এখান হইতে অন্তর্হিত হন, আমাদের সকলেরই সে বিষয়ে জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাল নিরূপণের বেলায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাস হইতে সাড়াশব্দ কিছুই পাওয়া যায় না। যুক্তি ও অনুমান, শিলালিপি ও প্রোথিত ধাতুমুদ্রা ইত্যাদি সাধন ও উপকরণ হইতে যাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহাতেই একপ্রকার সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তত্রাপি বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদয়াস্ত, উন্নতি অবনতির কাল কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সেই সকল কালনির্ণায়ক নিদর্শন সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, বুদ্ধ শাক্যসিংহের মৃত্যুকাল যতদূর জানা যায়, খুব সম্ভব খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভা হয়; তাহার কালও একপ্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে মগধ রাজ্যাধিপতি অশোক রাজার মহাসভা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই অশোক রাজা গ্রীকদের সান্দ্রাকোতস্ (চন্দ্রগুপ্তের) পৌত্র; পাটলিপুত্র (পাটনা) ইঁহার রাজধানী। অশোক রাজার পূর্ব্বে দুইটি বৌদ্ধ সভা হয়। বুদ্ধের মরণোত্তর অনতিকালবিলম্বে রাজগৃহে রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে প্রথম সভায় বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার:—সূত্রপিটক (বুদ্ধের কথাবার্ত্তা), বিনয়পিটক (ব্যবহার ধর্ম্ম) এবং অভিধর্ম্মপিটক (দর্শনশাস্ত্র); এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ভারতবর্ষের ভূপতিগণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে প্রথমে মগধরাজ বিম্বিসার, পরে সম্রাট অশোক খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার উৎসাহপ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। তাঁহার অনুশাসন-লিপিসকল, প্রোথিত স্তম্ভ, গিরি ও গিরিগুহায় খোদিত, কাবুল নদীর উত্তর হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত—পূর্ব্বে উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমে গির্ণার (কাঠেওয়ার) পর্য্যন্ত—পূর্ব্বাপর তোয়নিধির মধ্যস্থ সমুদয় ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এইসকল লেখা আবিষ্কৃত এবং অর্থ সহিত অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুশাসনপত্রে

অশোকরাজার স্বধর্ম্মানুরাগ, উদার নিঃস্বার্থতা, দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসাদি গুণের যে দেদীপ্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কেন তিনি ধর্ম্মাশোক নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার একটি খোদিত স্তম্ভ বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলবস্তুর চিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মিত হয়, তাহা তিন চারি বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সেকন্দর সা'র ভারত আক্রমণের পর হইতে যে কয়েক জন গ্রীকদেশীয় লোক ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন করে, তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে তৎকালবর্ত্তী ধর্ম্ম ও রীতিনীতি বিষয়ক কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হয়। ইহাদের মধ্যে গ্রীক্ দূত মেগাস্থিনীস একজন প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় খৃষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মগধ রাজধানী পাটলিপুত্রে কিয়ৎকাল বাস করেন এবং তাঁহার সমসাময়িক ভারতের সামাজিক অবস্থাবৃত্তান্ত অল্পবিস্তর লিখিয়া যান তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ—এই দুই শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লেখ করেন; এবং বৌদ্ধদের কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, কতকগুলি শ্রমণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী কেবল দয়াধর্ম্মের অনুষ্ঠান উদ্দেশে লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান; কাহারো নিকট কিছু গ্রহণ করেন না; অপর কতকগুলি ধর্ম্মপ্রচারক লোকদিগকে নরকভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। কোন কোন সংস্কৃত নাটক হইতে এই বাক্যগুলির সত্যতার পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, চীন পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত। চীনদেশীয় অনেক তীর্থযাত্রী তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আগমন করেন। বুদ্ধগয়াতে তাঁহাদের খোদিত লিপি বিদ্যমান আছে ও তাহার মধ্যে অনেকের নামও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই সকল যাত্রীর মধ্যে ফাহিয়ান ও হিউ-এন্ সাং আমাদের বিশিষ্টরূপে পরিচিত। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে মহান্ আবিষ্ক্রিয়া—বুদ্ধজন্মভূমি কপিলবস্তুর স্থাননিরূপণ —এই দুই চীন পরিব্রাজকের লিখিত বিবরণই তাহার সাধনীভূত। ফাহিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন; এবং হিউএন্ সাং ৬৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা বিষয় লিখিয়া যান। তাঁহারা উভয়েই গান্ধার, তক্ষশিলা, মথুরা, কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, বৈশালী, মগধ, পাটলিপুত্র, নালন্দ, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত, কোশল প্রভৃতি বিবিধ স্থানস্থিত বিহার ও বিহারবাসী বহুসংখ্যক ভিক্ষুমণ্ডলী দর্শন করেন।

হিউএন্ সাং তদতিরিক্ত প্রয়াগ, সারনাথ, উৎকল, কলিঙ্গ, ভরোচ, মালব, উজ্জয়িনী, দ্রাবিড়, কাঞ্চীপুর, মলয়, কোঙ্কণ, গুজরাট, কচ্ছ, মূলতান, থানেশ্বর, প্রভৃতি বিবিধ স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রায় সমগ্র ভারতভূমিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত দেখেন। কিন্তু ফাহিয়ানের সময় অপেক্ষা তাঁহার সময়ে এ ধর্ম্মের কিয়ৎপরিমাণে হীন দশা উপস্থিত হইয়াছিল দেখা যায়। ফাহিয়ান যে সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধ দেবালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালিত দেখেন, হিউএন্ সাং তাহার মধ্যে অনেকানেক স্থান ও তদতিরিক্ত অন্যান্য বহুতর বৌদ্ধক্ষেত্র ভগ্ন, ভগ্নপ্রায়, বা একেবারে শূন্য দেখিতে পান, এবং কোন কোন স্থান ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বন্ধন হইতে নির্মুক্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অধীন হইতেছে দেখিয়া যান। ঐ সময় হইতে খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকাল। সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ পূর্ব্বাবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ের পর যে জৈন সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়, মহীশূর, বিজয়নগর, আবু প্রভৃতি অনেক স্থানের খোদিত লিপিতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সেইরূপ অবনতি হইয়া আসিল। এদিকে আবার হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার সহস্রবৎসরব্যাপী ঘুমঘোর হইতে উত্থান করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন-ব্রতে কটিবদ্ধ হইলেন। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং তাহার পরেও কিছুদিন বৌদ্ধেরা যদিও ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে অন্তর্হিত বোধ হয়।

পণ্ডিতপ্রবর কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্কর ও রামানুজ—ইঁহারা এই পুনরুদ্দীপ্ত হিন্দুধর্ম্মপ্রণালীর প্রধান প্রবর্ত্তক। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একজন প্রবল বিপক্ষ ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধ-মতের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধদের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া যান। বেদভাষ্যকার সুবিখ্যাত সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, কুমারিলের সহায়ভূত সুধন্বা রাজা বৌদ্ধসম্প্রদায় সংহার উদ্দেশে এই আদেশ প্রচার করেন যে,—

আসেতোরাতুষারাদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।
ন হন্তি যঃ স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্নৃপঃ॥

রাজা স্বকীয় কার্য্যকর্ত্তাদিগকে আদেশ করিলেন, একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর,

অপরদিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে আবালবৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার কর। যাহারা বধ না করে, তাহারা বধ্য।

শঙ্করাচার্য্য কুমারিলের উত্তরকালীন লোক, তিনিও বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া প্রখ্যাত। যেরূপে তিনি হিন্দুসমাজে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। তিনি বলেন, চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ সাং সপ্তম খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষে অনেক বর্ষ অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও অন্য নানাবিষয়ে যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করেন, তাহাতে ঐ সময়ের বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যদি হিন্দুসমাজে তাদৃশ ধর্ম্মবিপ্লব সঙ্ঘটিত বা আন্দোলিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ না থাকা কোনরূপেই সঙ্গত নয়। যখন ঐ ভ্রমণ-বিবরণে সেরূপ ধর্ম্মান্দোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন ঐ সময়ের উত্তরকালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। যতদূর জানা গিয়াছে শাঙ্কর ভাষ্য রচনার কাল খৃষ্টাব্দ ৮০৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দর্শন, নীতি, পরকাল ও নির্ব্বাণ।

উপরে বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; এখন বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। শাক্যমুনি প্রবুদ্ধ হইয়া যে কার্য্য-কারণশৃঙ্খল (দ্বাদশ নিদান) ধ্যানযোগে উপলব্ধি করেন, তাহার অর্থ কি? এই দ্বাদশ নিদানের অনুক্রম একের পর এক যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা সাধারণের বিচার্য্য। মোটামুটি এই দেখা যাইতেছে যে, অবিদ্যা শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত—অবিদ্যাই দুঃখোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের সহিত এই বিষয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের ঐক্য দেখা যাইতেছে। বেদান্ত মতেও অবিদ্যা হইতে তাবৎ ভবযন্ত্রণার উৎপত্তি। এই মহারিপু দমন করা উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তবে বেদান্তের অবিদ্যা আর বুদ্ধের

অবিদ্যা এক নহে। বৈদান্তিকেরা বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই অবিদ্যার ব্যবধান দূর হইলে "সোঽহম্" বলিয়া যে অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতে জীব ব্রহ্মে একীকরণ সংঘটিত হয়। অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মই জীব। অবিদ্যারূপ আবরণের উচ্ছেদ হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। সেই আবরণচ্ছেদেই মুক্তি। বুদ্ধের অবিদ্যা স্বতন্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। অবিদ্যা সেই, যাহা জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব জীবের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেই যত অনর্থের মূল। যদি কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তাহা হইলে সে ভ্রম অপনীত হইলে সর্পভয়ও দূর হয়—এও সেইরূপ। এই অবিদ্যার অপগমে দুঃখোৎপত্তির বাস্তবিক কারণ আমাদের জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয়। সেই কারণ কি—না বিষয়তৃষ্ণা—তৃষ্ণা হইতে আসক্তি—আসক্তি হইতে জন্ম—তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রোগ শোক দুঃখ কষ্ট। এই জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। অবিদ্যা দূর হইলে তাহার নীচের বন্ধনগুলি একে একে টুটিয়া যায়; এক কথায়, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যায়, জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়, এবং নির্ব্বাণপথ উন্মুক্ত হয়।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বুদ্ধদেব যে চতুর্মহাসত্যের উপদেশ দিলেন, তাহাই বা কি? ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। (১) জীবের দুঃখ (২) দুঃখের কারণ (৩) দুঃখের মূলোচ্ছেদ (৪) তাহার উপায় নির্দ্ধারণ এবং উপায় চেষ্টা। উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া অষ্ট মহামার্গরূপ বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাংখ্য মতের অনেক বিষয়ে পরস্পর ঐক্য দেখিয়া অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, কাপিল সাংখ্যদর্শন এই বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুদর্শন। কপিল ও বুদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। বৌদ্ধ ও সাংখ্য উভয় মতেই সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়; সেই দুঃখ হইতে জীবের পরিত্রাণসাধন-চেষ্টা ঐ উভয় মত প্রবর্ত্তনেরই মূলসূত্র। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তু, বুদ্ধের মাতার নাম মায়া (প্রকৃতি)—এ দুইটিও সাংখ্য মতের পরিচায়ক। বৌদ্ধদের এইরূপ এক উপাখ্যান আছে যে, বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে কপিল ছিলেন। শাক্যবংশীয় নৃপতিরা আপনাদের নগর নির্ম্মাণের স্থান-নিরূপণ করিতে গিয়া কপিল ঋষির কুটীর দর্শন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, তিনি তাঁহাদিগকে একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে নগর নির্ম্মিত হইলে, কপিলের নামানুসারে তাহার নাম কপিলবস্তু হইল। সে যাহা হউক, এই উভয় মতের যেমন সৌসাদৃশ্য আছে, তেমনি অনেকাংশে

ভিন্নতাও দৃষ্ট হয়। উভয়েই একস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন, উভয়েরই প্রস্থান ভূমি এক—মনুষ্যের দুঃখমোচন ; কিন্তু গম্যস্থান স্বতন্ত্র এবং গন্তব্যপথও অনেক ভিন্ন। ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি উভয়েরই লক্ষ্য, কিন্তু সে লক্ষ্য কিসে সিদ্ধ হয়? কপিল মুনি দুইটি মূলতত্ত্ব মানিয়া চলেন, প্রকৃতি আর পুরুষ। সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি নর্ত্তকীর ন্যায় পুরুষের সম্মুখে সংসাররূপ মায়ার খেলা খেলিতেছেন, পুরুষ নিজদর্পণে তাহা দর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির এই মায়াময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত করিয়া প্রকৃতির অজ্ঞানরচিত আবরণ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ফেলিয়া দিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্ররূপে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তখন সেই মায়ার খেলা থামিয়া যায় ; তখনি তিনি দুঃখক্লেশ, জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করেন। বুদ্ধ এ সকল তত্ত্বের উল্লেখ করেন নাই। বুদ্ধের রাজ্যে পুরুষের অস্তিত্ব নাই। তিনিও বলেন সকলি অনিত্য—সকলি ক্ষয়শীল—সকলি দুঃখময় ; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল নামরূপের মূলে সত্যবস্তু কিছুই নাই। বুদ্ধের গম্যস্থান নির্ব্বাণ—বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানও নহে—সাংখ্যের আত্মতত্ত্বও নহে—কিন্তু নির্ব্বাণ, যার মূলার্থ নিবিয়া যাওয়া—অন্য কথায়, জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ। তাঁহার মতানুযায়ী এই নির্ব্বাণ-মুক্তি কি, তাহা পরে সবিশেষ আলোচিত হইবে। কিন্তু বুদ্ধ নিজে যাহাই বলুন, তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার নামে যে দর্শন-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা শূন্যবাদ বই আর কিছু নহে। আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, জগতের মূলকারণ ঈশ্বরও মিথ্যা।

কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশেষ বিধান ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক সহজ ধর্ম্মনীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধদেব ন্যায়, সত্য, অহিংসাদি নীতির প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া, ও সেই সমুদায়ই মানবকুলের সদ্গতিসাধক বলিয়া তদীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মেও দশানুশাসন প্রচলিত, তন্মধ্যে গৃহস্থ সাধারণের জন্য এই পাঁচটি নির্দ্দেশিত আছে—

প্রাণীবধ করিবে না।

পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না।

ব্যভিচার দোষ করিবে না।

মিথ্যা কথা কহিবে না।

সুরাপান করিবে না।

ভিক্ষুদের জন্য তদতিরিক্ত অপর পাঁচটি ব্যবস্থা আছে ; যথা, অকালভোজন,

নাট্যাদি দর্শন, উত্তম পরিচ্ছদ, প্রশস্ত শয্যা, মাল্যগন্ধ বিলেপন, ভূষণ ধারণ, স্বর্ণ রৌপ্যাদি দান গ্রহণ, এই পঞ্চব্যসন হইতে বিরতি। উচ্চশ্রেণী ভিক্ষুকদের জীবনব্রত যারপরনাই কঠোর। শ্মশানে যে-সকল ছিন্ন বস্ত্রাদি কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা আপন হস্তে সেলাই করিয়া পরিতে হইত; তাহার উপর এক গেরুয়া বসন। আহার যত সামান্য সাদাসিদা হইতে পারে, আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহাদের ভিক্ষাপাত্রে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্যোপায়ে ধনোপার্জ্জন নিষিদ্ধ। দিনের মধ্যে একাহার, মধ্যাহ্নের পর আহার নিষেধ। বনই তাহাদের আশ্রম, বৃক্ষতল তাহাদের আশ্রয়স্থান। সেখানে বড় জোর আসন বিছাইয়া বসিতে পার, কিন্তু কদাপি শয়ন করিবে না*—নিদ্রার সময়েও শয়ন নিষেধ। যদি কখন গ্রাম কিম্বা নগরে যাইতে হয়, সে কেবল ভিক্ষার জন্য—সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইবে—কখন কখন শ্মশানে গিয়া সংসারের অসারতা চিন্তা ও ধ্যান ধারণায় রাত্রি যাপন করিবে—এই প্রকার কত কঠোর তপশ্চর্য্যায়রত থাকিয়া তবে বৌদ্ধ ভিক্ষু 'অর্হৎ' পদবী লাভের অধিকারী হইতেন।

উল্লিখিত দশানুশাসনে যে-সকল পাপকার্য্য নিষিদ্ধ, তদ্ব্যতীত কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, পরনিন্দা, পরপীড়া প্রভৃতি মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ বিধান আছে। যে সমস্ত ধর্ম্মনীতি পালনীয়, তাহা পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, স্নেহ, দয়া, অহিংসা, চিত্তের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা। বুদ্ধের উপদেশ এই,—সত্য ও প্রিয়বাক্য কহিবে, কাহারো হিংসা করিবে না; সাধুতার দ্বারা অসাধুকে পরাজয় করিবে, সত্য দ্বারা অসত্যকে পরাজয় করিবে, মৈত্রী গুণে শত্রুতা পরাভব করিবে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও পাপের বিমোচন হয়; কিন্তু বুদ্ধ তাহা অস্বীকার করিয়া উপদেশ দেন,—কায়মনোবাক্য সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ ও তদীয় হিতানুষ্ঠান ব্যতিরেকে সদ্গতি লাভের অন্য উপায় নাই হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্ম দেশগত, জাতিগত নহে; ইহা মনুষ্যকুলের স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম্ম; কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কেহই এ ধর্ম্মের বিরোধী নহে। দুঃখ ক্লেশ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল মনুষ্যেরই ভাগধেয়। গৌতমপ্রদর্শিত নির্ব্বাণপথের যাত্রীদিগের মধ্য কোনরূপ জাতিবিচার নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতির মহত্ব নাই। জাতিভেদে মনুষ্যে মনুষ্যে যে পার্থক্য, সে কল্পিত; কিন্তু গুণ ও কর্ম্মানুসারেই যথার্থ পার্থক্য। ব্রাহ্মণ শূদ্র জন্মিয়াই হয় না, হয় কর্ম্মগুণে। যিনি সদাচারী, শুদ্ধাচারী, তিনিই

* বুদ্ধদেব শয্যাশায়ী হইয়া নিদ্রা যাইতেন।

ব্রাহ্মণ। অজ্ঞানান্ধ পাপকারীই শূদ্র। যে ব্যক্তি লোভী, ক্রোধপরায়ণ, হিংসারত, দয়ামায়া শূন্য, সেই চণ্ডাল। মাল্য চন্দন ভস্মলেপন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সংযত ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদল স্ববশে আনিয়াছেন সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ইতিপূর্ব্বে চতুর্মহাসত্যরূপ ধর্ম্মচক্রের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির প্রধান অঙ্গ। বারাণসীতে বুদ্ধদেব সেই তাঁহার প্রথম উপদেশে যে নির্ব্বাণমুক্তির আদর্শ ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই নির্ব্বাণপথের চারিটি বিভাগ বা সোপান আছে, এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দশরিপু সে পথের বিঘ্নকারী; সেই রিপুদল দমন করিতে করিতে পথিক এক এক ধাপে উপনীত হন, ও সমস্ত রিপুর উপর জয়লাভ না করিলে গম্যস্থানে পৌছান যায় না। তন্মধ্যে দুইটি ভয়ঙ্কর শত্রু, 'রূপরাগ' এবং 'অরূপরাগ'—এক বিষয়-বাসনা, অপর স্বর্গ-কামনা,—এ দুইই অনর্থের মূল। শেষভাগে পৌছিয়া মৈত্রীর সহিত মিত্রতাবন্ধন হয়। সকল ধর্ম্মের শিরোদেশে—সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রেম ও মৈত্রীভাব। মৈত্রীভাবের দৃষ্টান্ত মাতৃস্নেহ। মাতা যেমন সন্তানকে প্রাণ দিয়াও পোষণ করেন, সেই উদার গভীর মাতৃপ্রেম—যে প্রেম শত্রুমিত্র আত্মপরে সমান—যে প্রেমের ভেরীনিনাদ দিগ্বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করে, সেই প্রেম বিতরণের জন্য মর্ত্ত্যলোকে বুদ্ধদেবের আগমন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, এই সার্ব্বভৌম মৈত্রীভাব জগতে বিস্তার উদ্দেশে ভবিষ্যতে মৈত্রেয় নামক অন্যতর বুদ্ধের উদয় হইবে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে দয়া মায়া, ধৃতি সংযম, স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, এই সকল গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকানেক নীতিকথা আছে, তাহার একটি বলিয়া এই ভাগ শেষ করি। ইহা অশোক রাজার পুত্র কুনালের আখ্যান; কুনালচরিত্র ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা গুণের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার বিমাতা তিষ্য-রক্ষিতা তাঁহার শ্রীসৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হইয়া তাঁহাকে দূর দেশে নির্ব্বাসন করিয়া দেন, ও তথাকার রাজকর্ম্মচারীর প্রতি কুমারের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলা হয়, এইরূপ রাজ-নামাঙ্কিত এক আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন। কেহ এই অঘোর কৃত্য করিতে প্রস্তুত হয় না; অবশেষে একজন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর চণ্ডালের সাহায্যে এই নৃশংস কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। যখন সেই ঘাতক সাঁড়াশী দিয়া তাহার দুই চক্ষু একে একে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, তখন লোকদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, কিন্তু রাজকুমার একটি শব্দ করিলেন না—চক্ষু দুটি হাতে লইয়া কহিলেন "আমার

চর্ম্মচক্ষু গেল, তাহাতে কি? এখন আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিল। রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু আমার রাজা ধর্ম্ম, তিনি কখনো আমায় পরিত্যাগ করিবেন না।" রাণী এই কার্য্যের আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া কহিলেন "মহারাণী আমার এত উপকার করিয়াছেন, তাঁর মঙ্গল হউক। আমি চক্ষু হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু যে ক্ষমা কারুণ্য শিক্ষা করিয়াছি, সেই আমার মহৎলাভ; তার তুলনায় এ ক্ষতি কিছুই নহে।" পরে তিনি ভিখারীর বেশে তাঁহার পিতার রাজধানীতে উপনীত হইলেন। এক রাত্রে রাজবাটীর সম্মুখে বীণা বাজাইয়া গান করেন, রাজা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই অন্ধকে দেখিয়া পুত্র বলিয়া চিনিতেই পারিলেন না; পরে সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, রাণীকে বধ করিতে উদ্যত। কুনাল অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিলেন—"মহারাজ! এমন কর্ম্ম করিবেন না, স্ত্রীহত্যা মহাপাপ। তথাগত উপদেশ দিয়াছেন, ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম। মহারাজ, আমার কোন কষ্ট নাই। যিনি আমার উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি। তিনি আমাকে সুখ দিন আর দুঃখকষ্ট দিন, আমার কাছে দুইই সমান। মাতার প্রতি আমার প্রেমভক্তি সমানই আছে। যদি আমার কথা সত্য হয়, আমার চক্ষু যেন ফিরিয়া পাই।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার চক্ষুদ্বয় কোটরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

(বৌদ্ধধর্ম্মের অভিধর্ম্ম ভাগ (দর্শন) যতই ভ্রান্তিসঙ্কুল ও জটিল হউক না কেন, বুদ্ধের নীতিশিক্ষার উপর কেহই দোষারোপ করিতে পারিবে না।) ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি-সাধন করা যে নিতান্তই বৃথা কার্য্য, আর আত্মপ্রভাবে ইন্দ্রিয়মন দমন করিয়া এবং চরিত্র সংশোধন করিয়া দয়াধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যে শ্রেয়ঃপথের একমাত্র দ্বার—এই কথাটীর প্রতি বুদ্ধদেব জনসাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। শুধু উপদেশ নহে, বুদ্ধের মহৎ জীবনই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ মহান্, তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত তদপেক্ষা মহত্তর। বুদ্ধদেবের ধৈর্য্য, দয়া, মায়া, মমতা, প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, যেমন ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্ত্তিতে, তেমনি ভক্তদিগের মানসপটে মুদ্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্মবীর ছিলেন সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, তিনি ঘোর বিলাসিতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া পিতৃগৃহের অতুল সুখসম্পত্তি কেমন অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া লোক-হিতার্থে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, পরে সাত বৎসর কি দুঃসহ তপঃসাধনবলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন, এবং প্রায়

অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে জ্ঞান ও ধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য জাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া কিরূপে ভারতে দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারে জীবন ক্ষেপণ করিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী নির্ভীক চিত্তে, উদ্যমের সহিত সমাধা করিয়া যখন শান্ত সমাহিত চিত্তে, আনন্দমনে তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন, তখন আকাশবাণী হইল—হায় বুদ্ধদেব অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল! বুদ্ধ-জীবনের ছবি আমাদের সকলেরই মনশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধনীতিশাস্ত্র অরাজক রাজ্য। বিশ্বসংসার অকাট্য নিয়মে শুদ্ধ. অথচ তাহার নিয়ন্তা নাই—ধর্ম্মরাজ্যের কোন রাজা নাই। ফলাফলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন ব্যবস্থাপক পুরুষ নাই। পুণ্যের কেহ পুরস্কর্ত্তা নাই, পাপের শাস্তা নাই। দেবতা প্রীত্যর্থ পশুবলি যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল, দেবারাধনা অনাবশ্যক। বৌদ্ধধর্ম্ম সাধন-প্রধান ধর্ম্ম, তাহাতে ভজনের কোনপ্রকার বিধি ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ এই যে, আত্মপ্রভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অন্তঃকরণকে দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য হইতে বিনির্ম্মুক্ত কর, তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। সাধনেই সিদ্ধি—"দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা"—এই পুরুষকারই আমাদের মুক্তিপথের একমাত্র সম্বল। আমাদের আপনার মুক্তিসাধন আপনারই হস্তে—আত্মপ্রভাবে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে হইবে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুশয্যায় শেষ কথাগুলি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি ঐ সময়ে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"ভাই আনন্দ, আমার জীবনের অশীতি বৎসর অতীত হইয়াছে—দিন ফুরাইয়া আসিল, আমি এইক্ষণে চলিলাম। দেখ আমি আত্ম-নির্ভরে নির্ভয়ে চলিয়া যাইতেছি, তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তোমরাও আপনার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শেখ। তোমরা আপনারই আপনার প্রদীপ—আপনারাই আপন নির্ভর-দণ্ড। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর—আপনা ভিন্ন অন্য কাহারো উপর নির্ভর করিও না। আমি চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া শোক করিও না। আমার জীবন, 'ধর্ম্ম' ও 'সঙ্ঘ' এই যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা অক্ষয় ও অবিনাশী। সেই ধর্ম্ম তোমরা প্রাণপণে পালন কর। সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য আমি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তোমাদের জন্য ঔষধ আনিয়াছি—সেই ঔষধ সেবন কর। আমার উপদেশ মনে রেখো, যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যার বৃদ্ধি

তারই ক্ষয় ; সংসারের সকলি ক্ষয়শীল, সকলি অনিত্য। ইহা জানিয়া যত্নপূর্ব্বক তোমরা নিজ নিজ মুক্তিসাধন কর। এইরূপে আত্মবলে আমার প্রদর্শিত পুণ্যপথে চল—নিশ্চয় তোমাদের কল্যাণ হইবে ; তোমরা দুঃখশোক অতিক্রম করিয়া অপার শান্তি ও নির্ব্বাণরূপ অমূল্য নিধি লাভ করিবে।"

মানবপ্রকৃতির উচ্ছেদকারী, মনুষ্যসমাজের উন্নতির প্রতিরোধী কোন এক অভিনব ধর্ম্মপ্রণালী কালে নিশ্চয়ই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ স্থাপনে বৌদ্ধধর্ম্মের যেমন বল তেমনি দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাসনা-বিরহিত বনবাসী সন্ন্যাসী মিলিয়া মনুষ্যসমাজ গঠিত হয় না। ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্ম অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য আপনা অপেক্ষা উচ্চতর দৈবশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে সক্ষম। আমরা এমন একজন জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষ চাই যিনি আমাদের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করিতে তৎপর—যিনি আমাদিগকে সংসারের সমুদয় বিঘ্নবিপত্তি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ—যিনি আমাদের সুখদুঃখে উদাসীন নহেন, যাঁহার নিকটে আমাদের সুখদুঃখ নিবেদন করিয়া আমরা ইহলোকে সুমতি পরলোকে সুগতি লাভে সমর্থ হই। আধ্যাত্মিক জগতে আত্মপ্রভাব অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবপ্রসাদ ভিন্ন ধর্ম্মের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। মনুষ্যের আত্মা এই সংসারের দুঃখ দুর্গতি পাপতাপের মধ্যে শান্তি ও বিশ্রামের স্থান অন্বেষণ করে—বিষয়কোলাহল হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই আনন্দস্বরূপের সহবাসে আনন্দরস পান করিতে উৎসুক হয়। "সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে স্ববশে আনিলাম, কিন্তু ভজন দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমামৃত-রস পান করলাম না, তবে সে সাধনের ফল কি? চিত্তকে বশীভূত করাই বা কি জন্য?" বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনের ধর্ম্ম, তাহাতে ভজনের কোন ব্যবস্থা নাই, এই হেতু বৌদ্ধধর্ম্ম অঙ্গহীন। এই কারণে কালসহকারে নিরীশ্বর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা জানাই আছে ; তাহার জন্মভূমি এই ভারতভূমি হইতে তাহার বহিষ্কৃত হইবার কারণও এই। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নীতি-প্রণালী যেমনই আবিষ্কৃত করুন, কিন্তু দেখা যায় অনেকানেক বৌদ্ধক্ষেত্রে ঘোর পৌত্তলিকতা বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইয়াছে। যে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত মুখে আনিতে কুণ্ঠিত হইতেন, সেই বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী সাধকেরা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। "প্রতিমা পূজা, বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থি দন্তাদির অর্চ্চনা এবং নানাবিধ যাত্রা মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে। ফাহিয়ান খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যান। কেবল শাক্য

বুদ্ধ ময়, এক এক দেবালয়ে অন্য অন্য বৌদ্ধদেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে।” এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাঙ্মুখ—ওদিকে দেখি যে, বৌদ্ধেরা মনুষ্যপূজা এবং মূর্ত্তিপূজার আদি গুরু। বুদ্ধদেব যেমনি পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন, তাহার কিয়ৎ-পরে ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত শত স্থান শত দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিকীর্ণ হইয়া উঠিল, তার সাক্ষী ইলোরা, অজন্তা, খণ্ডগিরি, শ্রীক্ষেত্র ; বুদ্ধগয়ায় তারাদেবী ও বাগীশ্বরী দেবী, বৈশালীতে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, নালন্দ বিহারে অবলোকিতেশ্বর, তারা, ত্রিশিরা, বজ্রবরাহী, বাগীশ্বরী ইত্যাদি অনেকানেক বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির অনেক স্থানে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবপ্রসাদ হইতে বিচ্ছিন্ন আত্ম-প্রভাবের নিরতিশয় কঠোর সাধনার যে বিসদৃশ পরিণাম, তাহা আর একদিক দিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মসাধন প্রথমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইল। যথেচ্ছাচারিতায় বলে কৃত্রিম সিদ্ধি উপার্জ্জনের প্রণালীই তন্ত্রশাস্ত্র—কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিল। “হিন্দু মতানুযায়ী সিদ্ধ যোগীরা যেমন অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করেন লিখিত আছে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস এই যে, ঐ সম্প্রদায়ী সিদ্ধব্যক্তিরা অশেষরূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতীব অদ্ভুত কার্য্যসমুদয় সম্পাদন করিতে সমর্থ হন,—যেমন বায়ু মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন, গৃহসম্বলিত পর্ব্বত ও সমুদ্র প্রকম্পন, পর্ব্বত ও পৃথিবীর গর্ভদর্শন, ইচ্ছাবলে বায়ুপ্রবাহ উৎপাদন, অগ্নিধারা আনয়ন, নষ্ট বা গুপ্ত সম্পত্তি উদ্গার করণ, ইত্যাদি।”

যদি জিজ্ঞাসা করেন বৌদ্ধশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব—তাহার বীজমন্ত্র কি? তাহার উত্তর “কর্ম্মফল”। কতকগুলি দর্শনতত্ত্ব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি—এ তত্ত্বটিও তাহারই মধ্যে একটি। সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে জীবের সদসদ্গতি, হিন্দু শাস্ত্রেরও এই শিক্ষা, এই উপদেশ—ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব নাই। কেহ রাজা কেহ চাষা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ ধনী কেহ দরিদ্র—কেহ সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছে, কেহ অকারণ কষ্টভোগ করিতেছে—অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে ; এরূপ অবস্থাবৈষম্যের কারণ কি? জীবনে এই দুঃখশোক, পাপতাপ, অন্যায় অত্যাচার—এ সকলেরই মীমাংসা “কর্ম্মফল”। ঐহিকে যে অমঙ্গলের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল সেই রহস্য ভেদ করে—সেই প্রহেলিকার উত্তর বলিয়া দেয়। তবে এই

কর্ম্মের প্রাধান্য যেমন বৌদ্ধধর্ম্মে, তেমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার মতে কর্ম্মোদ্যমই জীবন—কর্ম্মই দেবতার স্থলাভিষিক্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আর সকলি ক্ষয়শীল; মৃত্যুর অধীন—কেবল কর্ম্মফলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। বুদ্ধের উপদেশ এই—"যেমন বীজ বপন করিবে, তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে" কর্ম্মবন্ধন কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, জানিতেছি, তাহা পরিবর্ত্তনশীল নামরূপ মাত্র—ভৌতিক জগতে কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নাই। দেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি, আত্মা কতকগুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি; তাহাদের বাস্তব্য নাই। কর্ম্মই একমাত্র সত্য পদার্থ, বিশ্বচরাচর কেবল কর্ম্মসূত্রে বাঁধা। বালকের কর্ম্মফল যুবার জীবনে প্রতিফলিত; সেইরূপ তোমার ঐহিকের কর্ম্মফল পারত্রিক জীবনে প্রতিফলিত হইবে। যেমন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল তুমি ইহজীবনে ভোগ করিতেছ, সেইরূপ যদি পরলোকে মঙ্গল চাও, তবে পাপকর্ম্ম পরিহার কর, পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; কেননা কোন চিন্তা, কোন বাক্য, কোন কর্ম্ম এ পৃথিবীতে নষ্ট হয় না। আমি সত্য বলিতেছি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যেখানে যাও, সমুদ্রে প্রবেশ কর অথবা গিরিগুহায় লুক্কায়িত থাক, তোমার কর্ম্মফল তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে—কিছুতেই তাহা হইতে নিস্তার নাই। তোমার পাপের ফল যেমন দুঃখভোগ, সেইরূপ তোমার পুণ্যের সুফলভোগীও তুমি। বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে তোমার আত্মীয়-স্বজনবন্ধু যেমন তোমাকে আনন্দে অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ তোমার পুণ্যফল লোক হইতে লোকান্তরে তোমাকে অনুসরণ করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিবে।"

এইস্থলে বৌদ্ধধর্ম্মের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ যাউক। মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধীয় যে-সকল প্রহেলিকা মানব হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার সন্তোষজনক উত্তর সর্ব্বাংশে উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহা কতক ব্যক্ত, কতক অব্যক্ত রাখিয়াছেন। জীবাত্মার শেষ গতি কি? বুদ্ধদেব মৃত্যুর পর জীবিত থাকিবেন কি না? এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি অনেক সময় মৌনভাব অবলম্বন করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁর কাছে এই সমস্ত গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বিরত হইত না; বুদ্ধদেব সে-সকলের যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন—যাহার উত্তর নাই, তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। মালুঙ্খ্যপুত্রের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ যাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, এইস্থলে তাহার পুনরুক্তি করা যাইতেছে।

মালুঙ্খ্যপুত্র যখন এই সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন, তখন বুদ্ধদেব কহিলেন :—

হে মালুঙ্খ্যপুত্র—আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি—"এস, আমার শিষ্য হও—আমি তোমাকে বলিয়া দিব, জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ আত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন—বুদ্ধ মরণোত্তর নব-জীবন ধারণ করিবেন কি না?—এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি?"

—না, গুরুদেব, তা দেন নাই।

—এই সকল তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশে কি তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছ?

—না, তাহা নহে।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

"এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে আহত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলিত আগে আমাকে বল কার বাণে আমি আহত হইয়াছি, যে বাণ মারিয়াছে সে লোকটা কে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? তাহার নাম কি? নিবাস কোথায়? সে বাণই বা কি রকমের বাণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোন লাভ আছে? ফলে এই দাঁড়াইত যে, কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই বাণাহত ক্ষত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে।

—হে মালুঙ্খ্যপুত্র. তুমি আহত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ। তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি যাহা প্রকাশ করি নাই, তাহা অপ্রকাশিত থাকুক—যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহা প্রকাশিত হউক।"

বৌদ্ধদ্বেষীগণ এই মৌনভাববশতঃ বুদ্ধের প্রতি দোষারোপ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মিলিন্দ প্রশ্নে যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের এই মৌনভাবের কারণ সমালোচিত দেখিবেন।

রাজা কহিলেন—

শাক্যমুনি বলিয়াছেন সে-সকল ধর্ম্মতত্ত্ব মনুষ্যবুদ্ধির গোচর তাহা আমি অপ্রকাশিত রাখি নাই। তথাপি দেখা যায় যে, মালুঙ্খ্যপুত্রের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে তিনি বিরত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ দুয়ের এক হইতে পারে—হয় অজ্ঞানবশতঃ উত্তর দেন নাই, অথবা জানিয়া শুনিয়া গুহ্য রাখিবার ইচ্ছায় উত্তর দেন নাই। এ দুয়ের কোনটা ঠিক?

—রাজন্, বুদ্ধদেব মালুঙ্খ্যপুত্রের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন নাই সত্য বটে কিন্তু তাহা অজ্ঞানবশতঃ নহে। কোন প্রশ্ন এমন আছে, যার উত্তরে অন্য এক প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে—আবার এমনও প্রশ্ন আছে, নিরুত্তর থাকাই যাহার উত্তর। সে সকল প্রশ্ন কি?—না

জগৎ নিত্য কি অনিত্য?

দেহ ও আত্মা এক কি স্বতন্ত্র?

মৃত্যুর পরে তথাগত জীবিত থাকিবেন কি না?

এই সমস্ত প্রহেলিকা একপাশে ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদের কোন উত্তর নাই—উত্তরে কোন লাভ নাই—এই সকল প্রশ্নের অনর্থক উত্তরদানে তথাগত বাক্যব্যয় করিতে উৎসুক ছিলেন না। যে-সকল দুরূহ সত্য মানববুদ্ধির অগম্য তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

জীবাত্মা অমর কিম্বা মৃত্যুর অধীন—মৃত্যুর পর জীবাত্মার গতি কি হইবে? এই প্রহেলিকা ভেদ করা মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। অথচ আবার মানবজাতির জীবিত ও সুখাশা এতাদৃশ বলবতী যে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর সংসারে সীমাবদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হইবার নহে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই গভীর উচ্ছ্বাস আত্মা হইতে স্বতই উত্থিত হয় যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই হেতু পারলৌকিক আশার উদ্রেককারী আশ্বাসবচন প্রায় সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই সন্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। কোরাণ ত স্বর্গবর্ণনায় ও স্বর্গসুখবর্ণনায় পরিপূর্ণ। খৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও এ কথা আছে, আর তা ছাড়া খৃষ্টানেরা ঈশার সশরীরে স্বর্গারোহণ বিশ্বাস-বলে অনন্ত জীবন ও মুক্তি লাভের প্রত্যাশা করেন। বুদ্ধ এ বিষয়ে কোন আশ্বাসবাক্য দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ঐহিক সুখবাসনার ন্যায় স্বর্গ কামনাও তাঁহার নীতিরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত। বুদ্ধ স্বয়ং অমর জীবনের অধিকারী কি না—তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। কোশলরাজ ও সন্ন্যাসিনী ক্ষেমার মধ্যে যে কথোপকথন আছে তাহাতে ক্ষেমা স্পষ্টই বলিতেছেন—"স্বয়ং বুদ্ধ যাহা প্রকাশ করেন নাই, আমরা তাহা কি বলিব? বুদ্ধের প্রকৃতি সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শ গভীর। যদি বল বুদ্ধ অমর, তাহা ভুল —যদি বল তিনি মরণশীল, তাহাও ঠিক নহে।" এই উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার উপর কাহারো কিছু বলিবার নাই। যে-সকল বিষয় মানববুদ্ধির অগোচর, সে বিষয়ে মৌন থাকা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

বৌদ্ধেরা যদি এইখানে থামিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর কোন কথা বলিবার থাকিত না। কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায় তাঁহারাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি ভ্রমণ স্বীকার করেন। ইহকালে যিনি যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করেন, পরকালে তিনি তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হন। কেবল পশুপক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট জন্তু নয়, পাতকের পরিমাণানুসারে মৃৎপিণ্ডাদি জড় বস্তু হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, শাক্যমুনি নিজে অশেষ জন্মচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মের কথা তোমার আমার মত যে-সে লোকের মনে থাকে না বুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরাই তাহাদের বিগত জীবন-কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন। বুদ্ধদেব পশুপক্ষ্যাদি কোন্ যোনিতে কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জাতকমালায় বর্ণিত আছে। বুদ্ধজাতকে আত্মার নিম্ন হইতে উর্ধ্বমুখী অভিব্যক্তি নাই—জীবনের ক্রমোন্নতির ভাব লক্ষিত হয় না। কি কারণে, কি নিয়মে জীবের অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহা বুঝা যায় না। আমরা দেখিতে পাই চারিবার তিনি মহাব্রহ্ম, বিশ বার ইন্দ্র—তিরাশীবার সন্ন্যাসী—আটান্নবার রাজা—চব্বিশবার ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন বানর, হস্তী, সিংহ, বরাহ, শশক, মৎস্য, বৃক্ষ, চোর, বাজীকর, ভূতের ওঝা—এইরূপ কত কত জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বুদ্ধ নারীজন্ম গ্রহণ করেন নাই—ভূতপ্রেতরূপেও জন্মান নাই। সকল জন্মেই তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন, ও জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে অশেষ দুঃখক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম কাহিনীতে বুদ্ধজীবন স্বার্থহীন পরোপকার ও দয়ার অবতার-রূপে চিত্রিত; এবং এই সকল মহদ্‌গুণভূষিত তাঁহার সেই জীবনী মানবের দৃষ্টান্ত স্বরূপে জাতকমালায় বর্ণিত দেখা যায়। একস্থানে বুদ্ধদেব কহিতেছেন—"আমি 'সাম' নাম ধারণ করিয়া উপত্যকারণ্যে বাস করিতাম। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা আমি সকলকেই বশে আনিয়াছিলাম। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বন্যবরাহ মহিষ ইহারা সকলেই পালিত পশুর ন্যায় আমার কাছে আসিয়া বসিত। আমাকেও কেহ ভয় করে না, আমিও কাহাকে ভয় করি না, আমি দয়ার উপর পা রাখিয়া নির্ভয়ে পর্ব্বতপ্রদেশে বিচরণ করিতাম।"

যিনি পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহাকে কত প্রকার কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়—সময়ে সময়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয় বুদ্ধদেব স্বীয় জীবনে সেইরূপ আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বজন্মে বুদ্ধ যখন রাজকুমার বশ্বন্তর হইয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন,

তখন তাঁহার বিপদের আর অন্ত ছিল না। বশ্বন্তর অন্যায়রূপে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন। তাঁহার যাহা কিছু ধন সম্পত্তি ছিল—পরিশেষে চড়িবার রথটিও অশ্বসহ দানে ক্ষয় হইয়া গেল। স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে পদব্রজে প্রখর সূর্যতাপের মধ্য দিয়া তিনি বনে ফিরিতেছেন। বালক বালিকা পথের মধ্যে বৃক্ষে ফল ঝুলিয়া আছে দেখিয়া তাহা পাড়িবার জন্য লালায়িত—বৃক্ষ পর্য্যন্ত তাহাদের দুর্দ্দশায় সমবেদনা অনুভব করিয়া অবনত হইয়া তাহাদিগকে ফল পাড়িতে দিতেছে। পরে তাঁহারা বঙ্ক পর্ব্বতে সন্ন্যাসীবেশে এক পর্ণগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। "আমি, রাজকন্যা মাদ্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা জালী ও কৃষ্ণাজিনা, এই কয়জন মিলিয়া সেই পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলাম—পরস্পর পরস্পরের শোকাশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা অনুভব করিতাম। আমি ছেলে মেয়ে দুটির সংরক্ষণে আশ্রমে থাকিতাম, মাদ্রী বন হইতে ফল কুড়াইয়া আনিয়া আমাদের আহার যোগাইত। এই সময়ে একজন ভিক্ষুক আসিয়া আমার নিকট পুত্রকন্যা ভিক্ষা চাহিল। আমি একটু মুচ্‌কি হাসিয়া ছেলেমেয়েদের দিয়া ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। পরে স্বর্গ হইতে ইন্দ্র নামিয়া আসিয়া মাদ্রীকেও লইতে চাহিলেন—আমার সতীসাধ্বী স্ত্রী, আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহার হস্তে জল রাখিয়া মাদ্রীকেও সন্তোষচিত্তে জলাঞ্জলি দিলাম। এই দান দেখিয়া দেবতারা উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন—বনের তরুরাজি হইতে মেরু পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। আমার পুত্র, কন্যা, রাজকুমারী সকলকেই আমি বুদ্ধত্ব পাইবার আশায় পরিত্যাগ করিলাম—সেই মুনি-জন অভীপ্সিত মহামূল্য রত্নের নিকট এ সকল জিনিস কি ক্ষুদ্র—কি তুচ্ছ!"

দানশীলতার আর একটি আখ্যান শ্রবণ করুন। বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তে একটি বিজ্ঞ শশকের গল্প আছে। বুদ্ধ বলিতেছেন :—

"পূর্ব্বজন্মে যখন আমি শশক ছিলাম, পার্ব্বত্য অরণ্যে চরিয়া বেড়াইতাম। তৃণ পল্লব ফল মূল যাহা পাইতাম আহার করিতাম। এক বানর, এক শৃগাল, এক বিড়াল, আর আমি—আমরা চারিজনে মিলিয়া বনে বিচরণ করিতাম। আমার সহচরদিগকে আমি ধর্ম্মোপদেশ করিতাম—কি ভাল কি মন্দ তাহা শিক্ষা দিতাম—ভাল গ্রহণ করা, মন্দ পরিত্যাগ করা, এইরূপ উপদেশ দিতাম। পূর্ণিমার উপবাসপর্ব্বে আমি তাহাদিগকে বলিতাম "এই পুণ্য দিনে ভিক্ষুকদিগের জন্য অন্নদানের সংগ্রহ করিয়া রাখ। পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া ভিক্ষা দান করিবে ও আগে যাইতে তাহাদের জন্য ভিক্ষাসমগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।" আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই উপলক্ষে কি দান করা যায়?

কলাই মটর ডাল ভাত আমার কিছুই নাই। আমি তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা ত আর কাহাকেও দেওয়া যায় না। ভাল মনে পড়িয়াছে! কেহ আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে আমি আপনাকে দান করিব—তাহাকে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। শক্র আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণ বেশে আমার বিবরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন "ভিক্ষাং দেহি।" আমি কহিলাম, আপনি ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে—আমি আপনাকে এমন জিনিস দিব যে কেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। মহাশয়, সাধু পুরুষ কাহাকেও অনর্থক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিবেন না। আমার মিনতি যে, আপনি শুষ্ক কাষ্ঠসকল একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দিন—আমি নিজে দগ্ধ হইয়া আপনার আহার যোগাইব।" ইন্দ্র আমার কথামত করিলেন এবং অগ্নির পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিলে আমি জ্বলন্ত আনলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। জলপ্রবেশ করিলে যেমন অঙ্গদাহ নিবারিত হয়, সেই চিতানলে তেমনি আমার সকল কষ্টের অবসান হইল। অস্থি চর্ম্ম মাংস শিরা উদর হৃৎপিণ্ড সকলের সমুদয় দেহ ভস্মসাৎ হইল; ব্রাহ্মণের হস্তে আমি অকাতরে আত্মসমর্পণ করিলাম।"

বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম কাহিনীর নমুনা স্বরূপ দুই একটী ক্ষুদ্র গল্প উপরে দেওয়া হইল—এই সকল নীতিপূর্ণ উপাখ্যানে জাতকমালা পূর্ণ।

পরলোক ও মুক্তি বিষয়ে বৌদ্ধ মত জানিতে হইলে বৌদ্ধধর্মে আত্ম-তত্ত্বে শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক। আত্মার পারলৌকিক গতি ও মুক্তির কল্পনা আত্মার স্বরূপলক্ষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আত্মাকে যদি দেহের অভিন্ন—মস্তিষ্কের প্রক্রিয়ামাত্র মনে করা যায়, তাহা হইলে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ সহজে নিষ্পন্ন হয়। এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বৌদ্ধশাস্ত্রে আকাশপাতাল প্রভেদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, উপনিষদে আত্মা বলিয়া যাহা নিরূপিত, তাহা হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মা যে আমি, আমি শরীর হইতে ভিন্ন—আমি চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, মনোবৃত্তি নহি—চক্ষু কর্ণ মনোবৃত্তি আমার। ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মজ্ঞান বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে প্রজাপতির যে উপদেশ, তাহা শ্রবণ করুন—

"এই দেহ নশ্বর—মৃত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর অশরীরী, এই দেহ তাঁহার বাসস্থান। অশ্ব যেরূপ রথে যুক্ত, এই আত্মাও সেইরূপ শরীরের সহিত

সংযুক্ত। যখন আলোক চক্ষের তারকে প্রবেশ করে, তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। যিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, তিনি আত্মা, রসনা বাগিন্দ্রিয়। যিনি শ্রবণ করেন তিনি আত্মা, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। যিনি মন দ্বারা মনন করেন, তিনি আত্মা, মন দিব্যচক্ষুস্বরূপ, আত্মাই এই মনোরূপ দিব্যচক্ষে কাম্যবিষয়সকল দর্শন করত রমণ করেন। ততদিন তিনি মোহাবেশে বদ্ধ থাকিয়া বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সুখদুঃখে বিচলিত হয়েন; কিন্তু যখন তিনি দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হবেন, তখন সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যেমন অশরীরী বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ, আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে গিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করে, সেইরূপ আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরম জ্যোতিকে পাইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন— তখনই তিনি পুরুষ—তখন সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দিব্য জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া, বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, তখন তিনি পরম শান্তি পরমারোগ্য উপভোগ করেন।

উপনিষদের এই উপদেশ—বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ স্বতন্ত্র। যে ধর্ম্ম হিন্দুসমাজ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহার উপর বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বুদ্ধদেব আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম দেহমনের আড়ালে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বলে দেহ আত্মা এক। পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, কূট প্রশ্ন বলিয়া বুদ্ধদেব তাহার উত্তরদানে বিরত ছিলেন। অপরাপর গ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর অবিশ্বাসের কথা আছে—অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করা হইয়াছে দৃষ্ট হয়।

মিলিন্দ-প্রশ্ন হইতে নিম্নে যে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে আত্মতত্ত্ববিষয়ে বৌদ্ধমত স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনার নাম কি?"

নাগসেন উত্তর দিলেন "মহারাজ! আমার নাম নাগসেন, কিন্তু নাগসেন নাম মাত্র, ইহা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার কোন বাস্তব্য নাই, কোন বিষয় নাই।"

রাজা—"কোন বিষয় নাই? বলেন কি? যদি কোন বিষয় না থাকে,

কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দিয়া তোমার অভাব পূরণ করে? পীড়িত হইলে কে তোমাকে ঔষধপথ্য দেয়? কে এই সকল বস্তু ভোগ করিতেছে? কে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, পুণ্যফল ভোগ করে? কে নির্ব্বাণ লাভ করে? চৌর্য্য হত্যা পঞ্চ পাপাদি কে করে? তোমার মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই। পাপপুণ্যের ফলাফল নাই। কর্ম্মের কোন কর্ত্তা নাই। প্রভুজি, আপনাকে কেহ প্রাণে বধিলে তাহার হত্যাদোষ হয় না।"

তখন নাগসেন কহিলেন, "রাজন্, আমার কেশগুচ্ছ কি নাগসেন?

—তা নয়।

—বেদনা কি নাগসেন? নাম, রূপ, সংস্কার, বিজ্ঞান—ইহারা কি নাগসেন?

—না।

—তবে নাগসেন কোথায়? আমি যেদিকে দৃষ্টি করি নাগসেন নাই। নাগসেন একটি শব্দমাত্র।"

পরে আরও বলিলেন—

"মহারাজ! আপনি রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে পদব্রজে চলিয়া যাইতে শ্রান্তি বোধ করেন। এখানে আপনি পদব্রজে আসিয়াছেন না রথে আসিয়াছেন"?

—আমি পায়ে চলিয়া বেড়াই না, রথে আসিয়াছি।

—যদি রথে আসিয়া থাকেন ত রথ কি, আমাকে বলুন। যুগকাষ্ঠখানা কি রথ? যুগকাষ্ঠ, চক্র, আসন, ইহার কোনটাই রথ নহে। এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগও রথ নহে। আমি যেদিকে দেখি, রথ নাই,—ইহা একটি শব্দমাত্র মহারাজ! আপনি বলিলেন রথে আসিয়াছি—একি অসত্য নহে? যদি সত্য হয় ত রথ কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

—আমি যাহা বলিয়াছি সত্যই বলিয়াছি,—যুগকাষ্ঠ, চক্র, চক্রনাভি, অর, আসন; এই সব মিলিয়া রথের নাম রথ।

—যদি তাহাই ঠিক হয়, নাগসেনও সেইরূপ। রূপ, বেদনা, সংস্কার, বিজ্ঞান, এই সকল মিলিয়া তাহার নাম নাগসেন। তাহার আভ্যন্তরিক বিষয় আর কিছুই নাই। জীবাত্মা এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি।"

আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপনিষদ্ আর বৌদ্ধধর্ম্মের কি প্রভেদ দেখুন। বৌদ্ধমতে জীবাত্মা বলিয়া দেহ হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। জন্মসংস্কারে জীবন-স্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে "আমি" "তুমি" কোন মূল সত্তা বিদ্যমান নাই।

এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আমার আমিত্ব চলিয়া আসে, অথবা বিনষ্ট হইয়া যায়? বৌদ্ধদর্শন ইহার উত্তর কি দেন?—এই বিষয়টি বুঝাইবার

জন্য দীপশিখার সহিত আত্মার উপমা দেওয়া হয়। দীপশিখা যেমন বায়ুভরে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু আশ্রয় করিয়া জ্বলিয়া উঠে, জীব সেইরূপ এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে ভ্রমণ করে, এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ আশ্রয় করে। বায়ুর ন্যায় বিষয়-তৃষ্ণা জীবাত্মাকে যোন হইতে যোনিতে লইয়া যায়। এই যে জীবাত্মা অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা একও নহে—ভিন্নও নহে।

রাজা—একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিন।

—একটা দীপ জ্বালাইয়া দিলে সমস্ত রাত্রি তাহা জ্বলিতে থাকে। প্রথম প্রহরে যে শিখা জ্বলিতেছে, তাহা কি মধ্যরাত্রির শিখার সঙ্গে সমান?

—না।

—মধ্যরাত্রির শিখা ও শেষ প্রহরের শিখা—ইহারা এক কি ভিন্ন?

—এক নহে।

—তবে এই একই শিখার কি ভিন্ন রূপ বলিবেন? তাহাও নহে, সমস্ত রাত্রি সেই একই শিখা জ্বলিতেছে। আমাদের জীবনেরও এই গতি,—এক যায়, এক আসে। আদি নাই, অন্ত নাই, জীবন-চক্র ঘুরিতেছে। পূর্ব্বাপর একও নহে, আবার ভিন্নও বলা যায় না।"

এই জীবন-শিখা কার্য্য-কারণগতিকে নূতন নূতন ক্ষেত্র অধিকার করিতেছে। জ্বলিতেছে, জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছে—নূতন ইন্ধন পাইয়া পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিতেছে—মনে হয় এক অথচ ভিন্ন, ভিন্ন অথচ এক।

জীবাত্মার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহার যোনিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে?

আত্মা ছাড়িয়া অনাত্মবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক সুখদুঃখভোগী যে জীব তাহার জীবন-সমস্যা পূরণ—বৌদ্ধধর্ম্ম এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

এই সমস্যা পূরণের প্রণালী এই:—বৌদ্ধমতে যে সমস্ত উপকরণে জীবের জীবন সংগঠিত, তাহাদের নাম "স্কন্ধ"। এই স্কন্ধ পঞ্চসংখ্যক, এই পঞ্চস্কন্ধ ন্যূনাধিক মাত্রায় সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান। সেই পাচটি এই—

বিষয় প্রপঞ্চ—রূপ;
বিষয়জ্ঞান প্রপঞ্চ—বেদনা;
সংজ্ঞা প্রপঞ্চ—নাম;
সংস্কার প্রপঞ্চ—বাসনা;
বিজ্ঞান প্রপঞ্চ—(consciousness)

প্রত্যেক স্কন্ধের আবার অন্যতর নানাপ্রকার বিভাগ। এই পঞ্চ স্কন্ধের সংযোগে জীবের জন্ম—তাহাদের বিয়োগে জীবের মৃত্যু। এই সকল স্কন্ধ ছাড়িয়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

এই পঞ্চ স্কন্ধ কখন কখন 'নামরূপ' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়, মোটামুটি বলিতে গেলে জীব নামরূপের সমষ্টিমাত্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার নামের অন্তর্গত—দৈহিক ও বাহ্য বিষয় রূপের অন্তর্ভূত।

মৃত্যুকালে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধপুঞ্জের বিয়োগ হইবামাত্র অন্যত্র তাহাদের সংযোজন ঘটে, হয় ইহলোক অথবা অন্য লোকে; এইরূপে নূতন নূতন জীব সৃষ্টি হয়। এই কয়েকটি স্কন্ধের যোগাযোগেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের চরিত্র—মনুষ্যের আত্মা। এই সমস্ত স্কন্ধের মূলে আত্মা যে আমি, আমি কতকগুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এই যে আমি, আমার নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে; আজ একরূপ, কল্য অন্যরূপ। শিশু যে সে বালক নহে, বালক যে সে যুবা নহে। এই পরিবর্ত্তন অনুসারে নামের ভিন্নতা, যেমন একই দুগ্ধের পরিবর্ত্তনে ক্ষীর, দধি, ঘোল প্রভৃতি নাম ভেদ হয়। ইহাতে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—যদি আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকে তাহা হইলে শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবের ভাল মন্দ যোনিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে? আত্মা নাই ত যোনি ভ্রমণ কাহার? যেমন কথায় বলে, "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।"—ইহার উত্তরে বৌদ্ধশাস্ত্রে বলে, যদিও আত্মার অন্য সমস্ত উপাদান (স্কন্ধ) ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তথাপি কর্ম্মফল—কর্ম্মবল—অক্ষত থাকে। জীব নিজ নিজ কর্ম্মবলে নূতন জন্ম ধারণ করে। যে সকল সংস্কার এই ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে কার্য্য করিতেছে, মৃত্যু তাহাদিগকে বিয়োজিত করে, কিন্তু কর্ম্মবলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। মৃত্যু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহ হইতে বিশ্লেষিত আত্মার অবয়বখণ্ড নূতন যোনিতে সংযোজিত হয়—নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। এইরূপে জীবন-স্রোত অব্যাহত থাকে। পূর্ব্বজন্ম ও নবজন্মের মধ্যে কর্ম্মসূত্রই একমাত্র বন্ধন। মনে করুন তাড়িত শক্তির ন্যায় কর্ম্মবল বলিয়া একটি শক্তি আছে, তাহার গতিবিধিতেই জীবন গঠিত হইতেছে—সংসার চলিতেছে। যেমন রথচক্র উঁচু নীচু নানা স্থান নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, অথবা দীপশিখা কিয়ৎকাল জ্বলিয়া নিবিয়া যায়—আবার জ্বলিয়া উঠে—তাহাকে পূর্ব্বাপর একই শিখা বলা যায় না, অথচ ভিন্নও নহে। এইরূপে কর্ম্মবলে জীবনচক্র নিয়তই ঘূর্ণমান—অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মার অনুবর্ত্তিত্ব, আমার আমিত্ব অঙ্গীকার করেন না। আমার কর্ম্মের স্রোত জীবনে প্রবাহিত

হইতেছে, কিন্তু কর্ম্ম-কর্ত্তা কোন পুরুষ নাই। মোটামুটি, বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের সারাংশ এই—আত্মার পৃথক সত্তা নাই। দেহ এবং আত্মা ও আত্মার উপকরণ সমস্ত মৃত্যু দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কর্ম্মবলে সেই সকল ছিন্ন অবয়ব-খণ্ড সংসারের ক্রীড়াক্ষেত্রে নূতন নূতন জড়পিণ্ড ও জীবাকারে পরিণত হইতেছে—বিশ্বসংসার এই অখণ্ডনীয় নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। কোম্ত সম্প্রদায়ী লোকেরা (ইংরাজীতে যাদের Positivist বলে) তাঁদের মতও কতকটা এইরূপ। তাঁহারা ব্যক্তিকে—পুরুষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তাহার স্থানে মনুষ্যজাতিকে সংস্থাপিত করেন। মনুষ্যের বিনাশ—কিন্তু মানবজাতির অমরতা। মৃত্যুকালে মনুষ্যের দেহমন বিযুক্ত হইয়া আদি ভূতে মিশিয়া যায়;
স্থানে মনুষ্যজাতিকে সংস্থাপিত করেন। মনুষ্যের বিনাশ—কিন্তু মানবজাতির অমরতা। মৃত্যুকালে মনুষ্যের দেহমন বিযুক্ত হইয়া আদি ভূতে মিশিয়া যায়;
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা তাঁহার সুকৃতি এবং সাধু দৃষ্টান্ত—অন্য কথায় কর্ম্মবল এবং কর্ম্মফল; তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী সন্তান সন্ততি ও অন্যান্য লোকের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া জনসমাজ সংরক্ষণ এবং তাহার উন্নতি সাধনে সহায়ভূত হয়।

সে যাহাই হউক, এই প্রশ্ন উৎপন্ন হইতেছে, এই কর্ম্মবল কাহার? আমার, তোমার, কি অন্য কোন জীবের? আত্মা বিনষ্ট হইলে কর্ম্মবল কিসের উপর স্বীয় শক্তি চালনা করিবে? কর্ত্তা ব্যতিরেকেই বা কর্ম্মবল কিরূপে দেহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে কার্য্য করিবে? বৌদ্ধধর্ম্মের সহস্র ব্যাখ্যাতেও এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্ত্তা ছাড়িয়া দিলে কর্ম্মের বল আপনাপনি বিনষ্ট হইয়া যায়; স্বাধীন পুরুষ ছাড়িয়া দিলে শুভাশুভ কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব চলিয়া যায়। পরকালে বিশ্বাসও এই আত্ম-জ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আমি আছি, আমি পরে থাকিব, আমার আমিত্ব নিরন্তর বহমান থাকিবে, এই বিশ্বাস পরকাল-বিশ্বাসের মূল। আমার আমিত্ব গেলে কর্ম্মবলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—পরকালে বিশ্বাসও হীনবল হয়।

তবে কি এই কর্ম্মনিবন্ধন জন্মের পাকচক্র হইতে জীবের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই? আছে, এবং বুদ্ধদেব সে উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন "যস্মাৎ ভূয়ো ন জায়তে"। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনের শেষফল নির্ব্বাণমুক্তি। এই নির্ব্বাণমুক্তি কি? ঘুরিয়া ফিরিয়া এই প্রশ্নে আসিয়া পড়িতে হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ব্বাণের অনেক কথা, অনেক উপদেশ আছে। বুদ্ধের নির্ব্বাণ যে অবস্থা, তাহা ভাবাভাব এতদুভয়েরই অতীত এক অভাবনীয় অবস্থা—

"ন চাভাবোঽপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্য ভাবতা
ভাবাভাববিনির্মুক্তঃ পদার্থো নির্ব্বাণমুচ্যতে।"

(রত্নকূট সূত্র)

মিলিন্দ-প্রশ্নে নাগসেনের নির্ব্বাণ-ব্যাখ্যার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"দুঃখ শোক পাপতাপ হইতে মুক্তিলাভ—শান্তি আনন্দ পবিত্রতা—এই নির্ব্বাণের অবস্থা।

যিনি স্বীয় জীবনকে পুণ্যপথে নিয়োজিত করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করেন, তিনি কি দেখেন? জন্ম রোগ শোক জরা মৃত্যু, চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন—সকলই অস্থির—সর্ব্বত্রই অশান্তি। এই দৃশ্যে তাঁহার শরীর জ্বরে অভিভূত হয়, মন অশান্তিতে পূর্ণ হয়, কিছুতেই তাঁহার সন্তোষ নাই, তৃপ্তি নাই, পুনঃপুনঃ জন্ম ভয়ে তিনি সদাই ভীত ও ত্রস্ত, এবং সেই ভীতিবশতঃ আরোগ্যলাভে অসমর্থ। এই অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন, এই জ্বালা যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়? এই অশান্তির মধ্যে শান্তি কোথায় পাওয়া যায়? যদি এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, যেখানে জন্মভয় নাই, মৃত্যুভয় নাই, বাসনার দংশন নাই, আসক্তিবিহীন হইয়া শান্তি, আরাম, নির্ব্বাণ উপভোগ করা যায়, তাহা হইলেই তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হয়; সাধনা দ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা উপলব্ধ হয়, যেখানে জন্মভয় শোক তাপ অতিক্রম করিয়া তিনি শান্তি লাভ করেন। তখন তিনি পুলকে উৎফুল্ল হইয়া মনে করেন, এতক্ষণে আমি আশ্রয়স্থান লাভ করিলাম। সেই মোক্ষধাম অর্জ্জন ও রক্ষণ করিতে তিনি কায়মনে সচেষ্ট হন; সংযমী জিতেন্দ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ হন, সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত হয়। এইরূপ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের অতীত যাহা স্থায়ী যাহা সত্য, অর্হৎমণ্ডলীর চিরকাঙ্ক্ষিত ফল, তাহা তাঁহার হস্তগত হয়। তখনই তিনি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন।

এই নির্ব্বাণমুক্তি স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে। ধর্ম্মই তাহার আশ্রয়স্থান। চীন, তাতার, কাশ্মীর, গান্ধার, স্বর্গ মর্ত্ত্য যেখানেই থাকুন, প্রত্যেক সাধুপুরুষ বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে চলিয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী। যাঁহার চরিত্র পবিত্র, যিনি ধ্যান ও বিবেক অর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি আসক্তি বিহীন মুক্তহৃদয়, তিনি জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণরূপ অমৃত লাভ করেন।"

নাগসেন আবার কহিলেন, "নির্ব্বাণের যেমন স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না,

তেমনি তাহার কারণও নির্দ্দেশ করা যায় না। যে পথ নির্ব্বাণে লইয়া যায়, সে পথ প্রদর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু নির্ব্বাণের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা বলা যায় না। আর জিনিসটা সে কি, তাও স্পষ্ট বলা যায় না।

—তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে দাঁড়ায় এই, 'নির্ব্বাণ' কি না 'নির্ব্বাণ', অর্থাৎ তাহা কিছুই নয়।

—মহারাজ তা নয়—নির্ব্বাণ আছে, ইহা সত্য।"

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও উপনিষদের এই উপদেশ—অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"—"আছেন" এ বলা ভিন্ন আর কিসে তিনি উপলব্ধ হন?

নাগসেনের এই সমস্ত উপদেশেও নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া গেল না। যে অবস্থায় আসক্তি নাই, জন্মভয় মৃত্যুভয় নাই, রাগ দ্বেষ স্নেহ মমতা প্রভৃতি সকলই নষ্ট, মনোবৃত্তি সমুদায় তিরোহিত, সে যে কি অবস্থা কে বলিতে পারে? কাহার সাধ্য ভাবিয়া উঠে? কথিত আছে বুদ্ধদেব স্বয়ং এই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার শিষ্যেরা সে অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; দেখা যাক্ এই বর্ণনা হইতে বেশী কিছু জ্ঞানলাভ হয় কি না।

বুদ্ধদেব তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকালে শিষ্যদিগকে ডাকিয়া উপদেশ করিলেন, "পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই অনিত্য, তোমরা যত্নপূর্ব্বক আপনারা আপন মুক্তি-সাধন কর।" এই কয়েকটি কথা তথাগতের শেষ কথা।

পরে বুদ্ধদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া নির্ব্বাণের প্রথম সোপানে পাদনিক্ষেপ করিলেন; প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় সোপানে, দ্বিতীয় সোপান হইতে তৃতীয় সোপানে, তৃতীয় হইতে চতুর্থ সোপানে। তখনও তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, কতক জ্ঞান, কতক আনন্দ অবশিষ্ট আছে। আরও উচ্চে উঠিতে হইবে। চতুর্থ মহাধ্যান-সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি সেই সোপানে পদক্ষেপ করিলেন, যেখানে কেবল অনন্ত আকাশ বিরাজমান। অনন্ত আকাশের সোপান হইতে তথায় পদার্পণ করিলেন, যেখানে কোন চিন্তা, কোন ভাব, কোন মনোবৃত্তি বিদ্যমান নাই—সকলি শূন্য। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। শূন্যতার অনুভবেও আনন্দ, তাহাও বিনষ্ট করা আবশ্যক। পরে শূন্যতার সোপান হইতে এমন স্থানে উপনীত হইলেন, যাহা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী স্থান। এই সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া এমন স্থানে পৌঁছিলেন যাহা সম্পূর্ণ চেতনাশূন্য, যেখানে সমুদয় মনোবৃত্তি তিরোহিত, যেখানে কোন ভাব-জ্ঞানও নাই, অভাব-জ্ঞানও নাই। এই শিখরদেশে পৌঁছিবার পর তিনি সোপানপরম্পরা দিয়া নিম্নদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম ধ্যান-

সোপানে আসিয়া পড়িলেন। দ্বিতীয়বার উঠিতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ ধাপের উচ্চে আর উঠিতে পারিলেন না, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

বুদ্ধদেব উল্লিখিত প্রকারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বৌদ্ধমতে আমরাও সাধনাবলে, পুণ্যবলে, বিষয়তৃষ্ণা পরিহার করিয়া, সত্য সাধুতা স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়া, আমাদের জীবদ্দশায় অথবা পরলোকে এই নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভে জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারি। বৌদ্ধেরা বলেন, অর্হদ্গুণী নিজ নিজ পুণ্যবলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত অর্হৎ-চরিত্র বৌদ্ধদের আদর্শ চরিত্র। এই নির্ব্বাণাবস্থা জ্ঞান কিম্বা অজ্ঞানাবস্থা, চেতন কিম্বা অচেতন ভাব, বুদ্ধের উপদেশে তাহার ব্যাখ্যা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, এ অবস্থা কার্য্য-কারণশৃঙ্খলের অতীত। এরূপ অবস্থা "নেতি" "নেতি" ভিন্ন আর কোন্ শব্দে ব্যক্ত হইতে পারে? এখানে বাসনা ছিন্নমূল—দুঃখ ক্লেশ জ্বালা যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি—এক কথায় আমার আমিত্ব লোপ। বৌদ্ধধর্ম্মে মনুষ্য জীবনের এই চরম ফল—এই শেষ গতি। এখন কথা এই যে, বেদোপনিষদের ব্রহ্ম অথবা বুদ্ধের নির্ব্বাণ—আমাদের যথার্থ লক্ষ্যস্থান কি হইতে পারে? এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্টা ঠিক? নির্ব্বাণের অর্থ যদি শূন্যতা হয়, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মানবপ্রকৃতি এই শূন্যতা অবলম্বন করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য শূন্যতা চায় না, মনুষ্য পুরুষের আশ্রয় চায়। আমরা ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষেরই প্রাধান্য দেখিতে পাই, তার সাক্ষী এই বৌদ্ধধর্ম্মই দেখুন। বুদ্ধদেবই কি এ ধর্ম্মের প্রাণ নহেন? আরো দেখুন, ঈশার পুরুষকার খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বস্ব—ঈশাকে ছাড়িয়া দিলে খৃষ্টধর্ম্মের আর কি অবশিষ্ট থাকে? মহম্মদ বিহনে মুসলমান ধর্ম্ম কোথায় থাকে? চৈতন্য প্রভুর প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই বা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? এই সকল ধর্ম্মবীরেরাই মহাপুরুষ। এই সকল মহাপুরুষ সময়ে সময়ে অভ্যুদিত হইয়া মনুষ্যের অচেতন আত্মাকে সচেতন করিয়া তোলেন—দুর্গতি-প্রাপ্ত মনুষ্যসমাজকে উদ্ধার করেন। পুরুষ শব্দ পূর্ণত্বাব্যঞ্জক। ভক্তের উপাস্য দেবতা যে পরমাত্মা, তিনিও পুরুষ, তিনি পূর্ণ পুরুষ,—"জ্ঞানে পরিপূর্ণ—প্রেমে পরিপূর্ণ, আর অটল প্রশান্ত মহত্ত্বল এবং মহোদ্যমে পরিপূর্ণ।" আমি যে কথাগুলি বলিলাম, বৌদ্ধধর্ম্ম স্বয়ং তাহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ নির্ব্বাণ নানাস্থানে নানারূপ ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধ ব্রহ্মকে স্বীয় ধর্ম্মমন্দিরে স্থান দান

করেন নাই ; তথাপি তিনি স্বয়ং যেমন অনেকানেক ভক্ত কর্তৃক দেবতা রূপে পূজিত হইয়াছেন, সেইরূপ নির্ব্বাণের শূন্যতাও স্বর্গসুখ-কল্পনায় ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, শূন্যতা আশ্রয় করিয়া কোন ধর্মই টিকিতে পারে না।

আমার মনে অনেক সময় এই তর্ক উপস্থিত হয়—বৈদান্তিক মুক্তি আর বৌদ্ধ নির্ব্বাণ, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? এই দুই শুনিতে যত ভিন্ন, আসলে তত নয়। বেদান্ত দর্শন বলেন, নদী যেমন সমুদ্রে পড়িয়া স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায়, জীবাত্মাও সেইরূপ মোক্ষাবস্থায় নিজত্ব ছাড়িয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। "বেদান্ত দর্শনের চৌতলা দেবমন্দিরে বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশান, এই তিন দেবতার তিনটি বিভিন্ন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; চৌতলায় দেওয়া হইয়াছে তুরীয় অবস্থাকে ; এ স্থানটি জীবেশ্বরের ঐক্যস্থান বা সমাধিস্থান। এ অবস্থায় জীব 'সোঽহম্' জ্ঞানে ব্রহ্মত্ব লাভ করে—এখানে রোগ নাই, শোক নাই, 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।' বৌদ্ধ চৌতলা মন্দিরে নির্ব্বাণমুক্তিও ইহার অবিকল প্রতিচ্ছবি।" আসল কথা, এ অবস্থায় আমার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য—আমার আমিত্ব বজায় থাকিবে কিনা? যদি আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইল, তবে আমি প্রস্তরে পরিণত হই, কিম্বা ব্রহ্মেতে বিলীন হই, অথবা নির্ব্বাণ-মহাসাগরে মিশিয়া যাই, আমার পক্ষে সে একই কথা। আমি জানিতে চাই, আমার আমিত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অথবা ক্রমোন্নতি সহকারে উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরূঢ় হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম স্বাধীনতার উন্নত হইবে? যদি জিজ্ঞাসা করেন 'আমি কি',—ইহা যুক্তি ও তর্কের কথা নহে, আমরা প্রত্যেকে অন্তরাত্মাতে জ্ঞানালোকে তাহা অনুভব করিতেছি। আমি জড় হইতে পৃথক্, অন্য জীব হইতে পৃথক্—এই পার্থক্য হইতেই আমার আমিত্ব ফুটিয়া উঠে। আমার এই আত্মা, কর্ম্ম বাসনা প্রেম মমতা ও অন্যরূপ সহস্র আকর্ষণের মধ্য দিয়া, এই ক্ষণস্থায়ী বাসগৃহে থাকিয়া দুঃখক্লেশের মধ্য দিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমি যে অনন্ত জীবন প্রতীক্ষা করিতেছি, তাহাতে আমার আমিত্ব সুরক্ষিত থাকিবে ; আমার নিজের শুভাশুভের জন্য আমি নিজেই দায়ী ; আমার নিজের কর্ম্মফল আমি নিজেই ভোগ করিব ; আমার পুণ্যফল পাপের উদ্যোগ আমারই। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বেদান্ত দর্শন, এ উভয়ের উপদেশ অনুসারে যদি আমার আমিত্ব লোপেই মুক্তি হয়, তবে আমার পক্ষে এ দুইই সমান। ব্রহ্মেতে আত্মার লয়

কিংবা মহানির্ব্বাণে আত্মার লয়, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? বৌদ্ধধর্ম্ম যদি এই অহমিকার উচ্ছেদে, এই আত্মঘাতে মুক্তি অন্বেষণ করতে প্রবৃত্ত হন, তবে বুদ্ধের উপদিষ্ট সার্ব্বভৌম মৈত্র্যের আধার কোথায় মিলিবে? অন্তের প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া দিলে কি প্রেমের মূল শুষ্ক হয় না? আসক্তিবিহীন প্রীতি—এ ত আমাদের কল্পনাতীত। মনুষ্য যদি কখন ঈশ্বরলাভে সমর্থ হয়, তবুও তাহার জীবনস্রোত পৃথক্ ভাবে প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজনীয়। মনুষ্যজন্ম দুঃখময় বলিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করা—কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া স্পন্দহীন অচল নিশ্চেষ্টতার মধ্যে প্রবেশ করা—সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া ব্রহ্মে কিম্বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া, ইহার পরিণামে মনুষ্যত্বের আর কি অবশিষ্ট রহিল? ভক্তি-ভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "বৈদান্তিক চৌতলা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এবং বৌদ্ধ চৌতলা মন্দিরের নির্ব্বাণ-মুক্তি এ-পিঠ ও-পিঠ।" বেদান্তমতে জীবাত্মার পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া-বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ-প্রলয়সাগরে ডুবিয়া যাওয়া—ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই-অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, শূন্যতা, বিনাশ!

টিপ্পনী—বুদ্ধদেব বৈশালীর কূটাগার শালায় যে উপদেশ দেন তাহার ব্যাখ্যা।

চারিটি স্মৃতি-উপস্থান (ধ্যান)—

১। কায় অপবিত্র
২। সংসার দুঃখময়
৩। চিত্ত চঞ্চল
৪। পদার্থসমূহ অলীক

চারিটী ধর্ম্ম-চেষ্টা—

১। অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ
২। অলব্ধ পুণ্যের উপার্জ্জন
৩। পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ
৪। নূতন পাপের অনুৎপত্তি

চারিটী ঋদ্ধিপাদ :—

অলৌকিক সিদ্ধি লাভের—

১। অভিলাষ
২। চিন্তা
৩। উৎসাহ
৪। অন্বেষণ

পঞ্চবল—

১। শ্রদ্ধা
২। সমাধি
৩। বীর্য্য
৪। স্মৃতি
৫। প্রজ্ঞা

সপ্ত বোধাঙ্গ—

১। স্মৃতি
২। বিবেক
৩। বীর্য্য
৪। প্রীতি
৫। শ্রদ্ধা
৬। বৈরাগ্য
৭। সমাধি

অষ্ট আর্য্যমার্গ—

১। সম্যক্ দৃষ্টি
২। সম্যক্ সঙ্কল্প
৩। সম্যক্ বাক্
৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত
৫। সম্যক্ আজীব
৬। সম্যক্ ব্যায়াম
৭। সম্যক্ স্মৃতি
৮। সম্যক্ সমাধি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ।

উপক্রমণিকা।—

বৌদ্ধধর্ম্ম ত্রিরত্নে খচিত—বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ। হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মক্ষেত্রে এই তিনের ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত দেখা যায়। মুমুক্ষু ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় এই ত্রিবর্গের শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষা লাভ করেন।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

—বৌদ্ধদের এই দীক্ষামন্ত্র।

সঙ্ঘ—

এ পর্য্যন্ত 'বুদ্ধ' ও 'ধর্ম্ম', এই দুই অঙ্গ লইয়াই অল্প-বিস্তর চর্চ্চা করা গিয়াছে। বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত এবং তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব যথাসাধ্য সমালোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের তৃতীয় অঙ্গ যে সঙ্ঘ, এই প্রবন্ধে তাঁহার অবতারণা সঙ্গত বোধ হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র এই যে, মনুষ্যের জীবনযাত্রা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়; বিষয়-তৃষ্ণাই সে দুঃখের মূল, এবং বুদ্ধ-নির্দ্দিষ্ট আর্য্যমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তৃষ্ণা পরিহারই সেই মূলোচ্ছেদের উপায়। এইরূপ বিশ্বাস ও উপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ সঙ্ঘের উৎপত্তি। গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের উপদেশ সম্যকরূপে পালন করা গৃহীর পক্ষে সম্ভব নহে। সংসারের মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হওয়া নির্ব্বাণ লাভের উৎকৃষ্ট সাধন; সহজ কথায়, নির্ব্বাণপথের পথিক হইতে গেলে গৃহস্থের সন্ন্যাসী হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধদেব স্বয়ং মুণ্ডিত কেশে, গৈরিক বেশে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই জীবন-ব্রত অবলম্বন করিলেন, এবং স্বকীয় দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা অন্যকে সেই পথে নিয়োজিত করিলেন। কাজেই তাঁর শিষ্যবর্গ মিলিয়া এক উদাসীন সম্প্রদায় স্বতই সংগঠিত হইল। বুদ্ধসম্প্রদায়ী উদাসীনের নাম ভিক্ষু, এবং সমাজবদ্ধ ভিক্ষুদলের নাম সঙ্ঘ।

বৌদ্ধধর্ম্ম যখন হিন্দুসমাজ হইতেই বিনিঃসৃত, তখন সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে, এই উদাসীন-সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের স্বকপোল-কল্পিত নূতন সৃষ্টি নয়। ইহার নিয়মাবলীর মধ্যে হিন্দুসমাজের রীতিনীতিবহির্ভূত অভিনব ব্যাপার কিছুই নাই। হিন্দুদের আদর্শ-জীবন ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত। ইহার শেষ আশ্রম-বাসী যিনি, তিনি সন্ন্যাসী। বুদ্ধের সময়েও যোগী, বৈরাগী, যতী, মৌনী, নির্গ্রন্থ, অচেলক, আজীবক, দিগম্বর প্রভৃতি নানা ধরণের সন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিল; তাঁহার প্রবর্ত্তিত উদাসীন-সম্প্রদায়ও উহাদের সহিত এক ছাঁচেই গঠিত। তবে ইহার বিশেষত্ব কোন্‌খানে, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

মধ্যপথ।—

অন্যান্য উদাসীন-সম্প্রদায়ের সহিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের এক বিষয়ে পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। শরীর-শোষণ, উপোষণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি কষ্টসাধন বুদ্ধদেবের অনুমোদিত ছিল না। তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণের পর ৭ বৎসর ধরিয়া তিনি ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন। প্রথমে তিনি আলাড় ও রুদ্রক, এই দুই গুরুর নিকট যোগশিক্ষা করেন; তাহাতে কোন ফল না পাইয়া রাজগৃহ হইতে উরুবেলার বনে গিয়া আর পাঁচ জন সন্ন্যাসীসহ নিঃশ্বাস-রোধ, দীর্ঘ উপবাস, শরীর শোষণকারী অশেষ প্রকার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহার কমিয়া কমিয়া ক্রমে এক মুঠা চাউল, তাহাও রহিল না। শেষে একদিন এমন হইল যে চলিতে চলিতে মূর্চ্ছা গিয়া ভূতলে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর এই সমস্ত কঠোর সাধনা নিতান্ত নিষ্ফল বিবেচনায়, তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন। অনশন-ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ আহারাদি দ্বারা শরীরে বল পাইলেন—তখন ধর্ম্মসাধনের অন্য পন্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধত্ব পাইবার পর তাঁহার বারাণসী বক্তৃতায় বলেন যে, একদিকে কঠোর তপস্যার শরীর ক্ষয়, অন্য দিকে আমোদ প্রমোদ বিলাসিতা,—তিনি এই উভয়ের মধ্য-পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। উপবাস বা শরীরশোষণ প্রকৃত ধর্ম্মসাধন নহে, কিন্তু আত্ম-সংযম ও সত্যানুশীলনই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়; শরীরে বল না থাকিলে আত্মারও বলহানি হয়, বুদ্ধদেব তাহা পরীক্ষায় জানিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের বীণাতন্ত্রীর সহিত সাদৃশ্য দেওয়া হয়—খুব জোরে বাঁধিলে তার ছিঁড়িয়া যায়, বেশী ঢিলা থাকিলেও সুস্বর হয় না। অতএব শারীরিক কষ্টকল্পনা ছাড়িয়া অন্তরের দিকে দৃষ্টি

করা—ধ্যানধারণা আত্ম-সংযম দ্বারা মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য সাধন করা—বুদ্ধ এইরূপ উপদেশ দিতেন। তাঁহার ভিক্ষুদল সেই উপদেশানুসারে চলিত। আহার বিহার বাস বসনে অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হইতে তাহাদের চালচলন স্বতন্ত্র ছিল। বৌদ্ধভিক্ষু ভিক্ষান্ন-জীবী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কোন অন্নকষ্ট ছিল না। স্বহস্তস্যূত চীরপুঞ্জ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিগম্বরের ন্যায় বিবস্ত্র থাকিতেন না—ত্রিবসনমণ্ডিত সুরুচি-সঙ্গত ভদ্র সাজে সজ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। কথিত আছে যে, একদিন অনাথপিণ্ডদের বাড়ী একদল জটাধারী, ভস্ম-বিভূতিমাখা, বীভৎস নগ্ন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার স্ত্রী আপন পুত্রবধূ সুমাগধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আসিয়া দেখ কেমন সন্ন্যাসী আসিয়াছে।" সুমাগধা ভাবিলেন সারীপুত্র কি আর কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিতে পাইবেন; এই মনে করিয়া মহোল্লাসে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দেখেন, একি অদ্ভুত দৃশ্য! এই সকল বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁর চক্ষু স্থির! অমনি বিমর্ষ ভাবে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া শাশুড়ী ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" তিনি বলিলেন, "এই সকল ভিক্ষু যদি সাধু হয়, তবে না জানি দুর্জ্জন কাহাকে বলে?"

সঙ্ঘের গঠন—দলাদলি।

এই উদাসীন সম্প্রদায় যে কঠোর সামাজিক শাসনতন্ত্রে বদ্ধ ছিল, তাহা নহে। রাজার ন্যায় কোন শাসনকর্ত্তার উপর সঙ্ঘের শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল না; সুশাসন উদ্দেশ্যে ঐ সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি সভাও সংস্থাপিত হয় নাই। বুদ্ধদেব মঠপতি সদৃশ আপনার কোন উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই, তাঁহার মরণান্তর তাঁহার শিষ্য আনন্দ তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। আনন্দ তখন রাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাজ অজাতশত্রু সেখানে এক দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ করেন ও তাঁহার প্রধান অমাত্য এই কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "বুদ্ধদেব কি তাঁহার কোন শিষ্যকে আপন উত্তরাধিকারীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন?" আনন্দ তাহার উত্তরে কহিলেন—না। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্ঘ হইতে কি কোন একজন ভিক্ষু মঠাধিকারী রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন?" তাহার উত্তরেও তিনি বলিলেন "এরূপ কোন ভিক্ষু নিযুক্ত হন নাই।"—"যদি তোমাদের কোন পথপ্রদর্শক না থাকেন, তবে তোমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের উপায় কি?" উত্তর—"আমাদের

সে আশ্রয়ের অভাব নাই, আমাদের শরণ—ধর্ম্ম।" ভিক্ষুদল যে সমস্ত আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন, তাহা ভগবান বুদ্ধের আদেশ বলিয়া প্রচারিত হইত। বুদ্ধই ভিক্ষুদলের দলপতি—তাঁহার আদেশ, তাঁহার উপদেশ ও অনুশাসন ভিক্ষুদের সকলেরই মাননীয় ও পালনীয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার শাসন অনতিক্রমণীয় ছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আর সে শাসনের বল ছিল না, তখন তাঁহার নিয়মভঙ্গ নিবারণের একমাত্র উপায় ছিল ভিক্ষুসভা আহ্বান করিয়া তাহাদের মন্ত্রণা গ্রহণ; এই উদ্দেশ্যেই রাজগৃহ ও বৈশালীতে বৌদ্ধসভা হয়। কিন্তু এই সকল সভার স্থানীয় অধিকার ভিন্ন অধিক কিছু কল্পনা করা যায় না। সে সভার শাসন-বল কতটা? সে সভার মতামত সাধারণ বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত করিবার উপায় কি ছিল? তাহার কোন নিয়ম জারি হইলে তাহা যদি কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পালন করে, সে অন্যকথা—কিন্তু না করিলেই বা কি? বুদ্ধদেবের মৃত্যুতে সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যেমন শোকধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এই কথাও শুনা গেল—"আঃ! গৌতম গেল, বাঁচা গেল। এখন আমরা মনের সাধে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিব, আমাদের শাসন করিবার জন্য কোন গুরুমশায় নাই।" এই কথা শুনিয়া কাশ্যপের মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল, ও তাঁহারই মন্ত্রণায় ভিক্ষুসভা বসিল। কিন্তু তাহার বিধান মানে কে? এইরূপ কথিত আছে যে, রাজগৃহের সভাস্থলে স্থবির ভিক্ষু পুরাণ উপস্থিত ছিলেন না। সভা ভঙ্গের পর তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে বলা হইল—"হে পুরাণ, স্থবিরদের মতে এই যে শাস্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অনুমোদন করিতে আজ্ঞা হউক।" পুরাণ কহিলেন "তাঁহারা শাস্ত্র বাঁধিয়াছেন ভালই, কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধ ভগবানই আমার গুরু; তাঁহার মুখে আমি যে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, আমি তাহাতেই অনুরক্ত থাকিব।" বৈশালীর সভাও এই দলাদলি হইতে উৎপন্ন। কতকগুলি ভিক্ষু সঙ্ঘনিয়মের কঠোরতা নিবারণ জন্য কোন কোন নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁহারা এইরূপ দশটি নিয়ম নির্দ্দেশ করেন—অশন বসন সম্বন্ধে কতকগুলি ছোটখাট নিয়ম, তাছাড়া সোনারূপা গ্রহণের যে নিষেধ ছিল, তাহা দূরীকরণ। এই সকল বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্কের পর নবীন মত অগ্রাহ্য হইয়া সঙ্ঘের প্রাচীনপন্থীদের মর্য্যাদাই রক্ষিত হইল। তথাপি প্রতিপক্ষীয়েরা সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারাও স্বপক্ষ হইতে এক সভা করিলেন—এই সভা 'মহাসঙ্গীতি' বলিয়া অভিহিত। এই বিপক্ষ দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দীপবংশ বলেন—

"ইহারা ধর্ম্মনষ্ট করিতে ও শাস্ত্র উল্টাইতে চায়—বুদ্ধের উপদেশের নূতন অর্থ করিয়া স্বমত সমর্থন করে—সূত্র বিনয় ও পরিবার পাঠ, অভিধর্ম্ম, নিদেশ, জাতক প্রভৃতি একদিকে ফেলিয়া দিয়া নিজেদের মনগড়া শাস্ত্র পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে উদ্যত।" বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই মতভেদ দলাদলি আরো বাড়িয়া উঠিল—ক্রমে বৌদ্ধেরা অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল—তাহাদের গুরুও ভিন্ন ভিন্ন। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রতিকূলে বুদ্ধের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা, বৌদ্ধশাস্ত্রে আস্থা, ধর্ম্মশাস্ত্রে আস্থা, ধর্ম্মবন্ধনে সাধারণ অনুরাগ ও উৎসাহ —এ ভিন্ন আর কোন শক্তি ছিল না। ভারতে বৌদ্ধ সঙ্ঘ নির্ম্মূল হইবার এক কারণ মনে হয় সঙ্ঘের এই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা বুদ্ধদেবের জীবদ্দশা হইতেই এইরূপ মতভেদের সূত্রপাত দেখা যায়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে আলোচ্য বিষয়ের স্পষ্টীকরণ হইবে; আমরাও আমাদের এখানকার সমাজের বিচ্ছেদ দলাদলি দূর করিবার সদুপায় স্থির করিতে পারিব।

যখন ভগবান্ বুদ্ধ কৌশাম্বীতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর প্রতি অকারণে দোষারোপ করা হয়, কিন্তু তিনি নিজ দোষ কিছুতেই স্বীকার করেন না; ভিক্ষুমণ্ডলী তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বহিষ্কার দণ্ড বিধান করে।

সেই ভিক্ষু বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ এবং বিনীত স্বভাব ছিলেন। তিনি নিজ বন্ধুগণের নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি ত কোন দোষ করি নাই, আমাকে অনর্থক দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। আমি আপনাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত মনে করিতে পারি না। আপনারা আমাকে এই অন্যায় দণ্ড হইতে মুক্তি দান করুন।"

তাঁহার বন্ধুগণ বিচারকদের নিকট গিয়া আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর, দুই দলের মধ্যে ঘোরতর কলহ-বিবাদের উপক্রম হইল।

বুদ্ধের নিকট ইহার মীমাংসার জন্য উভয় দলই উপস্থিত হইল। বুদ্ধদেব দু'পক্ষকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, ও যাহাতে সদ্ভাব রক্ষিত হয়, তাহার উপদেশ দিলেন।

তবুও দলাদলি ভাঙ্গে না। উভয় পক্ষ স্বতন্ত্রভাবে উপবাস প্রভৃতি নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইল। বুদ্ধদেব তাহা দেখিয়া বলিলেন, দুই দলের মধ্যে যখন ঐক্য নাই, তখন তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মকৃত্য অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। তিনি বিবাদের সূত্রধরদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা পরাহত হয় না, কিন্তু প্রেমগুণে বিজিত হয়। অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কিছু বলিবার নাই;

কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এইরূপ অসদ্ব্যবহার দূষণীয়। তোমরা সকলে শান্তি ও সদ্ভাবে বাস করিতে শিক্ষা কর, এই আমার উপদেশ। আর তা না পার ত বনে গিয়া নির্জ্জনে বাস কর।* দুষ্টের সহবাস অপেক্ষা অরণ্যের নির্জ্জনতা শতগুণে শ্রেয়স্কর।"

এইরূপ উপদেশেও ভিক্ষুদলের বিবাদ ভঞ্জন না হওয়াতে, ভগবান বুদ্ধ কৌশাম্বী পরিত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এই কলহ-বিবাদ আরো অধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে কৌশাম্বীর গৃহস্থেরা স্থির করিল, "এই সকল ভিক্ষু মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে, ইহাদের দৌরাত্ম্যে বুদ্ধদেবও দূরে গমন করিলেন। এই সকল ভিক্ষুদিগকে আমরা আর ভিক্ষা দান করিব না। ইহারা গৈরিক বসন ধারণের উপযুক্ত নহে—ইহারা সংসারে ফিরিয়া গেলেই ঠিক হয়।" গৃহীদের এইরূপ আচরণে ভিক্ষুদলের চৈতন্য হইল, ও তাহারা তখন পরস্পরের মধ্যে শান্তিস্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইল।

উভয় পক্ষের লোকেরা শ্রাবস্তী গিয়া উপস্থিত হইল। সারীপুত্র বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! এই সকল কলহপ্রিয় ভিক্ষুদল সমাগত হইয়াছে, ইহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব?

বুদ্ধদেব কহিলেন :—

"ইহাদিগকে ভর্ৎসনা করিও না—কর্কশবাক্য কাহারো ভাল লাগে না। উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার কর। এক পক্ষের কথা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা অসম্ভব। উভয় পক্ষের দোষগুণ প্রণিধানপুরঃসর বিচার করা মুনির লক্ষণ।"

কুলস্ত্রী প্রজাপতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এইক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, "উভয় দলকেই গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া পরিতুষ্ট কর—কোন এক দলের প্রতি পক্ষপাতী হইও না।"

উপালী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহাদের কলহের ব্যাপার তদন্ত না করিয়া কি ইহাদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন বিধেয়? বুদ্ধ কহিলেন—"না, এরূপ হইতে পারে না। অনুসন্ধান দ্বারা ইহাদের দোষগুণ বিচার করিয়া এর শেষ পর্য্যন্ত তলাইয়া না দেখিলে সন্ধিস্থাপনের উপায় নির্ণয় করা অসাধ্য। মৌখিক সন্ধি কোন কার্য্যের নহে—অন্তরের সহিত পরস্পরের দোষ মার্জ্জনা না করিলে স্থায়ী ফল প্রত্যাশা করা বৃথা। এক মৌখিক সন্ধি—অন্য যে আন্তরিক সখ্য-বন্ধন, তাহাই প্রকৃত সন্ধি।" এই বলিয়া তিনি দীর্ঘায়ুর গল্প বলিলেন :—

পুরাকালে কাশীতে ব্রহ্মদত্ত নামক এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন।

তিনি দীর্ঘেতি নামক কোশল রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কারণ তিনি মনে ভাবিলেন কোশল এক ক্ষুদ্র রাজ্য—দীর্ঘেতি আমার সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিবে না। দীর্ঘেতি নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, ও নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কাশী আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় তিনি সন্ন্যাসীবেশে এক কুম্ভকার-গৃহে রাণীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাণীর এক সন্তান জন্মিল, তাহার নাম দীর্ঘায়ু। দীর্ঘায়ু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহাকে দূরে পাঠাইয়া দিলেন।

যখন ব্রহ্মদত্ত জানিতে পারিলেন যে, কোশলরাজ ছদ্মবেশে রাণীর সহিত কুম্ভকার-গৃহে বাস করিতেছেন, তখন তিনি তাহাদের উভয়কে ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ড আদেশ কবিলেন।

তাঁহাদের পুত্র দীর্ঘায়ু কাশীর বাহিরে বাস করিতেছিল, তাহার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে আনাইয়া উপদেশ দিলেন—"হে পুত্র দীর্ঘায়ু, অধিক দেখিও না—অল্প দেখিও না। হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা পরাজিত হয় না—মৈত্রীগুণে হিংসাকে পরাজয় করিবেক।"

দীর্ঘায়ু বনে গমন করিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নগরে ফিরিয়া আসিয়া নৃপতির হস্তী-রক্ষকের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি বীণা বাজাইয়া মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিলেন। রাজা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করাতে পরিজনেরা বালকটীকে রাজার নিকট লইয়া গেল; রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপনার পার্শ্বচর করিয়া রাখিলেন।

একদিন রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়া তাঁহার অনুচরবর্গ হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন—সঙ্গে কেবল দীর্ঘায়ু রহিল। দীর্ঘায়ুর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া রাজা নিদ্রা গেলেন।

দীর্ঘায়ু মনে মনে ভাবিলেন, রাজা আমাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন—আমার পিতা মাতাকে হনন করিয়া আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন। এখন তাহার প্রতিশোধের সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি কোষ হইতে তরবারি উন্মোচন করিলেন।

তখন পিতার শেষ কথাগুলি দীর্ঘায়ুর স্মরণ হইল—স্মরণ করিয়া আবার খড়্গ কোষমধ্যে রাখিয়া দিলেন।

রাজা এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাজা কহিলেন, "আমার কখনই সুনিদ্রা হয় না, আমি সর্ব্বদাই এই দুঃস্বপ্ন দেখি যে, দীর্ঘায়ু তরবারি হস্তে আমাকে মারিতে আসিতেছে—দেখিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছি, এই স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে জাগিয়া উঠিলাম।"

তখন যুবক বাম হস্ত রাজার মস্তকে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমিই দীর্ঘায়ু, দীর্ঘেতি রাজার পুত্র—আমার পিতাকে হনন করিয়া আপনি তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছেন। দেখুন এখন প্রতিশোধের সময় আসিয়াছে।"

রাজা আপনাকে অরক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, "হে দীর্ঘায়ু, আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও—আমাকে বাঁচাও—প্রাণে মারিও না।"

দীর্ঘায়ু বলিল—"কেমন করিয়া আপনার প্রাণদান করিব, যখন আমার নিজের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত। যদি আপনি আমাকে অভয়বচন দেন, তাহা হইলে আমিও আপনার প্রাণ রক্ষা করিব।"

রাজা সম্মত হইয়া কহিলেন, "তুমি আমার প্রাণদান কর, আমিও তোমাকে অভয়বচন দিতেছি।"

পরে তাঁহারা পরস্পর হাতে হাত দিয়া বন্ধুত্ব শপথ করিলেন।

ব্রহ্মদত্তকে দীর্ঘায়ু তাঁহার পিতার শেষ উপদেশগুলি ভাঙ্গিয়া বলিলেন। ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা মৃত্যুকালে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার অর্থ কি?—"অধিক দেখিও না, অল্প দেখিও না, হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা জিত হয় না।"

দীর্ঘায়ু কহিলেন—"অধিক দেখিও না, অর্থাৎ হিংসা অধিক কাল মনে স্থান দিও না, অল্প দেখিও না, অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদ অল্পে হইতে দিও না। হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা নিবারিত হয় না, তাহার অর্থ এই,—তুমি আমার পিতা মাতাকে বধ করিয়াছ, আমি যদি তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে তোমাকে হত্যা করি, তাহা হইলে তোমার পক্ষের লোকেরা তাহার প্রতিশোধ তুলিয়া আমাকে বধ করিবে, ও আমার পক্ষের লোকেরা তাহার শোধ তুলিবার চেষ্টায় ফিরিবে;—প্রতিহিংসা দ্বারা হিংসা জিত হয় না। মহারাজ! এখন তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আমিও তোমাকে প্রাণদান করিলাম,—অহিংসা দ্বারা হিংসার পরাজয় হইল।"

ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার রাজ্য অশ্ব রথ সেনা সম্পত্তি

তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন; এবং স্বীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! বড় লোকেদের এই দৃষ্টান্তে তোমরাও ক্ষমা দয়া অভ্যাস কর; গুরুজনকে ভক্তি কর; সকলকে প্রেমদৃষ্টিতে দেখ। তোমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিও না শান্তি ও সদ্ভাবে মিলিত হইয়া বাস কর—এই আমার উপদেশ। আশীর্ব্বাদ করি যে গৃহস্থেরা তোমাদের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সুখী হউক।

ভগবান বুদ্ধ গল্পচ্ছলে এই উপদেশ প্রদান করিয়া ভিক্ষুদিগকে বিদায় করিলেন।

ভিক্ষুদল মিলিত হইয়া তাহাদের বিবাদ কলহ মিটাইয়া ফেলিল, ও সেই অবধি তাহারা সুখে সদ্ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিল। সঙ্ঘের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইল।

বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড—পৌরোহিত্য।—

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব কালে আর্য্যসমাজে বলি, হোম, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ প্রবহমান ছিল, এবং এই সকল কর্ম্মকাণ্ডের অধিনায়ক হোতা ঋত্বিক্ অধ্বর্য্যু প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পুরোহিত বিদ্যমান ছিলেন। এই আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম্ম ও পৌরোহিত্য পরিবর্জনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি-ভিত্তির উপর বুদ্ধদেব তাঁহার সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। তিনি বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড, বিশেষতঃ পশুবলির প্রতি কিরূপ বীতরাগ ছিলেন, তাহার নিদর্শন বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিষয় লইয়া এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয়, তাহাতে বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দেন ঃ—

পুরাকালে এক মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন, তিনি এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। কুল-পুরোহিতকে ডাকিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করাতে পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজাদের সুখ শান্তি ও কল্যাণসাধনে মনোনিবেশ করুন।—এই পরামর্শক্রমে রাজ্যের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া, পরে তিনি যজ্ঞারম্ভ করিলেন। সে যজ্ঞে কোন পশু হত্যার ব্যবস্থা নাই! কোন বৃক্ষচ্ছেদন, একটী তৃণেরও উচ্ছেদ-সাধনের প্রয়োজন হইল না। ভৃত্যেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেল। ক্ষীর দুগ্ধ মধুপর্ক—এই সমস্ত বলিতে যজ্ঞের কার্য্য সমাধা হইল। কিন্তু বুদ্ধ কহিলেন, ইহা অপেক্ষাও মহত্তর বলি আছে, অথচ তাহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য—সে কি, না ভিক্ষুদিগকে অন্নদান, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের জন্য আশ্রমনির্ম্মাণ।

ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলি, যখন ভক্ত আসিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হয়, যখন তিনি কোন প্রাণীহিংসার প্রশ্রয় দেন না, তাঁহার প্রতাপে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা সুদূরপরাহত হয়; যখন তিনি ভিক্ষুর ন্যায় সুখদুঃখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তি-সলিলে নিমগ্ন হয়েন। কিন্তু সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলি, যখন তিনি দুঃখ শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া জ্ঞাননেত্রে এই নির্ব্বাণাবস্থা অনুভব করেন ও জানিতে পারেন "আর আমাকে এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।"

বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ তখনি বিনীত ভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি এক বৃহৎ যজ্ঞ করিবার মানসে অনেক পশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সকলকে ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধকে কহিলেন—

"দেখুন, আমি এই সকল জীবকে মুক্ত করিয়া দিলাম,—ইহারা মনের সুখে চরিয়া বেড়াক্—মুক্ত বায়ু ইহাদিগকে ব্যজন করুক।"

এইরূপ কথিত আছে যে, বুদ্ধের উপদেশে রাজা বিম্বিসার তাঁহার রাজ্যে যজ্ঞে পশুহত্যা উঠাইয়া দিয়া প্রচার করিয়া দিলেন "এখন হইতে যজ্ঞে আর পশুবলি হইবে না—পশুদের প্রতি মনুষ্য সদয় হইলে, দেবতারা মনুষ্যের প্রতি সদয় হয়েন।"

পুরোহিতের কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া দিলে পৌরোহিত্য কাজেই চলিয়া যায়—বৌদ্ধ সঙ্ঘেও তাহাই দেখা যায়। গুণ ও বয়সে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রাধান্য ছিল—বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম বয়সে তাহার মধ্যে পৌরোহিত্যের প্রভাব উপলক্ষিত হয় না। সে প্রভাব কেনই বা থাকিবে? যে ধর্ম্মে দেবতার আসন নির্দ্দিষ্ট নাই—শান্তি স্বস্ত্যয়নের বিধান নাই—যে ধর্ম্মে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম ভজন পূজনের কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই—সে ধর্ম্মে পুরোহিত কিসের জন্য? যাগ যজ্ঞের অধীশ্বর, দেব মানবের মধ্যস্থ এরূপ কোন কার্য্যকর্ত্তার কিছুই প্রয়োজন নাই।—বৌদ্ধ মতে প্রত্যেক মনুষ্য নিজ পুণ্যপ্রভাবে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী, প্রত্যেক বৌদ্ধ আপনি আপনার প্রদীপ, আপনি আপন নির্ভর-যষ্টি। প্রত্যেক বৌদ্ধ ভিক্ষু আপনিই আপনার পুরোহিত, আপনিই আপনার যজমান। বুদ্ধদেব মুমুক্ষুমাত্রকেই সংসার ও গৃহ সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্যপথে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু সাধকের মোক্ষলাভ নিজের যত্ন চেষ্টা ও সাধনার উপরেই নির্ভর।

এই নিয়ম যাহা বলা হইল তাহা আদি বৌদ্ধ সমাজে খাটে, কালসহকারে ও স্থানবিশেষে ইহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সিংহল,

চীন, তিব্বত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে সঙ্ঘের আকার প্রকার নিয়ম বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিব্বতী লামাদের মধ্যে ইহা যে অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা আদিম বৌদ্ধধর্মের অনুমোদিত কে বলিবে? আচার্য্য উপাচার্য্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মণ্ডিত পণ্ডিত-পুরোহিত, সমস্বরে ধর্ম্ম সঙ্গীত গান, ধূপ ধুনা ঘণ্টার ঘটা, বৃহৎ মঠ মন্দিরে পট পুত্তলী প্রতিষ্ঠা, শান্তিজল সিঞ্চন, উপোষণ ও গুরু সন্নিধানে আত্মদোষ স্বীকার, পার্গেটরি-সদৃশ নরকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ, সেণ্ট-প্রতিম বোধিসত্ত্ব কল্পনা, পোপের স্থানীয় ধর্ম্মযাজক লামার অধিকার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্ম মূলধর্ম্ম হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে, —বরং আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের সহিত উহার সাতিশয় সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

জাতি বিচার।—

বর্ণাশ্রমের সহিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্পর্ক কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক।

যদিও জাতিভেদ প্রথা উন্মূলিত করিয়া হিন্দু-সমাজ ভাঙ্গিয়া ফেলা বুদ্ধদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, বর্ণবিচার তাঁহার সমাজের পত্তন-ভূমি নহে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ বর্গের ন্যায় নীচ বর্ণের লোকেও ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকারী। বুদ্ধদেব একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন, "হে ভিক্ষুগণ—যেমন গঙ্গা যমুনা মহী অচিরাবতী প্রভৃতি নদনদী, যেমনই হউক না কেন, সাগরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ পুরাতন নাম ধাম হারাইয়া একই সাগর নাম ধারণ করে, তেমনি যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বর্ণ আমার বিধানানুসারে গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন তাহারা পূর্ব্ব বংশ-মর্যাদা পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষু নামেই অভিহিত হয়।" রাজা অজাতশত্রুকে সন্ন্যাসধর্ম্মের উপদেশ প্রদান কালে বুদ্ধ বলিতেছেন —"যদি কোন রাজভৃত্য বা অনুচর গৈরিক বসন পরিধান পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, হে রাজন্, তখন কি তুমি বলিবে এ আমার ভৃত্য—আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে—প্রণতভাবে আমার আজ্ঞাধীন থাকিবে—সকল সময় আমার কথামত চলিবে—আমার সেবা-তৎপর থাকিবে?" রাজা উত্তর করিলেন, "প্রভো! তাহা নহে—আমিই তাঁহার নিকট প্রণত হইব—তাঁহাকে বসিবার আসন দিব—তাঁহাকে অন্ন বস্ত্র ঔষধ পথ্য যখন যাহা আবশ্যক তাহা দান করিব—তাঁহার সকল অভাব মোচন করিয়া, যাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকেন তাহার উপায় বিধান করিব।"

বুদ্ধ-শিষ্যের গৈরিক বসনে রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই একীভূত। একমাত্র উচ্চবর্ণের লোকে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী, তাহা নহে - সুর নর, উচ্চ নীচ সকলেরই কল্যাণ উদ্দেশে এই ধর্ম্ম প্রচারিত।

বুদ্ধের প্রথম শিষ্যদলের মধ্যে আমরা রাজনাপিত উপালীর নাম দেখিতে পাই। হীন অস্পৃশ্য জাতি হইতেও যে তাঁহার সঙ্ঘ পুষ্টিলাভ করিত, এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। থেরাগাথায় সুনীত নিজ কাহিনী যাহা বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন—

'নীচকুলে আমার জন্ম, আমি দীন দরিদ্র অজ্ঞান ছিলাম, মন্দিরের শুষ্ক ফুল ঝাঁট দিয়া মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখা—এই আমার কাজ। লোকে আমায় হেয়জ্ঞান করিত, আমি বড়লোকের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইতাম। ভগবান বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যগণসহ মগধের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার দর্শন লাভ মানসে আমার মাথার বোঝা ফেলিয়া দিয়া ধাবিত হইলাম। আমায় দেখিয়া তিনি কৃপালু হইয়া ক্ষণেকের তরে দাঁড়াইলেন। রাজাধিরাজতুল্য কোথায় সেই ভগবান বুদ্ধ, আর কোথায় আমার মত এই দীনহীন অকিঞ্চন! আমার আবেদন শুনিবার জন্য থামিলেন। আমি প্রভুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলাম—প্রভো! এই অধীনকে আপনার ভিক্ষু-দলে গ্রহণ করুন। তখন পরম কৃপালু ভগবান বুদ্ধ কহিলেন—হে ভিক্ষু, এস—আমার সঙ্গে চল। এই আমার একমাত্র দীক্ষা।" পরে সুনীত কহিতেছেন, "আমি অরণ্যে গিয়া ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত রহিলাম, এবং মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তখন দেবতারাও আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। বুদ্ধদেব আমাকে দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "সদাচার শুদ্ধাচার পুণ্যবলে হীনবর্ণও ব্রাহ্মণ হয়—ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃত লক্ষণ তাহাই।" জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ হয় না কর্ম্মগুণেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায়—বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধদেব মাতঙ্গের গল্পে বলিয়াছেন—"মাতঙ্গ চণ্ডাল নিজ কর্ম্মগুণে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জন্মিয়াই কেহ চণ্ডাল হয় না—জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ হয় না—নিজ কর্ম্মগুণেই ব্রাহ্মণ—নিজ কর্ম্মদোষেই চণ্ডাল।" (সূত্ত নিপাত)। "তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি সত্য, প্রেম, ক্ষমা, দয়া অভ্যাস করেন—যিনি সংযমী ও জিতেন্দ্রিয়, অজ্ঞান ও পাপ-কলঙ্ক হইতে বিনির্ম্মুক্ত।" (ধর্ম্মপদ)। কিন্তু ইহা হইতে মনে করিবেন না যে, বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথা উন্মূলন করিয়া সমাজ সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন। সমাজের মধ্যে যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা, হীনবর্ণকে উন্নত

করিবার চেষ্টা, অথবা সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার সংশোধন চেষ্টা, ইহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সমাজ সংস্কার তাঁহার ধর্মপ্রচারের অঙ্গীভূত ছিল না। রাজ্য ও সমাজ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ভিক্ষু যিনি সমাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তিনি আপনার সঙ্ঘ-নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলেই হইল। ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের অন্যান্য নিয়ম রক্ষায় ভিক্ষুরা হস্তক্ষেপ করিতেন না—তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে, বৈদিক আচার ক্রিয়া কাণ্ড বুদ্ধদেব ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইতে দেন নাই। বিদ্যার আকর বলিয়া তাঁহার নিকট বেদের কোন মাহাত্ম্য ছিল না; তিনি নিজে প্রবুদ্ধ হইয়া যে মহাসত্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বেদেরও অনধিগম্য, বেদবাক্য হইতেও উচ্চতর। সে সত্য বিশ্বজনীন, দেশবিশেষে অথবা জাতিবিশেষে বদ্ধ নহে। তিনি সেই সত্য, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ সকলেরই মধ্যে প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন, তাঁহার সঙ্ঘের দ্বারও সকলেরই জন্য উন্মুক্ত হইল।

জাতিভেদ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মতামত সমালোচনা করিয়া, Rhys-Davids তাঁহার অম্বষ্ঠ সূত্রে (Dialogues of the Buddha গ্রন্থে) যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভূমিকার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

বুদ্ধের সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রথম গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হয়। আমরা দেখিতে পাই, সেকালে জনসঙ্ঘ সাধারণতঃ চার ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এই প্রভেদের সীমা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট ছিল না। এক প্রান্তে সমাজবহির্ভূত অস্পৃশ্য অনার্য্যগণ—অপর প্রান্তে ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত জনপদ। এই ব্রাহ্মণগণের পৌরোহিত্য ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ও ছিল। শৌচাশৌচের নিয়ম রক্ষা করিয়া সামাজিক বিধিসকল গঠিত হইয়াছিল। সভ্যতার সমান অবস্থায় এই একই বিধান অন্যান্য দেশেও প্রচলিত দেখা যায়। ব্রাহ্মণগণের আধিপত্যস্বরূপ ভারতের সমাজ-মণ্ডপের যে বিশিষ্ট স্তম্ভ, তখনও তাহার সুদৃঢ় স্থাপনা হয় নাই। অধুনা জাতিভেদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তখনও তাহার অস্তিত্ব ছিল না। এই সামাজিক অবস্থার মাঝে বুদ্ধ স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার দুইটি ভাগ আমরা দেখিতে পাই—সঙ্ঘের ভিতরে ও বাহিরে তাঁহার বিভিন্ন কার্য্যপ্রণালী; কিন্তু আসলে এই উভয়ের কোন বিরোধ ছিল না—উভয় ক্ষেত্রে একই মনোভাবের উদ্দীপনা অনুভূত হয়।

প্রথমতঃ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন ধর্ম্মসঙ্ঘে তিনি জাতিভেদের কোনরূপ প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি জন্মগত, কর্ম্মগত, পদগৌরব কিংবা অগৌরবমূলক

জাতিভেদের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করিতেন না। যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান, শৌচাশৌচ-ঘটিত যে প্রভেদ ও হীনতার সৃষ্টি হয়, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, হীন নাপিতজাতীয় উপালী তাঁহার সঙ্ঘের একজন সম্মানিত সভ্য ছিলেন, গৌতমের পরেই সঙ্ঘের নিয়মাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের প্রাধান্য দেখা যায়। থেরাগাথায় যে সুনীতের পদাবলী উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে, তিনিও অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত ছিলেন। বৌদ্ধসঙ্ঘে এইরূপ হীনজাতীয় লোকদের প্রবেশাধিকার ছিল, তাহার বহুতর উদাহরণ দেখিতে পাই। কেবলমাত্র এক' বিষয়ে দেখিতে পাই, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং এই বিরোধের সম্যক্ কারণও ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি দাসজাতীয় লোকদিগকে দলভুক্ত করিতে সম্মত হইতেন না। বৌদ্ধ-সঙ্ঘের একটি বিশেষ নিয়ম ছিল যে, পলাতক দাসকে সঙ্ঘভুক্ত করা হইবে না। দীক্ষাকালে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে দীক্ষার্থীকে আত্ম-পরিচয় জানাইতে হইত যে, সে ক্রীতদাস নহে। যখনই কোন দাসকে সঙ্ঘভুক্ত করা হইত, তখনই সে যে প্রভুর সম্মতিক্রমে কিম্বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া এই দীক্ষা গ্রহণ করিল, তাহা বিশেষভাবে জানাইতে হইত।

দ্বিতীয়তঃ—সঙ্ঘের বাহিরে সাধারণ সমাজে, জাতিভেদ সম্বন্ধে কুসংস্কারসকল তিনি ধীমান ব্যক্তির ন্যায় যুক্তিযুক্ত উপদেশ ও সম্যক বিচারবুদ্ধির দ্বারা দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইতেন। সুত্ত নিপাতের কোন কোন সুত্তে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—যথা, জাতিবিশেষের সহিত একত্র পানভোজন কিম্বা তাহাদের স্পৃষ্ট অথবা পক্ক আহার্য্য গ্রহণে পাপ স্পর্শে না,—কুচিন্তা, কুবাক্য, এবং কুকর্ম্মের দ্বারাই লোকে পাপভাগী হয়। বুদ্ধ-পূর্ব্ব শাস্ত্রেও এই নীতির অভাব নাই, কিন্তু সাধারণতঃ জাতিভেদ সম্বন্ধে মতামত তাঁহার নিজস্ব, তাহা আর অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিসকল তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ—বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, এবং ঐতিহাসিক। সুত্ত নিপাতের বশিষ্ঠ সুত্তে (যাহার কতকগুলি শ্লোক ধর্ম্মপদে স্থান লাভ করিয়াছে) প্রশ্ন এই যে, মানুষ কিসে ব্রাহ্মণ পদবীর যোগ্য হয়? উত্তরে, বুদ্ধ প্রশ্নকারককে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ লক্ষণবিশেষের দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে; কেবলমাত্র মনুষ্যই এই

বিশেষত্ববর্জ্জিত। আধুনিক বিজ্ঞানও তাঁহার এই মতের সমর্থন করে। অন্যান্য স্থত্তেও তিনি এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, মধুর স্থত্তে, কাত্যায়ন এবং মধুর রাজ, এই উভয়ের প্রশ্নোত্তর কথোপকথন আছে। মধুর রাজ বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাঁহারা সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একমাত্র ব্রাহ্মণগণই সাদা অন্য সকলেই কালা, তাঁহারাই শুদ্ধ, অপর সকল জাতিই অপরিশুদ্ধ, ব্রাহ্মণেরা স্থষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার গৌরবের উত্তরাধিকারী এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?" উত্তরে কাত্যায়ন বলিলেন, সাধারণ জীবন-ক্ষেত্রে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি সকল বর্ণের দ্বারাই সম্মানিত; এক্ষেত্রে 'দ্বিজ' কোন বিশেষ গৌরব প্রাপ্ত হয়েন না।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ণ নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেই সদসৎকর্ম্ম অনুসারে উচ্চ নীচ জন্ম গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ—চৌর দস্যু প্রভৃতি অপরাধীগণ যে-কোন বর্ণেরই হোক না কেন, দুষ্কৃতির জন্য যোগ্য শাস্তি ভোগ করে। পরিশেষে ধর্ম্ম সঙ্ঘভুক্ত যে কোন বর্ণেরই সাধু কি সন্ন্যাসী হউন না কেন, সাধারণের নিকট হইতে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

এই জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব স্বীয় মতামত যাহা ব্যক্ত করিতেন তাহা জনসাধারণে গৃহীত হইয়া সফলপ্রায় হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাঁহার সেই মত ভারতবাসীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত, তাহা হইলে ভারতের সমাজ-নীতি পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই, এবং এই দেশের আধুনিক জাতিভেদ-প্রথা আর মাথা তুলিতে পারিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সঙ্ঘের নিয়মাবলী।

প্রবেশ।—

বৌদ্ধ সঙ্ঘের অবারিতদ্বার, যাহার ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারে, প্রথম প্রথম প্রবেশ নিয়মের কঠোরতা ছিল না। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় যে-সকল শিষ্য ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইত, তাহাদের পরীক্ষার কাল সামান্যতঃ ৪ মাস নিরূপিত ছিল, কিন্তু যোগ্য পাত্র হইলে সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, বুদ্ধ যখন মল্লদের শালবনে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, সেই সময় সুভদ্র নামক একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ সাধু পুরুষের নিকট শুনিয়াছি তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব জগতে দুর্লভ, তিনিই এইক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন। আজ রাত্রে না কি শ্রমণ গৌতম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। আমার মনে নানা সংশয় আসিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, একমাত্র শ্রমণ গৌতম সেই সকল সন্দেহ দূর করিতে সক্ষম। আমি তাঁহার দর্শন লাভের আশায় আসিয়াছি—তাঁহার কি দর্শন পাইব?"

আনন্দ কহিলেন—"এখন থাক্—আর না—তথাগতকে আর বিরক্ত করিও না। তিনি এখন পীড়িত।"

এই কথোপকথন ভগবান বুদ্ধ তাঁহার রোগশয্যায় শুনিতে পাইয়া আনন্দকে ডাকিয়া কহিলেন—"আনন্দ! সুভদ্রকে আসিতে দেও। তিনি জ্ঞানলাভ মানসে আসিয়াছেন, আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য নয়। তিনি যাহা শুনিতে চান আমি সাধ্যমত উত্তর দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব, তাঁহাকে আসিতে বারণ করিও না।"

তাঁহার অনুমতিক্রমে সুভদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুভদ্র প্রথমে ষট্‌তীর্থকরের* প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন!

*পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বল, ককুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্র, নিগ্রর্ন্থ নাথপুত্র, বুদ্ধের সময় এই ছয়জন উপাধ্যায়ের নাম শুনা যায়। ইঁহারা ষট্‌তীর্থকর বলিয়া পরিচিত।

এই ধর্ম্মোপদেশকদের উপদেশ শ্রেয়স্কর কি না? তাঁহারা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কি না?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—ঐ সকল তীর্থকরের অভিজ্ঞতা কিরূপ, তাহা বিচার করিয়া কোন ফল নাই। আমি তোমাকে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে সুভদ্র, যে ধর্ম্মে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, কর্ম্মান্ত, আজীব প্রভৃতি অষ্ট আর্য্যমার্গের উপদেশ নাই, সে ধর্ম্ম নিরর্থক; যে ধর্ম্মে অষ্ট মহামার্গের উপদেশ আছে, তাহাই শিক্ষণীয়। হে সুভদ্র, আমি ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, তদনন্তর ধর্ম্মের অন্বেষণে ৫১ বৎসর প্রজ্ঞা ও সমাধির অনুষ্ঠান করিয়াছি। যাহারা আমার আচরিত ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয় নাই, তাহারা শ্রমণ হইবার যোগ্য নহে।—এইরূপে তিনি সুভদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া সদ্ধর্ম্ম কি তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সুভদ্র কহিল "আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে আমি ধন্য হইলাম, যাহা গুহ্য ছিল তাহা মুক্ত হইল, যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা গড়িয়া তুলিলেন। বিপথগামীকে আপনি সরল পথ প্রদর্শন করিলেন। আমার সমক্ষে সত্যধর্ম্ম প্রকাশিত

জনসমাজে ইঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল। ইঁহাদের প্রত্যেকের বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল। সারীপুত্র ও মুদ্‌গলায়ণ—বুদ্ধের যে দুই প্রধান শিষ্য—তাঁহাদের আদি গুরু সঞ্জয়। ইঁহারা ছয়জন বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, এবং বুদ্ধদেবকে অপদস্থ করিবার বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

প্রথমে তাঁহারা রাজা বিম্বিসারের নিকট গিয়া বুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সেখানে বিফলমনোরথ হইয়া কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট গমন করেন, এবং তাঁহাকে নানা যাদুকরী কৌশল দেখাইয়া চমকিত করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রভাবে তাঁহাদের ছলবল সকলি ব্যর্থ হয়। বুদ্ধদেব যখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রাবস্তী বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই তীর্থিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র করেন। তাঁহারা একদিন চিঞ্চানামক এক রমণীকে কুমন্ত্রণা দিয়া বুদ্ধের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহার দুই তিন মাস পরে প্রচার করেন যে চিঞ্চা গর্ভবতী হইয়াছে, এবং বুদ্ধই এই গর্ভের কারণ। ক্রমে তীর্থিকদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং এই অপবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। অবশেষে তাঁহারা অগত্যা হার মানিয়া নিতান্ত দীনভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন। প্রবাদ এই যে, তাঁহাদের অগ্রণী পূরণকাশ্যপ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন।

করিলেন, অদ্য হইতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইতেছি—প্রভু, আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।

বুদ্ধ কহিলেন "যে কোন ব্যক্তি আমার এই ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করে, সাধারণ নিয়মানুসারে তাহার পরীক্ষার কাল চার মাস। কিন্তু তোমাকে অব্যাহতি দিলাম—তুমি এখন হইতে সঙ্ঘভুক্ত হইলে। এই বলিয়া আনন্দকে ঐরূপ আদেশ করিলেন। আনন্দ সুভদ্রের মস্তকমুণ্ডন ও তাঁহাকে বসনত্রয় পরিধান করাইয়া এবং ত্রিশরণ মন্ত্র দিয়া শিষ্যদলে গ্রহণ করিলেন; পরে তিনি আসিয়া ভগবান বুদ্ধের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। সুভদ্র বৌদ্ধ ভিক্ষুকরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, এবং সাধনার গুণে কালক্রমে তিনি অর্হৎ পদে উন্নীত হইলেন। ইনিই বুদ্ধের স্বহস্ত-দীক্ষিত শেষ শিষ্য। (মহাপরি-নির্ব্বাণ সূত্র)

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বুদ্ধের সময় দীক্ষা বিধির কোন আড়ম্বর-ময় অনুষ্ঠান ছিল না। কালক্রমে প্রবেশিকার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। যাহারা কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী, কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত, রাজ ভৃত্য বা সৈনিক পদধারী, তাহাদের প্রবেশ নিষেধ। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক পিতামাতার সম্মতি ব্যতীত সঙ্ঘে প্রবেশের অনধিকারী, বারো বৎসরের নীচে কেহ প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে পারিবে না—২০ বৎসরের কমে ভিক্ষুর পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইবে না। সঙ্ঘের দুই সোপান—প্রথম, প্রব্রজ্যা—দ্বিতীয়, উপসম্পদা। কোন গৃহস্থ ভিক্ষু-সঙ্ঘভুক্ত হইবার প্রার্থী হইলে নিয়মিত দিবসে দশ অথবা দশাধিক ভিক্ষু একত্রিত হন। প্রার্থীকে একজন ভিক্ষু সভ্যস্থলে আনয়ন করিলে পর তিনি স্থবিরদিগকে প্রণাম করিয়া যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা দিয়া উপবিষ্ট হয়েন। তৎপরে তিনবার সঙ্ঘে নিবেদন করেন "আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দীক্ষাদান করুন, যাহাতে আমি দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া নির্বৃত্তি লাভের অধিকারী হইতে পারি।" সঙ্ঘপতি তাহার স্কন্ধে ভিক্ষুর বসনত্রয়ের পাঁঠরী ঝুলাইয়া দেন। প্রার্থী বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক সন্ন্যাসীবেশে সমাগত হইয়া তিনবার মন্ত্রদ্বয় পাঠ করেন :—

প্রথম—ত্রিশরণ মন্ত্র (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ইত্যাদি); দ্বিতীয়—দশশীল মন্ত্র, যথা—

১। জীবহত্যা, ২। অপহরণ, ৩। ব্যভিচার, ৪। মিথ্যাকথন, ৫। সুরাপান, এই পঞ্চপাপ হইতে নিবৃত্তি—সাধারণ নিষেধ।

৬। অকাল ভোজন, ৭। নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্তি, ৮। গন্ধমাল্য প্রভৃতি

সেবন ৯। আরাম শয্যায় শয়ন, ১০। সোনারূপা গ্রহণ, এই পঞ্চব্যসন হইতে নিবৃত্তি —ভিক্ষুদিগের প্রতি বিশেষ বিধান।

পরিবাসোত্তীর্ণ যুবকের সঙ্ঘে পূর্ণ প্রবেশ কালে স্বতন্ত্র দীক্ষা বিধি অনুষ্ঠিত হয়; তাহার নাম উপসম্পদা। ভিক্ষু যুবক সঙ্ঘ সমীপে উপনীত হইয়া স্থবিরদের মধ্য হইতে একজন উপাধ্যায় বাছিয়া লন। পরে ভিক্ষাপাত্র তাহার স্কন্ধে সংলগ্ন হয়। তৎপরে উপাধ্যায়ের নাম কি? তিনি ভিক্ষাপাত্র ও বসনত্রয় পাইয়াছেন কি না? তিনি কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত কি না? তাঁহার বয়স কত? তিনি স্বাধীন কিনা? দীক্ষায় তাঁহার অভিভাবকের সম্মতি আছে কিনা? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইলে পরীক্ষার ফলাফল সঙ্ঘে জানান হয়। পরে যুবক দীক্ষার জন্য তিনবার প্রার্থনা করেন, কাহারও কোন আপত্তি না থাকিলে সঙ্ঘভুক্ত হন। সঙ্ঘের নিয়মাবলী পঠিত হইবার পর তিনি বৈধরূপে গৃহীত হন। দীক্ষার পর আচার্য্যের নিকট ৫ বৎসর অধ্যয়নের নিয়ম আছে। দীক্ষিত বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর নাম ভিক্ষু অথবা শ্রমণ, ইহাদের ব্রত সংযম এবং দারিদ্র্য।

দীক্ষা বিধি সমাপ্ত হইলে দীক্ষিতের কর্ত্তব্যগুলি আচার্য্য উপদেশ করেন—

আহার, ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করা যায়।

পরিচ্ছদ, স্বহস্ত স্যূত চীরপুঞ্জ।

বাসস্থান, অরণ্যের বৃক্ষতল।

ঔষধ, গোমূত্র।

চতুরনুশাসন—

ব্যভিচার করিবেক না।

চুরি করিবেক না।

জীব হত্যা করিবেক না।

আপনাতে দৈবশক্তি আরোপ করিবেক না।

এই শেষ অনুশাসনটী জারী হইবার বোধহয় বিশেষ কারণ ছিল, কেন না বিনয় পিটকে দেখা যায়, এক সময়ে বৃজী প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তাহাতে একদল ভিক্ষু মহা কষ্টে পড়ে। কেহ কেহ গৃহস্থ ঘরে চাকুরি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবার প্রস্তাব করিলেন; এক জন ধূর্ত্ত ভিক্ষু এক ফন্দী বাহির করিল,—এস আমরা সিদ্ধ যোগী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া পরস্পরকে খুব বাড়াইয়া তুলি,—'এই ভিক্ষু মহা সাধু,' 'ইনি ত্রিবিদ্যা কণ্ঠস্থ

করিয়াছেন,' 'ইনি সিদ্ধ যোগী'। তাঁহার মতলব সিদ্ধ হইল। গৃহস্থেরা বলিল, এই সকল মহাপুরুষেরা আমাদের মধ্যে বর্ষা যাপন করিতে আসিয়াছেন, আমাদের পরম ভাগ্য বলিতে হইবে। তাহাদের দানও সেই পরিমাণে ফাঁপিয়া উঠিল, ভিক্ষুরা খাইয়া পরিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল। এইরূপ ভণ্ডামি নিবারণের জন্য চতুর্থ অনুশাসনটী উপদেশের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে।

সঙ্ঘদলে যেমন প্রবেশ সহজ, সঙ্ঘ হইতে নির্গমনও তেমনি সহজ। চৌর্য্য খুন প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ভিক্ষু বহিষ্কার দণ্ডযোগ্য—তাহা ছাড়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঙ্ঘ ছাড়িয়া যাইবার কোন বাধা নাই। যিনি বলিবেন পিতা মাতার জন্য আমার ভাবনা হইতেছে, স্ত্রী পুত্রের জন্য আমার ভাবনা হইতেছে, আমার পূর্ব্বপ্রকার জীবনের জন্য ভাবনা হইতেছে, তিনি সঙ্ঘ ছাড়িয়া সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারেন। হয় একাকী কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, কিম্বা একজন ভিক্ষুকে সাক্ষী মানিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন,—কেহ তাঁহাকে বারণ করিবে না। সঙ্ঘের প্রবেশ দ্বার যেমন মুক্ত, নির্গমনের পথও তেমনি সোজা—কোন দিকে কোন কণ্টক নাই।

ভিক্ষুদের আহার পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি নিয়ম আছে, সে সমস্ত দেখিতে যত কঠোর কার্য্যতঃ তত নয়; অনেক বিষয়ে শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, বাঁধাবাঁধির মধ্যেও কতকটা স্বাধীনতা আছে।

আহার।

ভিক্ষুরা একাহারী; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা পর্য্যটন পূর্ব্বক আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে একস্থানে একত্রে ভোজন করা ইহাদের নিয়ম। ভিক্ষার সময় কোন কথা কহিবেক না। যদি কেহ ভিক্ষা দান করে, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্য দ্বারে গমন করিবে; কিছু না পাইলেও মৌনভাবে পরদ্বারে চলিয়া যাইবে। অনেক সময়, বিশেষতঃ পূর্ণিমার দিনে, গৃহস্থ ব্যক্তি ভিক্ষুদিগকে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত, ভিক্ষুমঠে আহার পাঠাইয়া দিবারও রীতি ছিল।

পরিচ্ছদ।

স্বহস্ত-স্যূত চীরপুঞ্জ পরিধান করা নিয়ম, কিন্তু কেহ বস্ত্র দান করিলে তাহা গ্রহণ করা নিষেধ নহে। গৈরিক বসনত্রয় ভিক্ষুকের পরিধেয়,—অন্তর-বাসক, মধ্য-বসন, আর উত্তরীয়। 'কসায়' (পাপ) হইতে বিমুক্ত না হইলে 'কাষায়'

অর্থাৎ গেরুয়া বসনের যোগ্য হয় না। এতদ্ভিন্ন কোন বেশভূষা ব্যবহারের বিধান নাই। মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন ভিক্ষুদলের সন্ন্যাস ব্রতে বাহ্য লক্ষণ।

বাসস্থান।

বুদ্ধ মনে করিতেন যে, নির্জ্জন বনবাস আত্ম-সংযম শিক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন, কিন্তু বিজন বাস করিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম প্রচারিত হয় নাই। ভিক্ষুকদের দলবদ্ধ হইয়া থাকিবারই রীতি ছিল। তাহারা উদ্যানে, বনে, গ্রাম ও নগরের প্রান্তে, যেখানে মন যায় দলে দলে বাস করিত; ক্রমে তাহাদের জন্য মঠ বিহার প্রভৃতি বাসগৃহ প্রস্তুত হইল। গ্রীষ্ম ও শীতের সময় দেশ ভ্রমণ, বর্ষার ৩ মাস একস্থানে স্থির হইয়া বসা,—এই তাহাদের নিয়ম। কিন্তু অরণ্যই যাহাদের প্রশস্ত বাসস্থান, তাহারাই ভারতে গৃহনির্ম্মাণ-কৌশলের সূত্রপাত করিয়া যায়। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে স্তূপ চৈত্য বিহারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা তাহাদেরই হস্ত-রচনা। গিরি খুদিয়া গুহাশ্রম নির্ম্মাণ করায় যে কি বিপুল পরিশ্রমের ব্যয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। এই সকল গিরিমন্দির কোন কোনটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দে বিরচিত। এইরূপ নির্ম্মাণের উৎকৃষ্ট নমুনা পুণা সমীপস্থ কার্লীগুহা খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে রচিত হয়। হিন্দুদের দেবদেবীমন্দির সে দিনকার রচনা—যেন বৌদ্ধমন্দিরের দেখাদেখি তাহাদের সূত্রপাত মনে হয়; আর যে বৌদ্ধধর্ম্ম কঠোর জ্ঞান ও নীতির ধর্ম্ম, যাহাতে ভজন পূজনের বিধিব্যবস্থা কিছুই নাই, ক্রিয়াকাণ্ডের কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই, আশ্চর্য্য যে তাহার সেবকেরাই প্রকাণ্ড শিলাস্তম্ভ স্তূপ চৈত্য বিহার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের হস্তচিহ্নসকল নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বিহার ও চৈত্য ব্যতীত বৌদ্ধেরা তাহাদের তীর্থক্ষেত্রে বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘণ্টাকৃতি স্তূপসমূহ নির্ম্মাণ করিত, কোন কোন স্তূপ আশ্চর্য্য কারুকার্য্যময় রেলিং বেষ্টিত; এই সকল স্তূপের মধ্যে ভূপালের অন্তর্গত ভিল্‌সা স্তূপ সুপ্রসিদ্ধ। কাশীযাত্রীগণ সারনাথ ক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছেন; তাঁহারা সেখানকার স্তূপও দেখিয়া থাকিবেন, তাহা সেই ক্ষেত্র স্মরণ করাইয়া দেয় যেখানে গৌতম তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। এতদ্ভিন্ন গিরিগুহা-নিহিত চৈত্য বিহার প্রভৃতি কোথায় না প্রক্ষিপ্ত? সপ্তপর্ণী,—যেখানে প্রথম বৌদ্ধ-সভার অধিবেশন হয়,—নাসিকের লেনা, কার্লী, অজন্তা, সাল্‌সেট্ দ্বীপস্থিত কাহ্নেরীর গুহামন্দির, ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরি উদয়গিরির গুহাশ্রম, এই সমস্ত চিরস্মরণীয় বৌদ্ধকীর্ত্তি ভারতে প্রকীর্ণ দেখা যায়।

দারিদ্র্য ব্রত।—

দারিদ্র্য ও সংযম, বৌদ্ধমণ্ডলীর এই দুই মহাব্রত। সোনা রূপা গ্রহণ করা তাহাদের একেবারেই বারণ,—যদি কোন গৃহস্থ দান করেন, ভিক্ষু তাহা নিজের জন্য রাখিতে পারিবেন না। হয় তাহা দাতাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, কিম্বা অন্য কোন গৃহস্থের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে, যিনি তাহার বিনিময়ে ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল দান করিলে, তাহা অপর ভিক্ষুদের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে, নিজের জন্য নয়। সোনা রূপার ব্যবহার লইয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে ভিক্ষুদলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, এবং বৈশালী সভায় এই বিষয় আন্দোলন হয়। যে সকল ভিক্ষু এই নিয়ম পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, অবশেষে তাহাদেরই পরাভব হইল, এবং অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নিবৃত্তি ব্যবস্থা ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। ইহা ছাড়া ভূমি দান দাসী রাখা, অথবা অশ্ব গো মেষাদি পশু পালন করা ভিক্ষুদের নিষেধ। চাষবাস কৃষিকার্য্যও নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। এক কথায়, ভিক্ষুর পক্ষে দারিদ্র্য ব্রত প্রাণপণে পালন করা বিধেয়। তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি সব মিলিয়া অষ্টবিধ—বসনত্রয়, কটিবন্ধ, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সূচি, জীবহত্যা নিবারণোপযোগী জল ছাঁকিবার বাসন। যদিও প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য এই ব্যবস্থা, তথাপি ভিক্ষুসঙ্ঘের কথা স্বতন্ত্র। গ্রন্থ প্রভৃতি অস্থাবর বস্তু ছাড়িয়া দেও, ভূমি বিহার প্রভৃতি অস্থাবর বস্তু ছাড়িয়া দেও, ভূমি বিহার প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি, সঙ্ঘ তাহারও অধিকারী ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং সঙ্ঘের জন্য এই সমস্ত উপহার গ্রহণ করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রত্যেককে যতই নির্ধন হউক না কেন, অনেকানেক বৌদ্ধ-ক্ষেত্র রাজা ও শ্রীমন্ত গৃহস্থের প্রসাদে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিল সন্দেহ নাই; ইউরোপের মধ্যযুগের খৃষ্টীয় দেবালয় অপেক্ষা তাহাদের ধনসম্পত্তি অল্প ছিল না।

পূজা।—

আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধধর্ম নীতিপ্রধান ধর্ম, তাহাতে বৈদিক হোম যাগ ক্রিয়াকলাপ নাই—যজ্ঞে পশুবলি তাহার অহিংসাধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। ব্রাহ্মণ্যের ভজন পূজনের বিধিব্যবস্থাও তাহাতে নাই। বৌদ্ধদের দেবপূজার পাত্র ও প্রণালী স্বতন্ত্র, এবং দেবালয় প্রভৃতি পূজার উপকরণও নাই। ধর্ম্ম সাধনের জন্য আশ্রম চাই, তাই দেবমন্দিরের বদলে বৌদ্ধ-ক্ষেত্র সাধকমণ্ডলীর বাসোপযোগী চৈত্য বিহারে সমাকীর্ণ। তবে কি বৌদ্ধশাস্ত্রে পূজার নিয়ম আদতেই নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমরা যাহাকে

সহজ ভাষায় পূজা বলি—কোন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া স্তব স্তুতি প্রার্থনা—এরূপ সাধনা আদি বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গ নহে। বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশে দেবারাধনার কোন বিধান নাই, এমন কি, বুদ্ধদেব স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে—হে ইন্দ্র হে সোম, হে বরুণ, এইরূপ প্রার্থনার কোন ফল নাই। বৌদ্ধ জগতে স্বয়ং বুদ্ধদেব দেবতার আসনে আসীন ছিলেন। তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া ভক্তেরা তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিত এবং তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর কালক্রমে বুদ্ধই দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বুদ্ধ ছাড়া বোধিসত্ত্ব কল্পনা বৌদ্ধদের মধ্যে কিরূপে উদয় হইল, তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। এইক্ষণে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দু দেবদেবীর আর বৌদ্ধ দেবতা, ইহাদের মধ্যে এক বিষয়ে পার্থক্য আছে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে রামকৃষ্ণাদি দেবগণ মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন; বৌদ্ধ মতে মনুষ্যগণ সাধনাগুণে অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ এইরূপে উত্তরোত্তর দেবত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধদের মধ্যে আমাদের মত দেবপূজার ব্যবস্থা নাই—ব্রাহ্মণ্যের দেবতার স্থানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত—তাঁহাদের লইয়াই বৌদ্ধদের পূজার্চ্চনা।—এই সকল মধ্যে দেবতার মধ্যে বুদ্ধদেবের সর্ব্বোচ্চ আসন—ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বুদ্ধের অর্চ্চনা—তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষণ—তীর্থ দর্শন—তাহা ছাড়া তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্ম পালন—এই সমস্তই পূজার সাধন।

ভাবনা ধ্যান সমাধি।—

অন্যান্য ধর্ম্মে যেমন দেবারাধনা, স্তুতি প্রার্থনা, ভজন পূজনের ব্যবস্থা আছে, বৌদ্ধদের সেইরূপ ভাবনা ধ্যান ও সমাধি। বিষয় বাসনা হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বিরলে পঞ্চ ভাবনা সাধন করিতে হয়।—মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষা, ভাবনা এই পাঁচ প্রকার।

মৈত্রী—কি দেবতা কি মনুষ্য সকল জীবই সুখী হউক, শত্রুরও কল্যাণ হউক, সকলেই রোগ শোক পাপ তাপ হইতে মুক্ত হউক, এইরূপ শুভ চিন্তাকে মৈত্রী ভাবনা বলে।

করুণা—দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করা, জীবের কিসে দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন হয়, অহরহ এইরূপ চিন্তা করা করুণা ভাবনা।

মুদিত—ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া, তাহাদের সুখ সৌভাগ্য স্থায়ী হউক, এই চিন্তা মুদিত ভাবনা।

অশুভ—শরীর ব্যাধিমন্দির, তড়িৎসম ক্ষণস্থায়ী, মরীচিকার ন্যায় অসত্য,

এবং মূত্রপূরিষে, পরিপূর্ণ ঘৃণিত বস্তু, মানবজীবন জন্মমৃত্যুর অধীন, দুঃখময় ও ক্ষণভঙ্গুর, এইরূপ ভাবনাকে অশুভ ভাবনা বলে।

উপেক্ষা—সকল জীবই সমান, কোন প্রাণী অপর প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার আস্পদ নয়; বল দুর্ব্বলতা, দ্বেষ মমতা, ধন দারিদ্র্য, যশ অপযশ, জরা যৌবন, সুন্দর অসুন্দর, সকল গুণ, সকল অবস্থাই সমান—এই সাম্য ভাবনা উপেক্ষা ভাবনা বলিয়া অভিহিত হয়।

ভিক্ষুগণ প্রাতঃসন্ধ্যা বিরলে বসিয়া এই পঞ্চ ভাবনা অভ্যাস করিতেন।

ধ্যান।—

বৌদ্ধমতে ধ্যান পরম পদার্থ। জীবনের মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ধ্যান ও সমাধি দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন একান্ত আবশ্যক। যে সকল বিষয় চিত্তকে সেই মহান লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করে, সেই সমস্ত দূর করিতে হইবে—"তত্রতত্রাভিনন্দিনী" চিত্তবৃত্তি, অর্থাৎ প্রজাপতির ন্যায় ফুল হইতে ফুলে রমণ করিতে চায় এমন যে চপলা প্রবৃত্তি, তাহা বশীকৃত করিয়া বিষয়াসক্তি হইতে বিরত হইতে হইবে; এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে নির্জ্জন ধ্যানানন্দ উপভোগ করা ধ্যানের প্রথম সোপান। ধ্যানের এইরূপ উত্তরোত্তর চারিটী সোপান আছে। উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপে উঠিতে হইলে চিত্তকে অধিকতর সংযত করিয়া যে বিষয়টী ভাবিতেছ তাহার সহিত একান্ত তন্ময় হইয়া যাওয়া আবশ্যক। ধর অরূপলোকের ধ্যান করিতেছ—রূপলোকের সমুদায় কল্পনা মন হইতে দূর হইবে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর অলৌকিক ভাব ও অবস্থায় চিত্তের তন্ময়তা সাধন করিতে হইবে, যেন তুমি এ পৃথিবীর জীব নও, অরূপলোকে বাস করিতেছ। বৌদ্ধমতে কঠিন যোগ সাধনা দ্বারা কোন কোন যোগী এই প্রকার অলৌকিক শক্তি-বাহিনী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ধ্যানবলে ধ্যানের বিষয়ের সহিত যে পরিমাণে তন্ময়ীভাব হইবে, সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভ। ধ্যানের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা সেই, যাহাতে জীব সুখ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শাশ্বত শান্তিরসে নিমগ্ন হয়েন—যে অবস্থায় ভাবজ্ঞানও নাই, অভাব জ্ঞানও নাই, কেবল স্মরণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, চিত্ত শান্তিসাগরে মগ্ন হয়। এই মহা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

সমাধি।—

বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মার একাগ্রতা সাধনের নাম সমাধি। পঞ্চভূত অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, একাগ্রচিত্ত হইয়া এই সমস্ত অনিত্য ভাবাদি

পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে। করিতে করিতে সেই ভাব মনোমধ্যে নিতান্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। সমাধি ইহার উত্তরীয় অবস্থা। গৌতমবুদ্ধ যে সমগ্র চারি প্রকার ধ্যানের অনুষ্ঠান করেন, তাহার দ্বিতীয় ধ্যানটী সমাধিজাত বলিয়া লিখিত আছে। সমাধি দ্বারা ছয় প্রকার অভিজ্ঞা উপার্জ্জন করা যায়; দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, অন্তের মনোভাব পরিজ্ঞান, পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি, রিপুদমন ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি (ঋদ্ধি) অর্জন।

তীর্থদর্শন।—

পূজার অপর অঙ্গ তীর্থদর্শন অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে চারিটী তীর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে—

১। যেখানে বুদ্ধের জন্ম

২। যেখানে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

৩। যেখানে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন

৪। যেখানে তাঁহার নির্ব্বাণ

এই সকল স্থান পরিদর্শন মানসে ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক উপাসিকা তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন যিনি এই চতুস্তীর্থ দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন।

এই সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র এখন কতক ভগ্ন, কতক ভগ্নপ্রায়, কতক রূপান্তরিত, কতক বা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কপিলবস্তু।—

বুদ্ধদেবের জন্মভূমি যে কপিলবস্তু, সে এখন কোথায়? তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাহার ধ্বংস হয়। তিনি নিজে ত রাজত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন, পরে তাঁহার পুত্র রাহুল ও আত্মীয়স্বজনকে স্বপক্ষে আনিয়া রাজ্যের স্তম্ভসকল শিথিল করিয়া দিলেন—ইহাদের বিয়োগে তাঁহার পিতার যে ভয়ানক কষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কষ্টের কারণ যথার্থই ছিল। ছিদ্র পাইয়া বাহির হইতে শত্রুদল রাজ্য আক্রমণ করিল। বুদ্ধের নির্ব্বাণের তিন বৎসর পূর্ব্বে কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কপিলবস্তু ধ্বংস এবং শাক্যবংশ নিপাত করেন। চীন পরিব্রাজকেরা এই বিখ্যাত নগরীর ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। সম্প্রতি বিস্তর অনুসন্ধানের পর প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অশোকের একটি খোদিত স্তম্ভ হইতে কপিলবস্তুর বাস্তভূমি নেপাল সমীপে নির্ণয় করিয়াছেন। হুয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে ঐ স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়।

বুদ্ধগয়া।—

এই স্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা বৌদ্ধদের মহাতীর্থ; Jerusalem যেমন খৃষ্টানদের, বৌদ্ধদের পক্ষে ইহাও সেইরূপ। ইহার সঙ্গে বুদ্ধদেবের অশেষ স্মৃতিচিহ্ন জড়িত আছে। অশোক রাজা একস্থানে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করেন—এই মন্দির মধ্যে মধ্যে ভগ্ন ও নবীকৃত হয়, এইক্ষণে আবার পুনর্নবীকৃত হইয়া হুয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী তাহা পূর্ব্বাকার ধারণ করিয়াছে। এইক্ষণে আর সেই বোধিবৃক্ষ নাই, যাহার তলে বুদ্ধের বোধনেত্র খুলিয়াছিল। মন্দিরের পিছনে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তৃতীয় খৃষ্টাব্দে রোপিত হয়, এখন তাহাই আছে। প্রবাদ এই যে, মূল বৃক্ষের এক শাখা মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে লইয়া যান, সেখানে তাহা প্রকাণ্ড অশ্বত্থে পরিণত হইয়াছে। হায়, বৌদ্ধধর্ম্মেরও দশা এইরূপ! জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া পরদেশে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ কোথায় কি অবস্থায় ছিল, তাহা হুয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। বৃক্ষের পূর্ব্বভাগে স্বর্ণামলক-চূড় এক বিহার ছিল, তাহার প্রবেশ-দ্বারের কুলুঙ্গিতে একদিকে অবলোকিতেশ্বর, অন্যদিকে মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বৃক্ষের উত্তরে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পাইবার পর পদচারণ করিতেন। তিনি সাতদিন ধ্যানমগ্ন থাকেন, পরে উঠিয়া যেখানে তিনি সাতদিন পায়চারি করিয়া বেড়ান, আবার যেখানে তিনি দুই বণিকপুত্র ত্রপুষ ও ভল্লিকের হস্ত হইতে উপোষণান্তে মধুপিষ্টকপূর্ণ পিণ্ডপাত্র গ্রহণ করেন, এই সকল স্থান ও অন্যান্য অনেক বিষয় হুয়েন সাঙ তাঁহার গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ত্রপুষ এবং ভল্লিক বুদ্ধের দুই প্রথম গৃহস্থ শিষ্যরূপে তাঁহার 'ধর্ম্মে' দীক্ষিত হন—'সঙ্ঘ' তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের এইরূপ কত কত কীর্ত্তি-চিহ্ন রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই।

সারনাথ।—

ইহা কাশী সমীপস্থ বৌদ্ধতীর্থ; এই স্থান হইতে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। সারনাথ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একটী প্রধান স্থান ছিল। বুদ্ধ বর্ত্তমান থাকিতেই সারনাথ বিহার প্রস্তুত হয়। তথায় বৌদ্ধদের অনেক দেবালয় ও দেব মূর্ত্তি এবং উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। এই সারনাথ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার চারিদিকে এরূপ প্রভূত ভস্মরাশি বিদ্যমান আছে যে, দেখিয়া বোধ হয় বৌদ্ধদ্বেষী শত্রুপক্ষীয়েরা সমুদায় ভস্মীভূত করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অশোকের সময়ে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়; এখনও সে স্তূপ রহিয়াছে

এবং তাহা হুয়েন সাঙ দেখিয়াছিলেন। এই স্তূপের অনতিদূরে কনিঙ্ঘাম সাহেব একটী প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, কাশীতে উপদেশ ও নির্ব্বাণ, এই চারি ঘটনাসম্বন্ধীয় প্রতিমূর্ত্তি সকল খোদিত আছে।

রাজগৃহ।—

বিম্বিসারের রাজধানী। বুদ্ধ কপিলবস্তু হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া এখানে দুইজন ব্রাহ্মণ আলাড় কালাম এবং রুদ্রকের নিকট প্রথমে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করেন।—যদিও তাহাদের প্রদর্শিত পথ তাঁহার মনোনীত হয় নাই, তথাপি তাহাদের শিক্ষা ও উপদেশ একেবারেই নিরর্থক হইয়াছিল বলা যায় না, সে শিক্ষার ফল ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের উপদেশে ফলিত দেখা যায়। রাজগৃহের বেণুবন ও গৃধ্রকূট পর্ব্বত বুদ্ধদেবের প্রিয় আবাসস্থান ছিল। বুদ্ধের জীবনী সংক্রান্ত আরও অনেক ঘটনা এই স্থানে সংঘটিত হয়। সারীপুত্র ও মুদ্গলায়ন, গৌতমের দুই প্রধান শিষ্যের অশ্বজিতের সঙ্গে এখানেই প্রথম আলাপ পরিচয়। গুরুর বিরুদ্ধে দেবদত্তের ষড়যন্ত্রেরও এই স্থান। ইহার নিকটেই সপ্তপর্ণী গুহা, যেখানে বৌদ্ধসভার প্রথম অধিবেশন হয়। বুদ্ধের শেষ বয়সে, যখন তিনি বেণুবনের বিহার হইতে রাজগৃহের গৃধ্রকূটে ফিরিয়া যান, তখন রাজা অজাতশত্রু বৃজিজাতীয় লোকদিগকে আক্রমণের পন্থা দেখিতেছিলেন। ঐ জাতি গঙ্গার উত্তর পাড় মগধের সামনে বাস করিত। অনায়াসে বৃজি সমুচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবেন কি না, তাহা জানিবার জন্য অজাতশত্রু স্বীয় অমাত্য বর্ষকারকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করেন। গৌতম বলিয়াছিলেন যতদিন বৃজিগণ পরস্পর ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে, যতদিন উহারা মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে, স্বধর্ম্ম পালনে রত থাকিবে, যতদিন উহাদের মধ্যে কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণ পূজিত হইবেন, যতদিন উহারা অর্হৎগণের রক্ষা ও পালন করিবে, ততদিন বৃজি জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে না। ঐ প্রসঙ্গে তাঁহার ভিক্ষু সঙ্ঘ যাহাতে ধর্ম্মের আশ্রয়ে ঐক্যসূত্রে মিলিত হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটন না হয়, তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন।

পাটলীপুত্র।—

গুরুজী গঙ্গাপার হইবার সময় দেখিলেন—অজাতশত্রু পাটলীপুত্রের ঠিকানায় বৃজিদের আক্রমণ নিরোধ উদ্দেশে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। সেই সময়ে তিনি পাটলীপুত্রের ভাবি গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির কথায় সকলকে

আশ্বাসিত করিয়া তাহার ভাবি দুর্গতির কারণও নির্দ্দেশ করিলেন। "নগরের তিন শত্রু, অগ্নি, জল ও গৃহ-বিচ্ছেদ।" ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রীত হইয়া, যে দ্বার দিয়া গৌতম গঙ্গাবতরণ করেন, নগরাধ্যক্ষ তাহার নাম 'গৌতম-দ্বার' রাখিবার আদেশ করিলেন। রাজগৃহের পর পাটলীপুত্রই মগধের রাজধানী হইল— অশোকের রাজধানী তাহাই। এই নগরীর আধুনিক নাম পাটনা।

কোশল।—

কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের একজন ভক্ত ছিলেন। একদা তিনি বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রাজা তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন,- "ভগবন্! আপনার সদৃশ সদ্গুরু আমি কখনো দর্শন করি নাই। বিষয়াসক্তিই পৃথিবীতে যত অশান্তির কারণ। লোকেরা তথাগতের ধর্ম্ম আশ্রয় না করিলে তাহাদের কল্যাণ হইবে না।"

প্রসেনজিতের ভগিনীর সহিত মগধরাজ বিম্বিসারের বিবাহ হয়। বিম্বিসার যৌতুক স্বরূপ শ্রাবস্তী রাজ্যপ্রাপ্ত হন। তিনি অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী ফিরিয়া লয়েন। এই সূত্রে অজাতশত্রু ও প্রসেনজিৎ, এই দুই রাজার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কালে প্রসেনজিৎ পথিমধ্যে কোন উদ্যান-পালিকা মালিনীকে দেখিতে পান। উহার নাম মল্লিকা। মল্লিকার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া রাজা তাহাকে বিবাহ করেন।

কথিত আছে এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষু সহ শ্রাবস্তীতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই বালিকা বুদ্ধকে একখানি সুমিষ্ট পিষ্টক ভিক্ষা স্বরূপ দান করিয়াছিল—তাহাতে বুদ্ধদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। সেই পুণ্যফলে বালিকাটি ভবিষ্যতে কোশলের রাজমহিষী পদে অধিরূঢ় হয়। মল্লিকার গর্ভে বিরুধক নামে এক পুত্র জন্মে।

প্রসেনজিতের ইচ্ছা এই যে, বুদ্ধবংশের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়, এবং কোন এক শাক্য-কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইয়া তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, কিন্তু শাক্যেরা এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করে নাই। তাহাদের মতে কোশলরাজ জাতিকুল হিসাবে শাক্যদের সমকক্ষ নহে। পরিশেষে তাহাদের কোন এক শ্রেষ্ঠীর বাসবক্ষত্রিয়া নামে এক দাসীপুত্রীর সহিত কোশলরাজের বিবাহ সংঘটন হয়।

বিরুধক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শাক্যেরা তাঁহার পিতাকে দাসীপুত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কিরূপ প্রতারণা করিয়াছে, এবং কিসে শাক্যদের দর্প চূর্ণ হয়, তাহার পন্থা ভাবিতে লাগিলেন। সিংহাসন প্রাপ্তির

অনতিকাল বিলম্বে (পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে) তিনি শাক্যরাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাহাদের নগর ভূমিসাৎ এবং শাক্যবংশ সমূলে ধ্বংস করেন, ও সহস্র সহস্র দাসী-কন্যা বন্দী করিয়া লইয়া যান।

মহাবংশ টীকায় এইরূপ কথিত আছে যে, 'বুদ্ধের জীবদ্দশায় কতকগুলি শাক্য বিরুধকের অত্যাচার ভয়ে হিমালয়ে পলায়ন করিয়া ঐ প্রদেশে একটী সুন্দর নগর পত্তন করে, তাহার নাম মোরিয় নগর (মৌর্য্য নগর)। সেই স্থান অনেকানেক ময়ূরের কেকা রবে প্রতিধ্বনিত বলিয়া ঐ নাম রাখা হয়। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, অশোক রাজা বুদ্ধবংশ-সম্ভূত, কেননা অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নগরের কোন এক রাণীর পুত্র বলিয়া প্রখ্যাত।*

শ্রাবস্তী।—

রাজগৃহে দ্বিতীয় বর্ষা যাপন করিয়া বণিক অনাথপিণ্ডদের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী গমন করেন। ইহা কাশীর উত্তর পশ্চিম রাপ্তী নদীতীরস্থিত। গৌতমের সময় ইহা কোশল-রাজ প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল। শ্রাবস্তীর জেতবন উদ্যান অনাথপিণ্ডদের বহুমূল্য দান; যত স্বর্ণ-মুদ্রা সেই ভূমিখণ্ডের উপর বিছাইয়া ঢাকিয়া দেওয়া যায়, বণিক তাহা তত মুদ্রায় ক্রয় করিয়া বৌদ্ধ-সঙ্ঘে উপহার দেন। জেতবন বুদ্ধদেবের সাধের আশ্রয় ছিল; সেখান হইতে তিনি যে সকল উপদেশ দেন তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রখ্যাত। জেতবনে যে বিহার নির্ম্মিত হয়, হুয়েন সাঙ তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যান। ফা-হিয়ান বলেন শ্রাবস্তীতে প্রসেনজিৎ বুদ্ধের এক চন্দনকাষ্ঠের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। ওখানকার এক মন্দির খনন করিতে করিতে বুদ্ধের এক বড় প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যায়, কিন্তু কাষ্ঠমূর্ত্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই।

বৈশালী।—

লিচ্ছবি—বৃজি-জাতীয় লোকদের রাজধানী। সজন, সধন নগর বলিয়া বৌদ্ধ যুগে প্রখ্যাত। প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রথম কতিপয় বৎসর ইহা বুদ্ধদেবের বিহারভূমি ছিল। এই নগরীর কূটাগার শালা, অম্বপালীর আম্রবন, মহাবন প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি অনেক সময় উপদেশ দিতেন। তিনি বৃজি-জাতীয় নাগরিকদের আচারব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রতি তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য যথেষ্ট ছিল। রাজা অজাতশত্রু তাহাদিগকে উচ্ছেদ

---

* Kshatriya Clans in Buddhist India (The Sakyas)
By Bimala Charan Law, M.A.B.L., F.R.C.S.—London.

করিবার অভিপ্রায়ে যখন বুদ্ধের পরামর্শ চাহিতে তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি বৃজিজাতি সম্বন্ধে নিজের যা মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। যাহাতে এই নিরীহ জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট না হয়, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় তাহাই ছিল, এ কথা তাঁহার উত্তরের ভাবার্থে স্পষ্টই বোঝা যায়।

যখন বুদ্ধের পৃথিবীর দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি ঐ নগরের প্রতি শেষবারের মত কি করুণভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহা মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বর্ণিত আছে। ঐ অঞ্চলে তাঁহার শেষ ভ্রমণকালে যখন বৈশালী ছাড়িয়া যান,—সেই নগর যাহার সহিত তাঁহার কতই সুখের স্মৃতি জড়িত—কথিত আছে তাহার প্রতি তিনি হস্তীর ন্যায় ফিরিয়া তাকাইলেন দেখিলেন, এবং আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আনন্দ, শেষবারের মত এই বৈশালী দেখিয়া লইলাম আর আমার দেখা ঘটিবে না"।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর, এই বৈশালীতে বৌদ্ধ সঙ্ঘের মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচারবিচার সম্বন্ধে সঙ্ঘে যে মতভেদ হইয়াছিল, সেই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ, বিচার ও নিষ্পত্তি হয়। সঙ্ঘ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল; এক দল বুদ্ধস্থাপিত প্রাচীন কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী, অন্য দল সেই নিয়মের শৈথিল্য সাধনে সমুৎসুক। তাঁহারা একাহার নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাঁহারা চাহেন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অপরাহ্নেও তাঁহারা ইচ্ছামত পক্কান্ন ভোজন করিতে পারিবেন; ভিক্ষুদের স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ নিষেধ ঘুচিয়া গিয়া সে বিষয়ে তাঁহাদের স্বেচ্ছানুরূপ চলিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, ইত্যাদি। ইহা বৈশালীর দ্বিতীয় সভা, এই সভায় আমোদ-প্রিয় সভ্যদিগের পরাভব হয়, কঠোর ব্রতধারী ভিক্ষুগণ জয়লাভ করেন।

কপিলবস্তু হইতে ফিরিয়া আসিয়া, একদা বুদ্ধদেব বৈশালীর মহাবনস্থ কূটাগারশালায় বাস করিতেছিলেন, এমন সময় মহাপ্রজাপতি কতিপয় শাক্য মহিলা সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বুদ্ধ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাঁহার আশঙ্কা এই, ভিক্ষুণীরা সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে তাঁহার ধর্ম্ম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না, শীঘ্রই লোপ পাইবে। পরে আনন্দের বহু সাধ্য সাধনায়, বিশেষ বিবেচনার পর তিনি প্রজাপতির মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষের উপর, লিচ্ছবিরা এই স্থানে

একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করে। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ঐ সকল প্রদেশের সম্যক অভিজ্ঞ, জেনারেল কানিংহাম্ সাহেব বিস্তর গবেষণার পর ত্রিহুত প্রদেশে মজঃফরপুরের বসাড় গ্রাম বৈশালীর বাস্তভূমি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

কৌশাম্বী।—

আলাহাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দূর। ইহা এক প্রাচীন নগরী, রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সেই রাজা উদয়নের স্থান, যাঁহার নাম মেঘদূতের এক শ্লোকে কীর্ত্তিত আছে:—'উদয়ন কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্'।

রত্নাবলী নাটকের রঙ্গভূমিও এই। বুদ্ধ এখানে অনেক সময় আসিয়া উপদেশ দিতেন। কথিত আছে বুদ্ধের এক চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি শ্রাবস্তীতে যেমন, এখানেও তেমনি গঠিত হয়। এটি বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে স্থপতি ইহা নির্ম্মাণ করে, তাহাকে 'ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে পাঠান' হয়, সেখানে গিয়া সে বুদ্ধদেবের দর্শন পায়, তথায় তিনি তাঁহার মাতা মায়াদেবীকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

নালন্দ।—

নালন্দ বিহার বৌদ্ধদের একটী অত্যুৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার আধুনিক স্থান বারাগাঁও, বুদ্ধগয়া হইতে ৪০ মাইল দূর। হুয়েন সাঙ বলেন বুদ্ধ এখানে ৩ মাস অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করেন। হুয়েন সাঙ নিজে এই বিহারে ৫ বৎসর কাল থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিলাদিত্যের রাজত্ব কালে নালন্দ-বিহার পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত ছিল। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। হুয়েন সাঙের বর্ণনা এই—"ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন বিহারে প্রায় ১০,০০০ ভিক্ষু অধ্যয়নে নিযুক্ত—বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখা এখানে একত্রিত। এখানকার ছাত্রেরা সকলেই প্রখর-বুদ্ধি, সুপণ্ডিত ও পবিত্র চরিত্র। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মালাপ; দূর দূর হইতে মহা মহা পণ্ডিত তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আসিয়া থাকেন। ত্রিপিটক যাহাদের কণ্ঠস্থ নাই, তাহারা লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া থাকে। নালন্দ-ছাত্রদের পাণ্ডিত্যের এমনি খ্যাতি যে, অনেকানেক ভণ্ড তপস্বী তাহাদের উপাধি ধারণ করিয়া পাণ্ডিত্যের ভান করিয়া বেড়ান।"

পাবা ও কুশীনগর।—

বুদ্ধের সময় বৃজি-জাতির ন্যায় স্বাধীন রাজতন্ত্রসম্পন্ন, মল্ল নামক আর এক জাতি উল্লেখযোগ্য। পাবা ও কুশীনগর, মল্লদের এই দুই প্রধান নগর। বুদ্ধদেব

তাঁহার শেষ জীবনে, মল্ল রাজ্যে চুন্দ নামে কর্ম্মকারের আম্রবনে গিয়া উপনীত হয়েন, পরে চুন্দের নিমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সহ বরাহ মাংস ভোজন করিয়া, রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। সেই পীড়িত অবস্থায়, তিনি সেই স্থান হইতে কুশীনগর যাত্রা করেন। সেখানে আপনার আসন্ন মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া, নগরের প্রান্তে শালবনে গিয়া বিশ্রাম করেন। অনন্তর তিনি আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আনন্দ, তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে তথাগত এই স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।" তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর, আনন্দ সেই সংবাদ মল্লদের নিকট লইয়া যায়। মল্লগণ আনন্দের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, শোকাভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। অনন্তর উহারা নগরপ্রান্তে শালবনে গমন করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য ও পুষ্পমাল্যের দ্বারা, ক্রমান্বয় সাতদিন বুদ্ধ দেহ পূজা করিল। পরে ঐ দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে স্থানান্তরিত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তীযোগ্য অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। চিতানল নির্ব্বাপিত হইলে, তাঁহার অস্থিখণ্ডসকল একত্র করিয়া, তাহাদের রক্ষাগারে সুরক্ষিত করিয়া রাখিল।

পাবার মল্লেরাও তাঁহার দেহাংশের অংশভাগী। শুধু তাহা নয়, মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, ইঁহারা সকলেই বুদ্ধের শরীরাংশ প্রার্থনা করিলেন; ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়—এই বলিয়া এক এক অংশের দাবী করিতে লাগিলেন। কুশীনগরের মল্লেরা প্রথমে তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। পরিশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধার্য্য হইল যে, বুদ্ধদেহ অষ্টমাংশে বিভক্ত হউক, ও তাহাতে যাহাদের ন্যায্য অধিকার, তাহাদের এক এক অংশ বিতরণ করা হউক—এইরূপে দেহের অষ্টাংশের উপর অষ্ট স্তূপ নির্ম্মিত হইল।* পাবা ও কুশীনগরের মল্লেরাও বুদ্ধদেহাংশের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া প্রীতিভোজনান্তে এই শুভানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিল।

ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

দেবিন্দ নাগিন্দ নরিন্দ পূজিতো
মনুস্সিন্দ-সেট্‌ঠেহি তথৈব পূজিতো

---

* অষ্ট স্তূপ।

১। রাজগৃহ।	৫। রামগ্রাম।
২। বৈশালী।	৬। বেষ্টদ্বীপ।
৩। কপিলবস্তু।	৭। পাবা।
৪। অল্লকপ্প।	৮। কুশীনগর।

তং বন্দথ পঞ্জলিকা ভবিত্বা
বুদ্ধো হবে কপ্পসতে হি দুল্লভো তি।
দেবেন্দ্র নাগেন্দ্র নরেন্দ্রপূজিত,
মনুজেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদেরও সেবিত,
কৃতাঞ্জলিপুটে সবে করহ বন্দন,
শতকল্পে সুদুর্লভ বুদ্ধের জনম।

চীন পরিব্রাজকেরা এখানকার ভগ্নাবস্থা দেখিয়া যান। এই প্রসঙ্গে হুয়েন সাঙ বলেন, বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ কুশীনগর যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি ভিক্ষু আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল "তথাগত গেলেন, বাঁচা গেল! আমরা কেহ কোন দোষ করিলে এখন কে আমাদের শাসন করিবেন?" এই কথা শুনিয়া কাশ্যপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে-সকল ভিক্ষু বুদ্ধের বিধানসমুদয় ভালরূপ জানেন, যাঁহারা নিজে সেই ধর্ম্মে অনুরক্ত, যাঁহারা অধীত ও সুবিচারী, তাঁহারা সভা করুন,—অপ্রবীণ নূতন শিষ্যেরা চলিয়া যান"।

ইহা শুনিয়া অনেকে চলিয়া গেল; ১০০০ লোক অবশিষ্ট রহিলেন—তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ একজন। কাশ্যপ আনন্দকে গ্রহণ করিতেও সম্মত হইলেন না। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তোমাকে সম্পূর্ণ দোষশূন্য বলিতে পারি না। তুমিও এ সভার যোগ্য নও। তুমি বুদ্ধের পার্শ্ব-সহচর প্রিয় শিষ্য ছিলে, তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে, তুমি এখনো সম্পূর্ণ আসক্তিবিহীন হইতে পার নাই—এই আমার ধারণা।"

আনন্দ নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া যোগসাধন দ্বারা অর্হৎ-সিদ্ধি লাভ করিলেন। পরে যখন তিনি সভাস্থলে ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কাশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আসক্তি-শূন্য হইয়াছ, তাহার প্রমাণ দেখাও। তুমি সূক্ষ্ম শরীরে এই রুদ্ধ দ্বার দিয়া সভায় প্রবেশ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে।" আনন্দ তখনি দ্বারের ছিদ্র দিয়া সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং উপস্থিত স্থবিরদিগকে প্রণাম করত সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

এই ত ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থের কথা বলা হইল। ইহা ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের স্মরণচিহ্নসকল বিক্ষিপ্ত—এই স্থলে তাহাদের বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

প্রায়শ্চিত্ত বিধান।—

খৃষ্টীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে গুরু সন্নিধানে আত্মপাপ স্বীকার করিবার যে রীতি আছে, বৌদ্ধ সমাজে তাহার অনুরূপ একটী প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক ভিক্ষুকে প্রতিমাসে দুইবার, অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিনে উপবাস পর্ব্বে প্রাতিমোক্ষের বিধানানুসারে সঙ্ঘসন্নিধানে আত্মপাপ অঙ্গীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত। দর্শপূর্ণমাসী বৈদিক বিধির অনুকরণে সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের মধ্যে এই পাক্ষিক পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত হয়। যেখানে এই পাক্ষিক সভার অধিবেশন হইত, সেখানে সেই ভাগের যত ভিক্ষুদল সকলকেই উপস্থিত হইতে হইত। ভিক্ষু সঙ্ঘ সমবেত হইলে, পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের মন্ত্র পাঠ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইত।

"ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি যে-কোন পাপ করিয়াছেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করুন; যদি কোন দোষ না করিয়া থাকেন, চুপ করিয়া থাকুন। যিনি মৌন থাকিবেন, ধরা যাইবে তিনি নিরপরাধী। যিনি পাপ করিয়া, জানিয়া শুনিয়া অস্বীকার করেন, তিনি মিথ্যাবাদী। ভগবান বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন মিথ্যাই বিনাশের মূল। অতএব যদি কোন ভিক্ষু কোন বিষয়ে অপরাধ করিয়া থাকেন, ও তাহা হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করুন; অনুতাপে পাপভার লঘু হইয়া যায়।"

প্রাতিমোক্ষ নামক গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, বুদ্ধদেব প্রথম কাশী হইতে রাজগৃহে প্রবাস কালে এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান বিধিবদ্ধ করেন। ভিক্ষু সঙ্ঘের পাক্ষিক অধিবেশনে এই প্রাতিমোক্ষের নিয়ম সকলের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যান হইত। কোন্ অপরাধের কি দণ্ড, প্রায়শ্চিত্তই বা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইত। অপরাধ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত।* নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি কতকগুলি গুরুপাপের দণ্ড সঙ্ঘ হইতে

---

*অপরাধের শ্রেণী বিভাগ।

১। পারাজিক—
ব্যভিচার, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, জ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা, অলৌকিক ক্ষমতার বৃথা গর্ব্ব।

২। সঙ্ঘাতিদেশ—
ব্রহ্মচর্য্য হানি দূষিত অন্তঃকরণে স্ত্রীলোকের হস্ত ধারণ, দুর্ভাষণ ইত্যাদি ১৩ প্রকার অপরাধ।

৩। অনিয়ত—
ব্যভিচার দুই প্রকার।

বহিষ্কার। অপেক্ষাকৃত লঘু পাপ—যথা, দূষিতভাবে রমণীর অঙ্গ স্পর্শ, কোন ভিক্ষুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার,—তাহার বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। পরে আহার বিহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনিয়ম, মিথ্যা কথা, অতিলোভ, পরনিন্দা, ভিক্ষুণীর সঙ্গে একাকী ভ্রমণ,—এই সমস্ত ছোটখাট দোষ 'দুকত' (দুষ্কৃত) বলিয়া গণ্য, অনুতপ্ত হৃদয়ে অঙ্গীকারেই ইহাদের খণ্ডন। এই সকল ছোটখাট দুষ্কৃতের স্বরূপ ও বিধান দেখিলে বোঝা যায় ভিক্ষু সঙ্ঘ কি কঠোর ধর্ম্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল! কোন কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার কি মাপ হইবে, ছাতা দর্পণ ব্যবহার্য্য কি না, দান্তনের মাপ কি, ভিক্ষা পাত্র কিরূপ, বসিবার আসন কত বৎসর চালাইতে হইবে, হাঁচিলে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা বিধেয় কিনা, কি উপায়ে 'আরাম' বিহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, কিরূপে স্নান আহার করিবে—ওঠা বসা ভোজন শয়ন নিদ্রা, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য বুদ্ধদেব নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধের উপদেশ কোন্ ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত, এই লইয়া অনেক সময় কথা উঠিত। একবার দুই জন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন, "প্রভু, আপনার চলিত ভাষায় লোকের মুখে মুখে অশুদ্ধ ও নষ্ট হইয়া যায়, আমাদের ইচ্ছা বুদ্ধের উপদেশগুলি সংস্কৃত ছন্দে রচিত হইয়া প্রচারিত হয়।" বুদ্ধ তাহাতে সম্মত হইলেন না।

৪। নিসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তায়—

আহার, পরিচ্ছদ, শয্যা, ভিক্ষাপাত্র, স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ সম্বন্ধীয় ৩০টি অপরাধ।

৫। প্রায়শ্চিত্তীয়—

মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, নিন্দা, বাগবিতণ্ডা, প্রতারণা, অত্যাচার, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরস্পর দুর্ব্যবহার, অসময়ে ভিক্ষা, ভোজন বিষয়ে অনিয়ম, সুরাপান, অকারণে অগ্নিসেবা, জ্ঞানপূর্ব্বক প্রাণীহত্যা, বহিষ্কৃত শ্রমণের সহিত একত্রে আহার শয়ন, ভিক্ষুগণের পরস্পর ব্যবহার, অন্যায়পূর্ব্বক সঙ্ঘের সম্পত্তি ভোগ, শয্যা বা পর্য্যঙ্কে তুলা দ্বারা কোমল বিছানায় শয়ন, প্রভৃতি ৯২ প্রকার অপরাধ।

৬। প্রতিদেশনীয়—

ভিক্ষুণীর হস্ত হইতে আহার গ্রহণ, নিমন্ত্রিত না হইয়া কোন গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় গ্রহণ, ইত্যাদি চারিটী লঘু অপরাধে দোষ স্বীকারে প্রায়শ্চিত্ত।

৭। কতকগুলি শিক্ষণীয় ধর্ম্ম—

তিনি কহিলেন, "এরূপ হইলে ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য হইবে না, বরং তাহার উল্টা হইবে। লোকেদের অবোধ্য দুরূহ ভাষায় ধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত জন্মিবে। ভিক্ষুগণ! তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃ-ভাষায় বুদ্ধ-বচন গ্রহণ কর, এই আমার উপদেশ।" (চুল্লবগ্‌গ)

এই সমস্ত নিয়মাবলীর পাঠ ও আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে পাঠক নিবেদন করেন—'ভগবান বুদ্ধের বিধানানুসারে পাঠাবৃত্তি সমাপ্ত হইল, তোমরা সকলে শান্তসমাহিত চিত্তে, সদ্ভাবে নির্ব্বিবাদে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ কর।"

পঞ্চায়ৎ।—

কিন্তু এই সদুপদেশ সত্ত্বেও সঙ্ঘে অনেক সময় বাদানুবাদ ও মতভেদ উপস্থিত হইত; চুল্লবগ্‌গে সমস্ত বিবাদভঞ্জনের অনেক প্রকার নিয়ম পরিকল্পিত দেখা যায়। তাহার মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য পঞ্চায়তের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া পঞ্চায়তে সমর্পিত হইলে, অধিকাংশ লোকের মতে তাহার নিষ্পত্তি হইত। যে সকল ভিক্ষু পঞ্চায়তে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। অপক্ষপাতী, রাগদ্বেষ-ভয়শূন্য, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুরাই এই পঞ্চায়তে বিচার করিতেন। মত গ্রহণের তিন প্রকার রীতি ছিল—গুপ্ত, অপ্রকাশ্য, প্রকাশ্য। যখন নিঃসংশয়ে জানা যায় যে, কোন একটী বিষয় সাধারণ মতে ধর্ম্মনিয়মের অনুবর্ত্তী, তখন আর গুপ্তমত গ্রহণের আবশ্যক নাই, প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিলেই হইল। তর্ক বা সন্দেহস্থলে মতগ্রাহক ভিক্ষু দুই রঙের টিকিট প্রস্তুত করেন, ও যিনি মত দিতে আসিবেন তাঁহাকে বলিবেন "এই মতের লোকের জন্য এই টিকিট; অন্য মতের লোকের জন্য এই অন্য টিকিট; যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর। অন্য কাহাকেও দেখাইও না।" বিজ্ঞাপক যদি বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করেন যে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ পক্ষের মত বলবত্তর, তাহা হইলে সে মত অগ্রাহ্য করিবেন। আর ধর্ম্মের অনুযায়ী স্থির হইলে, সে মত গ্রাহ্য করিবেন। মত গ্রহণের এই গুপ্তরীতি (ব্যালট)। অপ্রকাশ্য রীতি হচ্ছে ভিক্ষুর কানে কানে বলা, "এই টিকিট এই মতের পোষক, এই অন্য টিকিট অন্য মতের পোষক—যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর। তুমি কোন্ মতে মত দিবে আর কাহাকেও বলিও না।" বিজ্ঞাপক যদি বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করেন যে ধর্ম্মবিরোধী মত বলবত্তর, তাহা হইলে সে মত অগ্রাহ্য করিবেন; অধিকাংশের মত ধর্ম্মের অনুযায়ী স্থির জানিলে, সে মত গ্রাহ্য করিবেন। অপ্রকাশ্যভাবে মত গ্রহণের এই নিয়ম। (চুল্লবগ্‌গ)

বর্ষার ৪ মাস ভিক্ষুদের সম্মিলন ও উৎসবের সময়। বিহার ও অন্যান্য

আশ্রমে তাঁহারা এই উৎসবের মাসত্রয় যাপন করিতেন ; তখন ধর্ম্মালাপ, শাস্ত্রালোচনা, আবৃত্তি প্রভৃতির ধুম লাগিয়া যাইত। শ্রাবকেরা দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া বুদ্ধের জাতক উপাখ্যান শ্রবণের পুণ্যার্জ্জন করিতেন, এবং সকলে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিতেন। আমার স্মরণ হয়, যখন বোম্বায়ে আমার সার্ভিসের প্রথম ভাগে আহমদাবাদে কর্ম্ম করিতাম, তখন অনেক সময় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐরূপ বর্ষার উৎসবে উপস্থিত হইতাম। উহা জৈনোৎসব, বৌদ্ধদের উৎসব নহে, কিন্তু অনেক বিষয়ে এই উভয়ের সাদৃশ্য আছে। আহমদাবাদ ও অঞ্চলের জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। চাতুর্মাস্য যাপন, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ, উপবাস ব্রত ধারণ প্রভৃতি বৌদ্ধ রীতি অনুসারে জৈনদের বর্ষার উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইত।

বর্ষোৎসবের শেষে এবং প্রব্রজনের আরম্ভে বৌদ্ধদের এক বার্ষিক সভা হইত, তাহার নাম 'প্রবারণ' অর্থাৎ আমন্ত্রণ। এই আমন্ত্রণে ভিক্ষুদল মিলিত হইলে উল্লিখিত প্রকার পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক কথাবার্ত্তা চলিত। যিনি প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থী, তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—

"হে ভিক্ষুগণ! আমার বিরুদ্ধে যদি আপনারা কেহ কিছু দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকেন, আমার চরিত্র বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। যদি সত্য হয়, আমি তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।"

ক্রমশঃ গৃহী লোকের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত হয় ; কিন্তু তাহার অসুবিধা সংঘটন প্রযুক্ত অশোক রাজ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থ একটী মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রথম আত্মদোষ স্বীকার ও সঙ্গে সঙ্গে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, উভয়ই প্রচলিত ছিল। ঐ দানোৎসবটি ৫ বৎসর অন্তর সম্পন্ন হইত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগক্ষেত্রে একবার ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান হয় ; চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন সাং তাহা দর্শন করিয়া যান। তাহার বর্ণনা এইরূপ আছে :—

"ঐ সুবিস্তৃত উৎসব ক্ষেত্র একটী আনন্দক্ষেত্র ছিল, চারিদিকে সহস্র সহস্র গোলাপ গাছের সুরম্য বৃতি, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ প্রস্ফুটিত, এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ রজত পট্টবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দান দ্রব্যে পরিপূর্ণ সুসজ্জ গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে সারি সারি একশত এরূপ ভোজন করিতে পারিত। শিলাদিত্য (হর্ষবর্দ্ধন) তখন ঐ অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, অথচ তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিপত্তিও সামান্য

নহে। শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমে বিংশতি রাজ্যের রাজারা ব্রাহ্মণ শ্রমণ সৈন্য সামন্ত সহ পঞ্চাশ সহস্র লোক সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করেন। সার্দ্ধ দুই মাস ব্যাপিয়া দান ভোজনাদি সহকারে ঐ উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এই ধর্ম-মহামণ্ডলীর পশ্চিমে এক বৃহৎ সঙ্ঘারাম ও পূর্ব্বে ৬০ হস্ত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। মধ্য ভাগে বুদ্ধের স্বর্ণ মূর্ত্তি মনুষ্যাকৃতিপ্রমাণ স্থাপিত। বুদ্ধ, সবিতা ও শিব, এই তিনেরই প্রতিমূর্ত্তি একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তিদিগকে বহুমূল্য সামগ্রী দান করা এবং চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ সুস্বাদ সামগ্রী ভোজন করান হয়। বুদ্ধের এক ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি এক সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে স্থাপিত, শিলাদিত্য ইন্দ্রবেশে বামপার্শ্বে এবং কামরূপের রাজা দক্ষিণে, ৫০০ রণহস্তী প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। শিলাদিত্য চতুঃপার্শ্বে মুক্তা রজত কাঞ্চন ও অন্যান্য বহুমূল্য জিনিস ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। বুদ্ধ মূর্ত্তি ধৌত হইলে শিলাদিত্য তাহা নিজ স্কন্ধে উঠাইয়া পশ্চিম স্তম্ভে লইয়া যান, ও তদুপরি বহুমূল্য বেশভূষা স্থাপন করেন। ভোজনের পর ব্রাহ্মণ শ্রমণ মিলিয়া একত্রে ধর্মচর্চ্চা ও বাদানুবাদ হয়। একদিকে ব্রাহ্মণ শ্রমণে বাক্‌যুদ্ধ, অন্যদিকে মহাযানী হীনযানীদের মধ্যেও ঘোর তর্ক বিতর্ক বাধিয়া যায়। এই উৎসবে রাজা স্বীয় রাজকোষ নিঃশেষিত করিয়া প্রায় সমস্ত ধনই বিতরণ করিতেন। এমন কি, তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ, কর্ণকুণ্ডল, রত্নমালা প্রভৃতি বেশভূষা সমুদয়ও দেহ হইতে উন্মোচন করিয়া দিতেন।"* অবশেষে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দীন বেশে বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্ক্রমণ অভিনয় করিতেন।

হিউয়েন সাঙ বলেন যে, উৎসবের শেষে স্তম্ভে আগুন লাগিয়া যায় তাঁহার বিশ্বাস এই যে, রাজা শিলাদিত্যের বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষাবশে এই অঘোর কৃত্য ঘটাইয়া দেন, এবং রাজহত্যারও চেষ্টায় ফেরেন— ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী)

বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম পত্তন কালে তাহা কেবল ভিক্ষুদলে পরিপুষ্ট হয়। প্রথমে স্ত্রীলোকের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার ছিল না। বুদ্ধদেব, যিনি মানব প্রকৃতির দুর্ব্বলতা সম্যক্ অবগত ছিলেন, যিনি সংযম দ্বারা কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ষড়রিপুর উপর জয়লাভের উপদেশ প্রদান করিতেন, তিনি যে সঙ্ঘ-গণ্ডীর ভিতর রমণীর প্রবেশে বীতরাগ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসী দলে

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ। অক্ষয়কুমার দত্ত।

মিশিতে দিলে তাহার অশুভ পরিণাম হইবে, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। যখন বুদ্ধদেবের নিকট আনন্দ প্রথমে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন বুদ্ধ বলিলেন, "স্ত্রীলোকেরা যদি গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ন্যাসিনী না হয়, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম সহস্র বৎসর অব্যাহত থাকিবে; আর তাহাদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিলে এ ধর্ম্মের পবিত্রতা শীঘ্রই নষ্ট হইবে, অল্পকালের মধ্যে সত্য ধর্ম্ম লোপ হইবে"। বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্ত্রীজাতির প্রবেশাধিকার সহজে অর্জিত হয় নাই; অনেক সাধ্যসাধনার পর বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিক্ষুদলে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, এবং স্বীয় ধাত্রী মহাপ্রজাপতিকে তাঁহার প্রথমে স্ত্রী-শিষ্যরূপে বরণ করেন।

স্ত্রী-সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য আটঘাট যতই বাঁধিয়া রাখা যায়, তাহার ফলে তাহাদের সংঘর্ষ এড়াইবার উপায় নাই। ভিক্ষায় বাহির হইয়া দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন কর, অথবা গৃহস্থের গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণে যাও, হে ভিক্ষু! রমণী সমাগম হইতে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। তুমি চাও আর না চাও, তাহাদের দয়া মায়া তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতে যখন অবরোধ প্রথা তেমন কঠোরভাবে প্রচলিত ছিল না, লোকসমাজে স্ত্রীলোকেরও মেলামেশা ছিল, যখন জাতীয় উদ্যমে স্ত্রীলোকেরাও যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—তখনকার ত কথাই নাই। রমণীর সুন্দর ছবি আমরা প্রথম হইতেই বৌদ্ধ সমাজে চিত্রিত দেখিতে পাই। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বেই সুজাতার বৃত্তান্ত দেখ। বুদ্ধদেব যখন ৬ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, তখন কে তাঁহাকে অন্নদানে সঞ্জীব করিল?

অম্বপালী গণিকা।—

বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে অম্বপালী গণিকার আম্রবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময় অম্বপালী তাঁর দর্শনার্থ আগমন করিল। তাহার বেশভূষা সামান্য অথচ সুন্দর মোহন মূর্ত্তি! তাহাকে দেখিয়া বুদ্ধেরও ক্ষণভর তাক লাগিয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "স্ত্রীলোকটী কি পরমাসুন্দরী! রাজপুরুষেরাও ইহার রূপলাবণ্যে মোহিত ও বশীকৃত, অথচ এ কেমন সুধীর শান্ত, সচরাচর স্ত্রীলোকের ন্যায় যৌবন-মদ-মত্ত চপলস্বভাব নহে। জগতে এরূপ নারী-রত্ন দুর্লভ।" অম্বপালী বুদ্ধের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। বুদ্ধদেব তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে তাহার মন বিগলিত হইল, ধর্ম্মে তাহার মতি স্থির হইল। গণিকা বুদ্ধের শরণপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে কহিল—"প্রভু, কল্য ভ্রাতৃমণ্ডলী সহ আমার গৃহে

পদার্পণ করিয়া আহারাদি করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।" বুদ্ধদেব মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে লিচ্ছবি নাগরিক যুবকেরা রথারোহণপূর্ব্বক সেই আম্রবনে উপনীত হইল। তাহারা কেহ শুভ্র, কেহ রঙীন বেশে, নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে তাহাদের দেখাইয়া কহিলেন, দেখ ইহাদের কেমন সাজসজ্জা ঠিক যেন দেবতারা ভূতলে ক্রীড়াকাননে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া বুদ্ধকে পুনর্ব্বার ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই গণিকার নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা চা'ন অম্বপালী তার আমন্ত্রণবাক্য প্রত্যাহার করে—তাহাকে হাত করিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা কাকুতি মিনতি করিলেন, কত ধনলোভ দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সে সম্মত হইল না। সে বলিল "তোমরা সমস্ত বৈশালী নগর উপনগর সর্ব্বশুদ্ধ আমাকে দান কর, তাহা হইলেও আমি নিমন্ত্রণ-বারণ করিয়া পাঠাইতে পারিব না।" লিচ্ছবিগণ অম্বপালীকে ধিক্কার দিতে দিতে অধোবদনে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে বুদ্ধদেব গাত্রোত্থান করত বসনত্রয় পরিধানপূর্ব্বক অম্বপালীর ভবনে সশিষ্য সমাগত হইলেন।

অম্বপালী নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা তাহাদের পরিতোষ সাধন করিল; এবং আহারান্তে ভগবান বুদ্ধকে করযোড়ে নিবেদন করিল—"আমার এই উদ্যানগৃহ ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার সঙ্ঘে সমর্পণ করিতেছি—এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।" বুদ্ধদেব গণিকার সেই প্রীতির উপহার গ্রহণ করিলেন, ও তাহাকে বহুতর ধর্ম্মোপদেশ-দানে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিশাখা।—

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে-সকল সাধ্বী কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে বিশাখা তাহাদের শীর্ষস্থানীয়া। তিনি ধনে পুত্রে সৌভাগ্যবতী—দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। গৃহকর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রধান আসন ছিল—তাঁহার মত অতিথির আতিথ্য সৎকারে বহু পুণ্য উপার্জিত হয়, লোকের এই ধারণা। বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কোশল রাজধানী শ্রাবস্তীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বিশাখা ভিক্ষুদের অভ্যর্থনার জন্য প্রচুর আয়োজন করেন। একদিন বিশাখার গৃহে বুদ্ধদেব শিষ্য-মণ্ডলী সহ ভোজন করেন। ভোজনান্তে বিশাখা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন—"ভগবন, আমার কয়েকটী নিবেদন

আছে, শ্রবণ করুন।" বুদ্ধ কহিলেন,—বল, কিন্তু সকলগুলি গ্রাহ্য হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

বিশাখা কহিলেন :—

"আমার ইচ্ছা আমি যতদিন জীবিত থাকি ভিক্ষুদিগকে বর্ষায় বস্ত্র দান করিব, নবাগত ভ্রাতৃগণকে অন্নদান করিব। পীড়িত ব্যক্তিগণকে ঔষধ পথ্য প্রদান, তাহাদের অনুচরবর্গকে অন্নদান, ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ন বিতরণ, ভিক্ষুণীদিগকে বস্ত্রদান, এই সকল সৎপাত্রে দান করি আমার একান্ত ইচ্ছা।"

বুদ্ধ কহিলেন "তোমার কি অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বল।"

তখন বিশাখা তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন :—

"ভগবন, বিদেশ হইতে এখানে অনেক ভিক্ষু আসেন, তাঁহারা এখানকার পথ ঘাট কিছুই জানেন না। তাঁহাদের ভিক্ষা সংগ্রহ বহু আয়াসসাধ্য। এই সমস্ত আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে আমি যে অন্নদান করিব, তাঁহারা তাহা আহার করিয়া ইচ্ছামত নগর পরিদর্শন করিতে পারিবেন। আমি ইহাদিগকে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করি। কোন পরিব্রাজক শ্রমণ ভ্রমণের সময় যদি অন্নসংস্থানে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত তাঁহার দলের পিছনে পড়িয়া থাকিবেন, না হয়ত তাঁহার গম্যস্থানে সময়মত পৌছিতে পারিবেন না। তিনি যদি আমার অন্নছত্র হইতে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতে পান, তাহা হইলে এইরূপ কষ্টভোগ হয় না, তিনি ইচ্ছামত ভ্রমণ ও বিশ্রাম করিতে পারেন। পরিব্রাজকদিগকে অন্নদান, এই আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা। প্রভো! আবার দেখুন, অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, অচিরাবতী নদীতে ভিক্ষুণীরা স্নান করিতে নামে, আর তাহাদের সঙ্গে অনেক বারাঙ্গনাও একই সময়ে স্নান করিতে আসে। এই নির্লজ্জ স্ত্রীরা উপহাস করিয়া বলে, 'এই বয়সে তোমরা ধর্ম্মসাধনে কেন এত কষ্ট করিতেছ? এই বেলা মনের সাধে হেসে খেলে নেও—শেষ বয়সে যা ধর্ম্ম করিবার করিও—ইহকাল পরকাল দুদিক্ রক্ষা হইবে।' এইরূপ উপহাসে বেচারী ভিক্ষুণীরা বড়ই লজ্জিত ও বিরক্ত হয়। লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ, বিবস্ত্রা হইয়া নির্লজ্জ ভাবে নদীতে স্নান করিতে নামা তাহাদের পক্ষে শোভন নহে। তাহাদের স্নান-বস্ত্র যোগাইতে পারি, এই আমার তৃতীয় ভিক্ষা।"

বুদ্ধ কহিলেন "আচ্ছা, তোমার এই সকল সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আর আশীর্ব্বাদ করি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরে পানীয় দান, পরিশ্রান্ত জনে আসন, রোগীকে ঔষধ পথ্য প্রদান—অশন বসন ঔষধ পথ্য যাহার যা চাই তাহা যথেচ্ছা দান করিবার ক্ষমতা তোমার অক্ষয় থাকুক। পরের দুঃখ হরণ

ও কুশল বর্দ্ধন—এই সকল পুণ্য কার্য্যে নিরন্তর রত থাকিয়া পরত্রে তোমার সুকৃতির ফল ভোগ করিতে থাক।"

বিশাখার নিকট বৌদ্ধ সঙ্ঘ অনেক বিষয়ে ঋণী; তিনি নগরের পূর্ব্বদিকস্থ একটী সুরম্য উদ্যান সঙ্ঘে উৎসর্গ করেন, তাহার নাম "পূর্ব্বারাম।"

সুজাতা।—

উপরে এক সতী সাধ্বী সুজাতার কথা বলিয়াছি, এবার আর এক ধরনের স্ত্রী "ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ মূর্ত্তি" রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণা দেখিবেন! ইনি একজন বড়মানুষের ঘরের আদুরে মেয়ে, ইঁহার নামও সুজাতা। বুদ্ধদেব ইঁহার প্রতি কিরূপ বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহার বৃত্তান্ত এই।—তিনি একদিন ভিক্ষা-পর্য্যটনে বণিক অনাথপিণ্ডদের বাড়ী আসিয়া শুনিতে পাইলেন, সেই গৃহে মহা কলরব উপস্থিত। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের গোল, মনে হয় যেন মেছুনীদের মৎস্য চুরি গিয়াছে।" অনাথপিণ্ডদ তাঁহার দুঃখের কাহিনী বুদ্ধের নিকট খুলিয়া কহিলেন:—"আমার একটি পুত্রবধূ বড় ঘরের মেয়ে, সে আজ আমার বাড়ী আসিয়াছে। মেয়েটি বড় অবাধ্য, কাহারো কথা শুনে না, স্বামীর কথা মানে না, শ্বশুর শাশুড়ীর অবমাননা করে—বুদ্ধের পরেও তার কোন অনুরাগ নাই।" বুদ্ধ সুজাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, "এস হে সুজাতা, কাছে এস।" সুজাতা নিকটে আসিলে বুদ্ধদেব কহিলেন, "সুজাতা, স্ত্রী সাত প্রকার,—কেহ ভীমা উগ্রচণ্ডা, কেহ কুটিলা কলহপ্রিয়া, কেহ প্রিয়ম্বদা, কেহ সুশীলা, কেহ সুগৃহিণী, কেহ প্রিয়সখী, কেহ সেবিকা। তুমি কোন্ ধরনের স্ত্রী?" সুজাতা তখন তাঁর মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া উত্তর করিলেন, "প্রভু, যে প্রশ্ন করিতেছেন আমি তার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না—আমাকে বুঝাইয়া বলুন।" বুদ্ধ—"আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর।" পরে তিনি সাত প্রকার স্ত্রীর বর্ণনা করিলেন,—অসতী স্ত্রী, চপলস্বভাবা, কুলকলঙ্কিনী, স্বামীকে যিনি ভালবাসেন না, এই অধমা হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তমা সতীলক্ষ্মী পতিব্রতা, পতি যাঁর একমাত্র ধন, যিনি দাসীর ন্যায় পতিসেবাতৎপর ও পতির একান্ত বাধ্য এবং আজ্ঞাবহ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সাত প্রকার স্ত্রীর মধ্যে তুমি কার মতন?" তখন সুজাতার চৈতন্য হইল, তিনি কহিলেন, "ভগবন, আমাকে পতিব্রতা সতী স্ত্রীর মত মনে করুন, আমি অন্য কোনরূপ স্ত্রী হইতে ইচ্ছা করি না।"

এই সকল গল্পের স্রোতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এখন ফিরিয়া গিয়া আসল কথা পাড়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্ত্রীজাতির প্রবেশাধিকার অনেক সাধ্য সাধনার ফল। প্রথমে গৌতমী মহাপ্রজাপতি স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই অধিকার প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহার সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। পরে আনন্দ আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, "স্ত্রীলোক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলে কি তাহার ফললাভে সক্ষম হয় না? তাহারা কি আর্য্য মার্গ অনুসরণ করিয়া অর্হৎ হইবার অধিকারিণী নহে?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "তাহারা অধিকারিণী, সত্য।" "তবে কেন মহাপ্রজাপতিকে সঙ্ঘভুক্ত করা না হয়? ভগবন, তিনি আপনার মাতৃবিয়োগে স্বীয় স্তন্যদুগ্ধ দিয়া আপনাকে লালন পালন করিয়াছেন, তিনি প্রভুর পরম ভক্ত, পরম উপকারিণী সেবিকা, তাঁহাকে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা কি উচিত হয়?" পরে বুদ্ধদেব বৌদ্ধ তপস্বিনীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন, তাহার সারাংশ এই যে, ভিক্ষুণীরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভিক্ষুমণ্ডলীর আজ্ঞাবহ থাকিবেন। মনুর যে বিধান—"শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অধীন, স্ত্রীলোক কোনকালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না"—ভিক্ষুণীর প্রতি বুদ্ধানুশাসন ইহারই অনুযায়ী। সন্ন্যাসিনী হইয়াও স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই। তাঁহাদের প্রতি যে অষ্টানুশাসন আছে, তাহা এই :—

১। ভিক্ষুদিগকে সম্ভ্রম ও ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে।

২। যে প্রদেশে ভিক্ষু নাই, ভিক্ষুণী সেখানে বর্ষাযাপন করিবেন না।

৩। প্রত্যেক পক্ষে ভিক্ষুণী ভিক্ষু-সঙ্ঘের অনুমতি লইয়া উপবাসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, ও সঙ্ঘের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

৪। বর্ষার উৎসব উদ্‌যাপিত হইলে ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ উভয়ের সমক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য (প্রবারণ) ব্রত পালন করিবেন।

৫। উভয় সঙ্ঘ হইতে 'মানত' শাসন গ্রহণ করিবেন।

৬। দুই বৎসর অধ্যয়নের পর উভয় সঙ্ঘ হইতে উপসম্পদা দীক্ষা লাভ করিবেন।

৭। শ্রমণদের নিন্দা ও তাহাদের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিবেন না।

৮। ভিক্ষুরা তাঁহাদের দোষ বলিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সৎ পথে রক্ষা করিবেন, কিন্তু ভিক্ষুদের প্রকাশ্যে দোষ ধরা ভিক্ষুণীদের সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

মহাপ্রজাপতি এই ধর্ম্মানুশাসন গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের প্রথমা শিষ্যা রূপে দীক্ষিতা হইলেন। পরে তিনি এক সময়ে ভিক্ষু ভিক্ষুণী যাহাতে গুণ ও

কর্ম্মানুসারে সমান মানমর্য্যাদার অধিকারী হয়, এইরূপ প্রস্তাব করেন ; কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। কালক্রমে ভিক্ষুণীদের উপযোগী স্বতন্ত্র নিয়মাবলী প্রস্তুত হইল। ভিক্ষুণী ভিক্ষুমণ্ডলীর সহচরী হইয়া ফিরিবেন, স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া কুত্রাপি গমনাগমন করিবেন না। বুদ্ধের আদর্শ সন্ন্যাসিনী কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা মহাপ্রজাপতির প্রতি তাঁহার যে উপদেশ, তাহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। তৃষ্ণা পরিহার, অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকা, বৃথা আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে ধ্যান ধারণা ধর্ম্মসাধন করা, আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীলা হওয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা, বিনয়ী ও নম্র হওয়া, সকলের সহিত সদ্ভাবে সন্তোষের সহিত জীবন যাপন করা—বৌদ্ধ তপস্বিনী এইরূপ শুদ্ধাচার অবলম্বনপূর্ব্বক স্বকীয় ব্রত পালন করিবেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ভিক্ষুদের তুলনায় অনেক কম, তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের বল বৌদ্ধ সঙ্ঘে সেই পরিমাণে অল্প হইবারই কথা। অথচ এদিকে দেখা যায় বৌদ্ধতাপসীগণ জনসমাজে বহুমানের পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, নয়কৌশল, সম্ভ্রান্ত পরিবারে গতিবিধি, তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয়, মালতী মাধব প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা নিজ বিদ্যা বুদ্ধি পুণ্যবলে শ্রমণাপদে আরূঢ় হইতে পারিতেন ; এমন কি, তিনি অর্হৎ হইবারও অধিকারিণী ছিলেন। ক্ষেমা প্রভৃতি অনেকানেক বৌদ্ধতপস্বিনীদের প্রখর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যগুণে বৌদ্ধসমাজে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়।

ক্ষেমার সন্ন্যাস গ্রহণ।—

ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হইবার পর বিম্বিসার-পত্নী ক্ষেমার সন্ন্যাস গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব যখন শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে ফিরিয়া গিয়া বেণুবনে ষষ্ঠ বর্ষা যাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ক্ষেমা রাণীর দীক্ষা হয়। তিনি অপরূপ রূপলাবণ্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ কখন মনেও স্থান দেন নাই। একদিন দৈবক্রমে তিনি বেণুবনে বেড়াইতে বেড়াইতে বুদ্ধের আশ্রমের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞানে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মানসে মায়া বলে স্বর্গ হইতে এক পরমা সুন্দরী অপ্সরা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন—রাণী তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই রমণী যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা একে একে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া ক্ষেমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় ও গুরুমন্ত্র গ্রহণের জন্য তাঁহার মানসক্ষেত্র

প্রস্তুত হয়। ঐ অবসরে ভগবান বুদ্ধ কতিপয় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার কানে যেন মধু বর্ষণ করিয়া দিলেন। অতঃপর তথাগতের সদুপদেশ শ্রবণে ক্ষেমা সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন এবং অচিরাৎ অর্হৎ পদবী অর্জ্জন করেন। তিনি তথাগতের অগ্রশ্রাবিকা মধ্যে পরিগণিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইতেন। এই হেতু তাঁহাকে 'দক্ষিণ হস্ত' শ্রাবিকা বলিত।

উৎপলবর্ণা।—

উৎপলবর্ণা কোন এক ধনবান গৃহপতির কন্যা ছিলেন—এই প্রসঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কন্যাটী রূপে গুণে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রার্থীরও অভাব ছিল না। তাঁহার পিতা মনে মনে ভাবিলেন,—যদি ইহাকে কোন রাজা বা যুবরাজের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, প্রার্থীদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে চিরকুমারী রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেন। এই কুমারী স্বীয় তপস্যার প্রভাবে অচিরাৎ অর্হৎ পদ লাভ করিলেন। উৎপলবর্ণা বুদ্ধের এক অগ্রশ্রাবিকা। ইনি সর্ব্বদাই গুরুদেবের বামপার্শ্বে বসিতেন বলিয়া, 'বামহস্ত' শ্রাবিকা নামে অভিহিত হইতেন

থেরীগাথায় নিম্নলিখিত থেরীগণের নামোল্লেখ আছে ঃ—

পূর্ণা, তিস্সা, ধীরা, মিত্রা, ভদ্রা, উপশমা, মুক্তা, ধর্ম্মদত্তা, বিশাখা, সুমনা, উত্তরা, ধর্ম্মা, সঙ্ঘা, জয়ন্তী, আঢ্যকাশী, চিত্রা, মৈত্রিক', অভয়া, শ্যামা, উত্তমা, দন্তিকা, শুক্লা, শৈলা, সোমা, কপিলা, বিমলা, সিংহা, নন্দা, মিত্রকালী, বকুলা, সোনা, চন্দ্রা, পটাচারা, বাশিষ্টী, ক্ষেমা, সুজাতা, অনুপমা, মহাপ্রজাপতি, গৌতমী, গুপ্তা, বিজয়া, চালা, বুদ্ধমাতা, কৃশাগোতমী, উৎপলবর্ণা, পূর্ণিমা, অম্বপালী, রোহিনী, চম্পা, সুন্দরী, শুভা, ঋষিদাসী, সুমেধা ইত্যাদি।

সূত্রপিটকে থেরগাথা ও থেরীগাথা নামক দুইখানি গাথা সংগ্রহ পুস্তক আছে, তাহাদের ভাষ্যে রচয়িতা রচয়িত্রীদের নাম ও জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, অনেকানেক স্থবিরা তপস্বিনী গৌতমের জীবদ্দশায় থেরীগাথা রচনা করেন। অনেকগুলি গাথা অতি সুন্দর, ও লেখিকার সুবুদ্ধি এবং ধর্ম্মশীলতার পরিচয় প্রদান করে। এই সকল তপস্বিনী বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ সেই উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিত, ও শুনিয়া মোহিত হইত। থেরীভাষ্যে সোমা নামক

একটী তাপসীর কথা আছে, তিনি রাজা বিম্বিসারের সভাপণ্ডিতের কন্যা, দীক্ষালাভের পর ধ্যান ধারণা সাধনার দ্বারা অর্হৎপদ লাভ করেন। তিনি শ্রাবস্তীর নিকটস্থ এক উপবনে বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্না আছেন, এমন সময় 'মার' আসিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার মানসে ভয় দেখাইতে লাগিল—

বহু তপস্যার ফলে যোগী ঋষি লভয়ে যে স্থান,
তুমি নারী, কেমনে পাইবে বল তাহার সন্ধান!
চিরকাল রাঁধ বাড়, তবুও ত পাকিল না হাত,
টিপিয়া দেখিতে হয় বার বার ফুটেছে কি ভাত!

তখন স্থবিরা উত্তর করিলেন—

নারীজন্ম লভিয়াছি, বল তাহে ক্ষতি কি আমার,
নরনারী সবাকার সত্যলাভে তুল্য অধিকার।
একাগ্র করিয়া চিত, আপনায় করিয়া নির্ভর,
অর্হতের পথ ধরি, ধীরে ধীরে হব অগ্রসর।
বিষয় বাসনা যত, কালে হবে ছিন্ন মূল তার,
সত্যের আলোকে আর ঘুচে যাবে অজ্ঞান আঁধার।
জান্ ওরে ভাল করে, আপনারে দেখ্ দুরাশয়,
আমিও চিনেছি তোরে, নাহি আর নাহি কোন ভয়।

বৌদ্ধ গৃহস্থ।—

বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এ তাহার এক প্রধান দোষ, কেন না ইহা কে না স্বীকার করিবে যে উদাসীন সম্প্রদায় বিস্তৃত হইলে সমাজ রক্ষা সুকঠিন। সকলেই সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলে মনুষ্যকুল ধ্বংস হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সন্ন্যাসী দলও বিনষ্ট হইয়া যায়। দেখুন ভিক্ষুদের ধনো-পার্জ্জনের পথ বন্ধ—তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন, রক্ষণাবেক্ষণ সকলি গৃহস্থের উপর নির্ভর। ভিক্ষু গৃহীর অন্নেই প্রতিপালিত, গৃহীর প্রসাদেই তাহার বাস পরিচ্ছদের সংস্থান। গৃহস্থেরা যদি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া বাহির হয়, তাহা হইলে সংসারযন্ত্রের কল বন্ধ হইয়া যায়, অন্নাভাবে সন্তানাভাবে মনুষ্য-সমাজ—বৌদ্ধ সঙ্ঘ—সকলি উচ্ছন্ন হইয়া যায়। বুদ্ধদেব স্বয়ং ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, এই হেতু ভিক্ষু ছাড়া গৃহস্থ শিষ্যও বৌদ্ধসমাজের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ঘের সহিত বৌদ্ধ গৃহস্থের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। গৃহস্থকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার এক ত্রিশরণ মন্ত্র ভিন্ন আর কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল না। আচারবিচারে বৌদ্ধ গৃহস্থ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলুন, তাহাতে

কাহারো কোন আপত্তি নাই—বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অন্নাচ্ছাদনে পোষণ করাই তাঁহাদের কার্য্য। বৌদ্ধ গৃহস্থের নাম উপাসক উপাসিকা, তাঁহারা একপ্রকার কনিষ্ঠ অধিকারী। বুদ্ধের খাস শিষ্যমণ্ডলীর্ভে প্রবেশ করিতে গেলে সঙ্ঘভুক্ত হওয়া আবশ্যক—তাঁহারা অনেকে ততদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না; ভিক্ষু-দিগকে সংরক্ষণ করাই তাঁহাদের বুদ্ধত্বের লক্ষণ।

ভিক্ষুদের জন্য বুদ্ধদেব যে সকল নিয়ম বাঁধিয়া দেন, তাহার কতকগুলি নিয়ম গৃহস্থের পালনীয়। ধাম্মিক সূত্রে গৃহস্থের কুলধর্ম্ম বলিয়া যে সকল বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবহত্যা, চুরি, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার ও সুরাপান, এই পঞ্চ নিষেধ সর্ব্বসাধারণ—ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি অনুশাসন আছে, যথা—

অকাল ভোজন করিবে না।

মাল্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না।

মাদুর বিছাইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে।

এই তিনটি বিধান গৃহস্থের প্রতি ততটা বন্ধনকারী নয়, তথাপি শুদ্ধাচারী গৃহস্থের পালনীয়।

উপবাস।—

অমাবস্যা পূর্ণিমা ও আর দুই দিন—মাসের মধ্যে এই চার দিন উপবাস। তা ছাড়া প্রতিহার পক্ষও রক্ষণীয়।

প্রতিহার পক্ষ কি, না বর্ষার ৩ মাস এবং বর্ষার পর-মাস, যাহাকে চীবর মাস বলে, অর্থাৎ নূতন চীবর ধারণের সময়। চীবর ধারণের অর্দ্ধমাস উপবাস প্রভৃতি ব্রত পালনের প্রশস্ত কাল।

এই সমস্ত নিয়ম ও ব্রত পালন ভিক্ষু ও গৃহস্থের পক্ষে সমান, প্রভেদ এই যে কতকগুলি বিধান, যাহা ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয়, গৃহস্থের উপর তাহার ততটা বন্ধন নাই; আর দুইটি নিষেধ ভিক্ষুদের জন্যই করা হইয়াছে—অর্থাৎ নৃত্য গীত নাট্যাদি দর্শন না করা, এবং সোনা রূপা গ্রহণ না করা—এই দুই গৃহস্থসমাজে খাটে না। তেমনি আবার গৃহীদের প্রতি কতকগুলি বিশেষ বিধান আছে, যথা, সাধুজীবিকা অবলম্বন করা, পিতা মাতাকে ভক্তি করা, গুরুজনকে মান্য করা, ভিক্ষুদিগকে অন্নবস্ত্র দান দ্বারা পোষণ করা, ইত্যাদি। শৃগালবাদ সূত্রে গৃহীধর্ম্ম আরো বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সারাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বুদ্ধদেব রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভিক্ষায়

বাহির হইবার সময় দেখিলেন শৃগাল নামক জনৈক গৃহস্থ আর্দ্রবেশে কৃতাঞ্জলিপুটে, উপরে আকাশ নীচে পাতাল, চারিদিক নিরীক্ষণ করত নমস্কার করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শৃগাল বলিলেন—"ভগবন, পিতৃকুলের তর্পণ উদ্দেশে এইরূপ করিতেছি।" পরে এই আটদিক কি উপায়ে সুরক্ষিত হইতে পারে, বুদ্ধদেব সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিলেন :

জলসিঞ্চনে নয়, কিন্তু শুভ চিন্তা ও কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদিক সুরক্ষিত হয়। পূর্ব্ব দিকে আলোক সঞ্চার হয়, পূর্ব্বমুখী হইয়া পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিবে। দক্ষিণে ধনাগম, দক্ষিণ মুখে গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য চিন্তন করিবে। পশ্চিমে দিবাবসানের সুরাগ ও শান্তি—পশ্চিমমুখী হইয়া স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল চিন্তা করিবে। উত্তরে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, উর্দ্ধে ব্রাহ্মণ শ্রমণ সাধু সজ্জন, অধোতে দাস পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ ও মনন করিলে ছয় দিক সুরক্ষিত থাকিবে—সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইবে।

মনুষ্যের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের নিয়ম এই—

পিতা পুত্র—

পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য

১। পুত্রকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা

২। ধর্ম্ম শিক্ষা দান

৩। বিদ্যা দান

৪। পুত্রের বিবাহ—সৎপাত্রে কন্যাদান

৫। বিষয়াধিকার প্রদান

পুত্রের কর্ত্তব্য

১। পিতা মাতার ভরণপোষণ করা

২। কুলধর্ম্ম রক্ষণ

৩। বিষয় রক্ষা

৪। পিতার যোগ্য পুত্র হইবার চেষ্টা

৫। পিতা মাতার স্মৃতি রক্ষা

গুরু শিষ্য—

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য

১। গুরুভক্তি

২। গুরুর সেবাশুশ্রূষা

৩। আজ্ঞা পালন

৪। গুরুদক্ষিণা দান

৫। বিদ্যাভ্যাস

শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য

১। স্নেহ ও শিষ্টাচার

২। ধর্ম্মশিক্ষা ও উপদেশ প্রদান

৩। আপদ বিপদ হইতে সংরক্ষণ

স্বামী স্ত্রী—

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য

১। সম্মান প্রদর্শন

২। ভালবাসা

৩। একনিষ্ঠতা

৪। ভরণপোষণ বেশভূষায় তুষ্টি সাধন

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য

১। গৃহকার্য্যে দক্ষতা

২। অতিথি সেবা

৩। সতীত্ব রক্ষা

৪। মিতব্যয়ী হওয়া

৫। শ্রমশীলতা

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্ত্তব্য

১। উপহার দান

২। মধুরালাপ

৩। কল্যাণ-কামনা

৪। আত্মবৎ ব্যবহার

৫। সুখ-সম্পত্তি বাঁটিয়া ভোগ করা

সখ্য-লক্ষণ

১। বিপদে রক্ষা করা

২। বিষয় রক্ষা

৩। আশ্রয় দান

৪। বিপদকালে বন্ধুকে পরিত্যাগ না করা

৫। পরিবার পোষণ

প্রভু-ভৃত্য—

ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্ত্তব্য।

১। যথাশক্তি তাহার কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দেওয়া

২। অন্ন, বেতন, পারিতোষিক দান

৩। ঔষধপথ্য প্রদান

৪। ভাল জিনিস পাইলে বাঁটিয়া দেওয়া

৫। কর্ম্ম হইতে মধ্যে মধ্যে অবকাশ দান

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য

১। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন

২। সকলের শেষে বিশ্রাম করা

৩। সন্তোষ অবলম্বন

৪। কায়মনে প্রভু-সেবা করা

৫। সবিনয় সম্ভাষণ

ব্রাহ্মণ শ্রমণের প্রতি গৃহীর কর্ত্তব্য

১। কায়মনোবাক্যে প্রিয়কার্য্য সাধন

২। আতিথ্য

৩। অন্নবস্ত্র দান

গৃহীর প্রতি ভিক্ষুর কর্ত্তব্য

১। পাপ হইতে নিবৃত্ত করা

২। ধর্ম্মোপদেশ প্রদান

৩। শিষ্টাচার

৪। ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন

৫। মুক্তিপথ প্রদর্শন

এইরূপে পরস্পর কর্ত্তব্য পালন করিলে ছয় দিক সুরক্ষিত ও গৃহস্থের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ হয়।

দান সৌজন্য দয়া দাক্ষিণ্য নিঃস্বার্থতা গৃহস্থ জীবনের পরম সম্বল।

শৃগাল বৌধধর্ম্মে উপাসকরূপে গৃহীত হইলেন।'

এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান আষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গের প্রথম সোপান। এই পথে চলিতে চলিতে মুমুক্ষু ব্যক্তি কালক্রমে অর্হৎমণ্ডলীর সহবাসের যোগ্য হইয়া সেই শান্তিধামে উপনীত হয়েন, যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই, সকল পাপের ক্ষয়, সর্ব্বদুঃখের অবসান হয়। সেই নির্ব্বাণ—সে অবস্থা দেবতাদিগেরও স্পৃহণীয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র

শাক্যসিংহ কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই ; বৌদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে তাঁহার কথাবার্ত্তা উপদেশ নিয়মাদি শ্রুতিপরম্পরায় শিষ্যমুখে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, পরে কোন সময়ে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধের মরণোত্তর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভার উল্লেখ করা গিয়াছে, এই স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছু পরেই মহাকাশ্যপের মন্ত্রণায় রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সভার অধিবেশন হয়। উহার এক শতাব্দী পরে কালাশোক, তৎপরে অশোক রাজা, এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৪৩ শতাব্দে কাশ্মীরের শকজাতীয় রাজা কণিষ্ক যথাক্রমে বৈশালী, পাটলিপুত্র ও জালন্ধরে এক একটি সভা করেন। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সভায় বুদ্ধের উপদেশ ও কথাবার্ত্তা সঙ্কলিত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত ও অশোকের সভায় সেই শাস্ত্র পুনর্ব্বার সমালোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার—বিনয় পিটক, সূত্র পিটক এবং অভিধর্ম্ম পিটক। এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ইহাতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রণালী, প্রায়শ্চিত্ত বিধান, নীতি, উপাখ্যান, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি সন্নিবেশিত আছে।

পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। তথাপি ত্রিপিটক শাস্ত্র ঠিক কোন সময়ে পুঁথি ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে, পাটলিপুত্রে যে ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রণীত হয়, অশোকপুত্র মহেন্দ্র তাহা লইয়া সিংহলে গমন করেন, এবং তিনি ঐ সময়ে ত্রিপিটকের পালি ভাষ্যও মগধ হইতে আনাইয়া সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন। কেহ কেহ বলেন ত্রিপিটকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্ঠস্থ করিয়া তিনি সিংহল যাত্রা করেন। সে যাহা হউক, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রাজা বত্তগামনীর রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পালি শাস্ত্র সিংহলে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধঘোষের সময় অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে যে ঐ শাস্ত্রের পালি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল, ইহাও একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত।* খুব সম্ভব ঐ পাণ্ডুলিপি মহেন্দ্রের সময়ে বিদ্যমান ছিল। এখন বিবেচ্য এই—

* Introduction to Sacred Books of the East, Vol. X.

তাহার কত পূর্ব্বে উহা প্রস্তুত হয়? এই বিষয়ের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এক এই পাওয়া যায় যে, প্রচলিত ত্রিপিটকের ভিতরে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার উল্লেখ আছে, অতএব তাহার উত্তরকালে ত্রিপিটক রচনা হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আর এক কথা এই যে, ত্রিপিটকের মধ্যে পাটলিপুত্র সভার কোন উল্লেখ নাই, অতএব তৎপূর্ব্বে ইহার রচনাকাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ইহা হইতে নিদান এইটুকু স্থির বলা যায় যে, বৈশালী এবং পাটলিপুত্র সভার মাঝামাঝি কোন সময়ে ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রথম প্রস্তুত হয়। আবার ঐ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, যেমন বিনয়ের প্রাতিমোক্ষ ভাগ, এবং বুদ্ধ উপদেশের কিয়দংশ। এই সমস্ত কারণে ত্রিপিটকের কিয়দংশ ধর খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে, কতক বা তাহারও পূর্ব্বে বিরচিত। দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধেরা ঐ শাস্ত্র সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন, ও পরে তাহা ব্রহ্মদেশাদির ভাষায় অনুবাদিত হয়। এ ভিন্ন উহা ভোট, চীন, মোগল, কালমুখ প্রভৃতি উত্তর দেশীয় অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

বিনয় পিটক (সঙ্ঘ-নিয়মাবলী)

১। সুত্ত বিভঙ্গ { পারাজিকা, প্রায়শ্চিত্ত বিধান }

২। খন্ধক { মহাবগ্‌গ, মহাবর্গ; চুল্লবগ্‌গ, ক্ষুদ্রবর্গ }

৩। পরিবার পাঠ, পরিশিষ্ট।

সুত্তপিটক (বুদ্ধের উপদেশ)

১। দীর্ঘ নিকায়, ৩৪ দীর্ঘ সূত্রসংগ্রহ (মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র প্রভৃতি)

২। মধ্যম নিকায়, ১৫২ মধ্যম সূত্র-সংগ্রহ।

৩। সংযুক্ত নিকায়, সংযুক্ত সূত্র-সংগ্রহ।

৪। অঙ্গুত্তর নিকায়, বিবিধ সূত্র-সংগ্রহ।

৫। ক্ষুদ্রক নিকায়, ক্ষুদ্র সূত্র-সংগ্রহ, ইহার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত ১৫ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত :—

১। ক্ষুদ্রক পাঠ।

২। ধম্মোপদ।

৩। উদান, স্তুতি (৮২ সূত্র)

৪। ইতিবৃত্তক, বুদ্ধ কথাবলী।

৫। সুত্ত নিপাত, ৭০ সূত্র।

৬। বিমান বত্থু, স্বর্গ কথা।

৭। পেত্ত বত্থু, প্রেত কথা।

৮। থেরাগাথা, স্থবির-গাথা।

৯। থেরীগাথা, স্থবিরা-গাথা।

১০। জাতক, পূর্ব্বজন্ম কাহিনী।

১১। নিদ্দেস, সারীপুত্রের ব্যাখ্যান।

১২। পতিসম্ভিধামগ্‌গ, প্রতিসম্বোধমার্গ।

১৩। অপদান, অর্হৎ চরিত্র।

১৪। বুদ্ধবংশ, গৌতম ও পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ জন বুদ্ধের জীবনবৃত্ত।

১৫। চরিয়া পিটক, বুদ্ধ-চরিত।

অভিধর্ম্ম পিটক (দর্শন)

১। ধম্মসঙ্গণি।

২। বিভঙ্গ।

৩। কথাবত্থুপকরণ।

৪। পুগ্‌গলপন্নত্তি।

৫। ধাতুকথা।

৬। যমক, (পরস্পর বিরোধী যুগল কথা সংগ্রহ)।

৭। পট্‌ঠানপকরণ (কার্য্যকারণ নির্ণয়)।

চুল্লবর্গের শেষ দুই খণ্ডে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার বিবরণ বর্ণিত আছে, এবং কথিত হইয়াছে যে, প্রথম সভায় উপালী 'বিনয়' আবৃত্তি করেন, আনন্দ 'ধর্ম্ম' পাঠ করেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ সময়ে শাস্ত্রের দুই অঙ্গই ছিল, তৎপরে 'ধর্ম্ম' দুই ভাগে বিভক্ত হয়—সূত্র এবং অভিধর্ম্ম। এই অভিধর্ম্ম খণ্ড ক্রমে অপর দুই পিটকের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়।

সূত্র পিতক ।—

বৌদ্ধ সঙ্ঘে অমাবস্যা পূর্ণিমায় যে দোষ ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধান পঠিত হয়, সেই ব্যবস্থাগুলি ইহার মূল সূত্রে গ্রথিত। ক্রমে ভাষ্যের উপর ভাষ্য ও টীকা সংযুক্ত হইয়া গ্রন্থখানি বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নিয়মাবলী সূত্রবিভঙ্গের অন্তর্ভূত।

প্রাতিমোক্ষ।—

প্রায়শ্চিত্ত-বিধানগুলি স্বতন্ত্র আকারে প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ, সঙ্ঘের নিয়মাবলী বুদ্ধ স্বয়ং যাহা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ইহার মধ্যে থাকাই সম্ভব। তথাপি আশ্চর্য্য এই যে, বৌদ্ধেরা ইহার শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা সূত্র বিভঙ্গের সমান জ্ঞান করেন না।

মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ } কালক্রমে নানা প্রক্ষিপ্ত অংশে পুষ্টিলাভ করিয়া বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। পরিবার পাঠ পরবর্ত্তী কালে সঙ্কলিত।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র সূত্র-পিটকের দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত। ইহাতে বুদ্ধজীবনীর শেষ ৩ মাসের ঘটনাবলী ও মরণবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহাতে বুদ্ধের মুখে পাটলিপুত্রের ভাবি উন্নতি বিষয়ের যে কথাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার রচনাকাল, পাটলিপুত্র মগধ-রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার উত্তরকালে বলিয়া অনুমান হয়,—খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী ধরা যাইতে পারে।

ধর্ম্মপদ।—

সূত্ত-পিটকের অন্তর্ভূত ক্ষুদ্রক নিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থের একটি গ্রন্থ। ইহার নাম হইতেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ধর্ম্মনীতি বিষয়ক পদাবলী। ইহাতে যে সকল ধর্ম্ম-প্রবচন ও হিতোপদেশ আছে, আমাদের মহাভারত, গীতা, এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ কথার অপ্রতুল নাই, কতক বিষয়ে অবিকল সাদৃশ্যও উপলক্ষিত হয়—তথাপি ইহার কোন কোন ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি, তাহা হইতেই ইহার স্বরূপ ও মতামত কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

এইখানে প্রথমে দুইটী শ্লোক বলিব, তাহা বুদ্ধদেব প্রবুদ্ধ হইবামাত্র উচ্চারণ করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক! দিট্‌ঠোঽসি, পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

অর্থ—জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার—
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

মনেতেই ধর্ম্ম। ১, ২

মনেতেই ধর্ম্ম; ধর্ম্ম মনোগামী। যে ব্যক্তি মন্দভাবে আলাপ ও কার্য্য করে, টানা গাড়ী যেমন বলদের পিছনে পিছনে যায় দুঃখ সেইরূপ তার অনুগামী হয়।

মনেতেই ধর্ম্ম; ধর্ম্ম মনোগামী। যিনি ভাল ভাবে আলাপ ও কার্য্য করেন, ছায়ার ন্যায় সুখ তাঁর অনুগামী হয়।

যে যা করে, সে তা হয়; উল্টে না কদাপি,
সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী।

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

পাপ পুণ্য। ১৭, ১৮

পাপকারী ইহলোক পরলোক উভয়ত্র দুঃখ ভোগ করে। ইহলোকে পাপাচরণ করিয়া সন্তাপ, পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া আরো যন্ত্রণা।

পুণ্যবান ইহলোকে পরলোকে উভয়ত্র সুখ ভোগ করেন। ইহলোকে পুণ্য কর্ম্ম করিয়া আনন্দিত, পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর আনন্দ উপভোগ করেন।

পাপ করি পাপকীর্ত্তি দহে পাপানলে,
পুণ্য করি পুণ্যকীর্ত্তি বাড়ে পুণ্য ফলে।
পুণ্য আচরণে আত্মা হয় পুণ্যময়,
পাপ আচরণে হয় পাপের আলয়॥ ঐ

১২১। পাপ আসিবে না মনে করিয়া পাপ বর্জনে অবজ্ঞা করিবেক না; জলবিন্দুপাতে অল্পে অল্পে জলকুম্ভ পূর্ণ হয়, অল্পে অল্পে সঞ্চয় করিয়া মূর্খ পাপে পূর্ণ হয়।

ক্ষরিলে ইন্দ্রিয় কোনো, বুদ্ধিও ক্ষরিতে সুরু করে,
কলসের ছিদ্র দিয়া জল যথা ক্রমশঃ নিঃসরে। ঐ

১২২। পুণ্য আসিবে না মনে করিয়া পুণ্যার্জনে অবজ্ঞা করিবেক না। জলবিন্দুপাতে অল্পে অল্পে জলকুম্ভ পূর্ণ হয়, ধীর ব্যক্তি অল্পে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পুণ্যে পূর্ণ হয়েন।

ক্ষুদ্রকীট পুত্তিকা বিরচে যথা প্রকাণ্ড আলয়,
অল্পে অল্পে তেমনি ধরম ধন করিবে সঞ্চয়। ঐ

১৬৫। মনুষ্য আপনিই পাপ করে, আপনিই তার ফল ভোগ করে। আপনি পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, আপনিই শুদ্ধি লাভ করে। পাপ পুণ্য আমার নিজেরই জিনিস, আপনি ভিন্ন আর কেহ আমাকে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম নহে।

একাই জনমে নর, একা হয় মৃত ;
একাই সুকৃত ভুঞ্জে, একাই দুষ্কৃত। ঐ

২১৯-২২০

চির-প্রবাসী দূর হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয় স্বজন বন্ধু তাহাকে স্বাগত বলিয়া অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ পুণ্যবান ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে পর তাঁহার পুণ্য তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় প্রতিগ্রহণ করেন।

চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোত্থিমাগতং,
ঞাতি মিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি আগতং।
তথেব কত পুঞ্ঞম্পি অস্মা লোকা পরং গতং
পুঞ্ঞানি পতিগণ্হন্তি পিয়ং ঞাতীব আগতং।

(পালি)

অহিংসা ১৩০, ১৩১

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবিত সকলেরই প্রিয়। তুমিও আপনাকে তাহাদের উপমাস্থলে আনিয়া কাহাকেও বধ বা হিংসা করিবে না।

যিনি আত্মসুখ কামনায় অন্য সুখকামী জীবের হিংসা করেন, তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হন না।

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং,
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।
সুখ কামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।

(পালি)

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা,
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
(হিতোপদেশ)

রিপুদমন। ৩, ৪, ৫, ২২২, ২২৩

"ও আমাকে মারিয়াছে, ও আমায় গালি দিয়াছে, আমার চুরি করিয়াছে" এই সকল চিন্তা মনে স্থান না দিলে বৈরী আপনাপনি প্রশমিত হয়; কেননা হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা জিত হয় না, প্রেম দ্বারা জিত হয়।

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা, অসৎকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

অকোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিকবাদিনং। (পালি)

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ
অসাধুতা সাধু আচরণে,
অসত্য জিনিবে সত্যে
কদর্যে করিবে বশ—ধনে। (পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম)

সেই সারথী, যে ক্রোধকে আপনার বশে রাখিতে পারে,—অপর ব্যক্তি কেবল রাশ-রজ্জু-ধারী।

বুদ্ধিহীন যেই জন, মন যার সতত অস্থির,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্ব যেন সারথীর।
যেই জন সুবুদ্ধি, কর্ত্তব্যে যার নাহিক আলস্য,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব। ঐ

আত্ম সংযম। ৮০, ১০৩

উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা, উসুকারা নময়ন্তি তেজনং, (বেণুং)
দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা, অত্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা।

কৃপখন্তা জলের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, ইষুকার মনের মত বাণ গড়িয়া লয়, সূতার কাষ্ঠ বাঁকা সোজা ইচ্ছামত গড়ে, জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে আপনি নিয়মিত করেন।

যিনি যুদ্ধে সহস্র লোকের উপর জয়লাভ করেন। তিনি জয়ী নহেন, যিনি আপনাকে আপনি জয় করেন তিনিই যথার্থ বিজয়ী।

সংসার। ১৭০, ১৭১

যথা বুব্বুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং,
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্‌সতি (পালি)

সংসার জলবিম্বপ্রায় দেখিবে, মরীচিকা-সমান জ্ঞান করিবে ; যিনি সংসারকে এইরূপে দেখেন, মৃত্যুরাজ তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে পারে না।

এই চাকচিক্যময় সংসার যেন রাজার রথ, বাহির হইতে দেখিবার জিনিস। মূঢ় ইহার প্রতি আসক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে স্পর্শ করেন না।

মৃত্যু। ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯

"এইখানে শীত গ্রীষ্ম কাটাইব, এখানে বর্ষা যাপন করিব" মূঢ় ব্যক্তি এই ভাবনায় অস্থির—মৃত্যুর অন্তরায় স্মরণ করে না। সুপ্ত গ্রামের উপর বন্যার ন্যায় মৃত্যু আসিয়া পুত্র কলত্র শুদ্ধ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—তাহার মন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। পিতা পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ইহা জানিয়া জ্ঞানী ও সাধুপুরুষ শীঘ্রই নির্ব্বাণ পথের কণ্টক মোচন করিবেন।

পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা,
পিতামাতা, পুত্রদার, জ্ঞাতি বন্ধু ; ধর্ম্ম রবে একা।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমান ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর
বন্ধুগণ যায় চলি, ধর্ম্ম হয় পথের দোসর।

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

জরা মৃত্যু। ১৪৩, ১৪৮

এত হাসি, এত আমোদ প্রমোদ কিসের জন্য? সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা অবিশ্রান্ত রহিয়াছে। তোমরা অন্ধকারে বাস করিয়া কেন না আলো অন্বেষণ কর?

এই দেহ ব্যাধিতে শীর্ণ, জরাজীর্ণ হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়, মৃত্যু আসিয়া জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

আত্মদোষ পরচ্ছিদ্র। ২৫২

পরের দোষে সহজেই দৃষ্টি পড়ে, আপনার দোষ দেখিয়াও দেখি না। প্রতিবেশীর দোষগুলি ভূসির ন্যায় বাহিরে ফেলিয়া দি—নিজের দোষ যত্নে ঢাকিয়া রাখি, যেমন শিকারী পক্ষী হইতে আপনাকে ঢাকিয়া রাখে।

কথা ও কাজ। ৫১, ৫২

কথা মধুর, কাজ বিপরীত,—নির্গন্ধ ফুলের ন্যায় দেখিতে রংচঙে, অথচ গুণ নাই।

ভাল কথা, ভাল কাজ—সুগন্ধ সুবর্ণ পুষ্পের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

সুখ। ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯

আমরা সুখে থাকিব, আমাদের যে ঘৃণা করে আমরা তাহাকে ঘৃণা করিব না। আমাদের যারা দ্বেষ্টা, আমরা তাহাদের মধ্যে দ্বেষশূন্য হইয়া বাস করিব। আতুরের মধ্যে অনাতুর হইয়া থাকিব, লোভীর মধ্যে নির্লোভী হইয়া বাস করিব। আমাদের আপনার কিছুই নাই, অথচ প্রীতিভোজী দেবতাদের ন্যায় আমরা সদানন্দ।

স্থবির কে? ২৭০, ২৬১

যাঁহার শুক্লকেশ, তিনি বৃদ্ধ নহেন; বয়সে বিজ্ঞ হয় না, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে। সত্য প্রেম ক্ষমা দয়া যাঁর, যিনি জ্ঞানবান ও শুদ্ধচিত্ত, তিনিই স্থবির।

শুক্লকেশ যাহার, সে নহে বৃদ্ধ;
দেবতা সকলে
তাহারেই জানে বৃদ্ধ,
যৌবনেই বিদ্যা যার ফলে।
(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

মুনি কে? ২৬৮, ২৭৯

মূর্খ যে, সে মৌন হইলেই মুনি হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি নিক্তির ওজনে সদসৎ বিবেচনা করিয়া, যাহা শ্রেয় তাহা গ্রহণ করেন, যাহা অসৎ তাহা পরিত্যাগ করেন।—তিনিই মুনি। যিনি সংসারের ভাল মন্দ দুই দিক বিচার পূর্ব্বক দেখেন। তিনিই মুনি।

মৌনে মুনি না হয়
না হয় মুনি জটাজুট ভারে,
আপনাকে পছানে যে বিলক্ষণ—
মুনি বলি তারে।
শ্রেয় আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য মাঝারে,
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে।

শ্রেয় যে গ্রহণ করে, বিপত্তি এড়ায়,
প্রেয় যে বরণ করে, সর্ব্বস্ব হারায়। (পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম)

তৃষ্ণা। ২৭১, ২৭২

ব্রত অনুষ্ঠানে, শাস্ত্র অধ্যয়নে, ধ্যান বা বিবিক্ত শয়নে, সংসারীর দুষ্প্রাপ্য মোক্ষ লাভ হয় না। হে ভিক্ষু! তৃষ্ণা নিবৃত্তি না হইলে এই সমস্ত সাধনায় আশ্বাসযুক্ত হইও না।

কামনা যে ত্যজে তার সব ধন মিলে,
সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে।
(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম)

ভিক্ষু কে? ৯, ১০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০

যে ব্যক্তি কশায় (পাপ) হইতে বিমুক্ত না হইয়া কাষায় (গেরুয়া বসন) পরিধান করিতে চান, যিনি মিতাচারী ও সত্যবান নহেন, তিনি কাষায়ের যোগ্য নহেন। যিনি 'কশায়' হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, মিতাচারী ও সত্যপরায়ণ, তিনিই কাষায় বসনের উপযুক্ত।

যিনি হস্ত পদ বাক্য বশে রাখেন, যিনি সংযত ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি আপনাতে আপনি আনন্দময়, যিনি সন্তুষ্টচিত্তে বিজনে বাস করেন—তিনিই ভিক্ষু।

হে ভিক্ষু! নৌকার বোঝাই ফেলিয়া দিয়া ইহাকে হাল্কা কর, হাল্কা হইলে দ্রুত চলিবে। রাগ দ্বেষ দূরে ফেলিয়া নির্ব্বাণ পথের যাত্রী হও।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বন্ধন ছেদন কর; যিনি এই পঞ্চ শিকল ভাঙ্গিয়াছেন, তিনিই 'ওঘোত্তীর্ণ' ভিক্ষু।

৩৩০। মূর্খের সহবাস অপেক্ষা একাকী বিজনে বাস ভাল। পাপাচরণ করিও না, অরণ্যে যেমন হস্তী চরিয়া বেড়ায়, তুমিও সেইরূপ একা একা মনের সুখে ফিরিয়া বেড়াও।

২৭৬। মুক্তি সাধনে তোমার আপনার চেষ্টা চাই, তথাগত উপদেষ্টা মাত্র। নির্ব্বাণ পথে সাবধান হইয়া চল, নহিলে মারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই।

৩৩৭-৩৩৮। বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলেই নষ্ট হয় না, তাহার মূল যতক্ষণ অক্ষত থাকে ততক্ষণ সে মরে না, আবার বাড়িয়া ওঠে; তৃষ্ণার বিষয় বিনষ্ট হইলেও দুঃখ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে। মারের হস্ত হইতে যদি পরিত্রাণ চাও, তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন কর।

একটা গাছ কাটিলে কি হইল? সমুদয় বন কাটিয়া ফেলা চাই। হে ভিক্ষু! সমস্ত বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নির্ভীক ও নির্ম্মুক্ত হও।

যে ব্যক্তি সদাচারী শান্ত সমাহিত হইয়া বুদ্ধের আদেশ পালন করেন, *তিনি বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তি ও নির্ব্বাণানন্দ* উপভোগ করেন।

উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ, জটা ধারণ, ভস্ম লেপন, ভূমি-শয়ন, এ সকলি নিষ্ফল—যতক্ষণ অন্তরে বাসনানল প্রদীপ্ত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ কে? ৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০১, ৪২২

জটাজুট ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ হয় না; যাঁহাতে ন্যায় সত্য অধিষ্ঠান করে, তিনিই ব্রাহ্মণ।

রে মূর্খ! জটাধারণে কি ফল? অজিন বসন পরিয়া কি লাভ? ভিতরে লোভ ভরপূর, বাহিরের চাকচিক্যে কি হইবে?

যিনি লোভী ও অহঙ্কারী, ব্রাহ্মণ জন্মিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যিনি নির্ধন অথচ বিষয়সুখে নির্লিপ্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ।

তিনিই ব্রাহ্মণ, যিনি সকল শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নির্ভয় হইয়াছেন—যিনি মুক্ত ও স্বাধীন।

যিনি বিনাদোষেও দণ্ড তিরস্কার অবমাননা অকাতরে সহ্য করেন, ক্ষমা যাঁর বল, তিতিক্ষা যাঁর সেনা, তিনিই ব্রাহ্মণ।

যিনি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, সূচি অগ্রে সরিষার বীজের ন্যায় সংসারের সুখ দুঃখে নির্লিপ্ত থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ।

৩৯১। মনোবাক্ কর্ম্মে যিনি দুষ্কৃতশূন্য, এই তিনেতেই যিনি সংবৃত ও শুদ্ধাচারী, তিনিই ব্রাহ্মণ।

মনোবাক্যে কর্ম্মে যাঁরা
না করেন পাপ আচরণ,
তাঁহারাই তপস্বী, তপস্যা নহে
দেহের শোষণ। (পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

জন্মিয়া যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না—সে ত ধনবান, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে ভো ভো বলিয়া বেড়ায় (ভো-বাদী); কিন্তু যিনি আসক্তিহীন অকিঞ্চন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

রাগ দ্বেষ মদমাৎসর্য্য সূঁচি অগ্রে সরিষার বীজের ন্যায় যাঁহা হইতে পতিত হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ।

যস্‌স রাগো চ দোসো চ মানো মক্‌খো চ পাতিতো,
সাসঁপো রিব আরগ্গে তমহম্‌ ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

যিনি সংসারের মোহময় দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধ্যানশীল, অকপট, শুদ্ধ-ভাষী, অনাসক্ত, সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ।

আদিত্য দিবসে দীপ্তি পান, চন্দ্রমা রাত্রে প্রকাশ পান, ক্ষত্রিয়ের তপস্যা কবচ ধারণ, ব্রাহ্মণের তপস্যা ধ্যান, বুদ্ধ অহো-রাত্রি স্বকীয় তেজে প্রকাশিত।

ব্রাহ্মণ কি, না বাহিত পাপ; শমচর্য্যা হইতে শ্রমণ; যিনি মালিন্য পরিবর্জন করেন, তিনি পরিব্রাজক।

যিনি আপনার পূর্ব্ব নিবাস জানেন, স্বর্গ নরক দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, যাঁর জন্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সত্ত্বগুণের আধার যে মুনি, তিনিই ব্রাহ্মণ।

নির্ব্বাণ।—

নত্থি রাগসমো অগ্‌গি, নত্থি দোসসমো কলি,
নত্থি খন্ধাদিসা দুক্‌খা, নত্থি সন্তিপরং সুখং।
জিঘচ্ছা পরমা রোগা, সঙ্খারা পরমা দুখা,
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্‌বানং পরমং সুখং।
আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুট্ঠি পরমং ধনং,
বিস্‌সাস পরমা ঞাতী, নিব্‌বানং পরমং সুখং।

রাগ সমান অগ্নি নাই, হিংসার ন্যায় পাপ নাই,
শরীরের ন্যায় দুঃখ নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই।
হিংসা পরম ব্যাধি, সংস্কার পরম দুঃখ,
নির্ব্বাণ পরম সুখ, যিনি এই জানেন তিনি সত্য জানেন।
আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন,
বিশ্বাস পরমাত্মীয়, নির্ব্বাণই পরম সুখ।
"সন্তোষ সুখের মূল, ইথে নাহি ভুল।
অসন্তোষই যত কিছু অসুখের মূল।
অন্ত কভু নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস,
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস।
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধর্ম্মই কল্যাণ মূর্তিমান,
বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিদান।"

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম)

শরৎ-কুমুদের ন্যায় আপন হাতে স্নেহ মমতা ছিঁড়িয়া ফেল, শান্তি-মার্গ অনুসরণ কর; সুগত (বুদ্ধ) নির্ব্বাণরূপ সুগতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

যিনি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনাশ, দুঃখান্তকারী অষ্টাঙ্গ মার্গ, এই চতুরার্য্য সত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হন, তিনি ক্ষেম পদ, পরম শরণ লাভ করেন। এই শরণ লাভ করিয়া জীব সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হয়েন—ইহাই ধর্ম্মপদ সার সংগ্রহ।

এই সকল শাস্ত্র ভিন্ন অনেকানেক ভাষ্য, টীকা, গাথা, ইতিবৃত্ত ব্যাকরণাদি পালি ও সিংহলী ভাষায় বিরচিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মধ্যে বুদ্ধঘোষের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য ইনি বৌদ্ধদের সায়নাচার্য্য। বুদ্ধগয়ার ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম—রেবত নামক এক মহাস্থবিরের উপদেশে ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার ঘনঘোর কণ্ঠরব বুদ্ধের অনুরূপ কল্পনায় 'বুদ্ধঘোষ' 'ইঁহার নামকরণ হয়। এই বৌদ্ধাচার্য্য চূড়ামণি পঞ্চম খৃষ্টাব্দে সিংহলে গমন করত রাজা মহানামের রাজত্ব কালে অনুরাধাপুরে বাস করেন (খৃঃ ৪১০—৪৩২), ও তথায় ত্রিপিটকের মহাভাষ্য (অর্থকথা) রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত 'বিশুদ্ধি মার্গ', ধর্ম্মপদ-ভাষ্য, ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক অন্যান্য অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

মিলিন্দ প্রশ্ন।—

যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন, ধর্ম্ম বিষয়ে ইঁহাদের পরস্পর কথোপকথন। খৃষ্টাব্দের দ্বিশতাব্দী পূর্ব্বে এই গ্রীক রাজের রাজত্বকাল। বুদ্ধঘোষের গ্রন্থে মিলিন্দ প্রশ্নের উল্লেখ আছে, অতএব ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে গণনীয়। খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

আমরা যে আকারে মিলিন্দ প্রশ্ন পাইয়াছি, তাহা মূলগ্রন্থ কিম্বা অন্য কোন মূলগ্রন্থের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ, সে বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

দ্বীপবংশ এবং মহাবংশ।—

সিংহলের দুই প্রখ্যাত পালিগ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয় খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে বিরচিত, ও ইহাদের মধ্যে সিংহলের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত লিখিত আছে।

দাক্ষিণাত্যের হীনযান বৌদ্ধশাস্ত্র উত্তরদেশীয় মহাযানীদের সর্ব্বাংশে গ্রাহ্য নহে। তাঁহারা ত্রিপিটক মান্য করেন বটে, কিন্তু তাহার উপরে নিজস্ব অনেক ধর্ম্ম ও দর্শনতত্ত্ব যোগ করিয়া দেন, সে সমস্ত অধিকাংশ সংস্কৃতে রচিত। চীন

ও জাপান দেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে যে গ্রন্থত্রয় সমধিক আদরণীয় তাহা সুখাবতী ব্যূহ—দুইভাগ।

অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্র।

দুই ব্যূহের একটী 'সুখাবতী' স্বর্গবর্ণনা, অন্যটি অমিতাভের স্বর্গবর্ণনা; স্বয়ং বুদ্ধ তাঁহার শেষবয়সে এই গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্রে রাজা অজাতশত্রুর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার প্রতি উপদেশ আছে।

বজ্রচ্ছেদিকা নামক মায়াবাদ গ্রন্থখানি জাপানে বহু আদরের বস্তু, বুদ্ধের মুখ হইতে ইহার ধর্ম্মোপদেশ উদ্গীরিত। "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক" প্রভৃতি অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ উত্তর শাখার অন্তর্গত।

ললিত বিস্তর।—

ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ছাড়া বুদ্ধ-জীবনী সংক্রান্ত এই গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। ইহা সংস্কৃত গদ্যপদ্য-বিরচিত, পদ্য ভাগ প্রাচীনতর বোধ হয়; আর ইহার মধ্যে কতকগুলি অধিকতর প্রাচীন পালি গাথা সন্নিবেশিত। এই গ্রন্থ তিব্বতী ও চীন ভাষায় সম্ভবতঃ একাধিকবার অনুবাদিত হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত ফুকো (Foucaux) এই তিব্বতী অনুবাদের ফরাসী অনুবাদ করেন। তাঁহার মতে তিব্বতী অনুবাদের কাল ষষ্ঠ শতাব্দী। চীনদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ ৭৬ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। তাহা হইলে খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। ললিত বিস্তরে বুদ্ধের জন্ম হইতে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ পর্য্যন্ত জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক কলিকাতায় এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এতদ্ভিন্ন তিব্বতী শাস্ত্র, সংখ্যা ভার ও বিস্তৃতি হিসাবে এমনি প্রকাণ্ড ব্যাপার যে, অন্যান্য দেশের সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া উঠে। কিন্তু উহা কোন গ্রন্থ মৌলিক নহে, পালি ও চীন ভাষা হইতে অনুবাদিত।

পালি ভাষা।—

ভারতবর্ষীয় ভাষাবলী সামান্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) আর্য্যভাষা, (২) দ্রাবিড়, (৩) অপর ভাষা। যে সকল ভাষায় ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয়, সেই যে বৈদিক, সংস্কৃত, যাহা কিছু

কিছু রূপান্তর হইয়া উত্তর কালে সাহিত্য কাব্যের ভাষা, রামায়ণ মহাভারত মনু-সংহিতা কালিদাসের ভাষা লৌকিক সংস্থিত হইয়া দাঁড়ায়, সেই সুপ্রাচীন আর্য্যভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমুদায় উৎপন্ন হয়; সেই সমস্ত পুনরায় ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া অধুনাতন হিন্দী বাঙ্গলা, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ-ভাষায় পরিণত হইয়াছে, এ কথা প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং এতদ্দেশীয় আচার্য্যেরাও প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত চলিত দেশভাষার প্রসূতি প্রাচীন প্রাকৃত, ইহার ব্যাকরণ কাব্য সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থসকল আমাদের হস্তগত হইয়াছে; এই প্রাচীন প্রাকৃত এখন আমাদের নিকট সংস্কৃতের ন্যায় পণ্ডিতদের পাঠ্য ভাষা, মৃতভাষা হইয়া পড়িয়াছে। পালি এই প্রাচীন প্রাকৃতের শাখাবিশেষ। গৌতমের অভ্যুদয় কালে পালি এবং মাগধী সম্ভবতঃ একই ভাষা ছিল। কাত্যায়নী, যিনি পালি ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তিনি প্রকারান্তরে তাহাই বলিয়াছেন। এই মাগধী পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দী, বাঙ্গলা, বেহারী ও অন্যান্য উপভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু পালির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গৌতমের সময় তাঁহার ভ্রমণক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এই ভাষা অথবা ইহার অনুরূপ কোন ভাষা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল গ্রন্থাবলী এই ভাষায় বিরচিত। অশোকের অনুশাসনগুলি যে ভাষায় প্রচারিত, তাহার মধ্যে পরস্পর কিছু কিছু বিভিন্নতা সত্ত্বেও মোটামুটি সে ভাষা পালি বলা যাইতে পারে। এই পালিভাষা ব্যাকরণ নিয়মে ও সুবিস্তীর্ণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া চলৎশক্তি-রহিত হইয়া পড়িল ও মৃতভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। একদিকে সংস্কৃত, অপরদিকে আধুনিক প্রাকৃত, পালি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। বৈদিক সংস্কৃত ছাড়িয়া দিলে ইহা ভারতের প্রাচীন ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। সম্প্রতি এই মহানগরীতে মহাবোধি সমাজ হইতে পালি শিক্ষার উপযোগী একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। কি ভাষা-তত্ত্ব, কি তত্ত্ব-বিদ্যা, কি আদি বৌদ্ধধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, কি বুদ্ধের জীবনবৃত্ত ও উপদেশ, কি তৎকালবর্ত্তী ভারতের ইতিবৃত্ত ও সামাজিক অবস্থা—ইহাদের যে কোন বিষয় বলুন, তার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পালি ভাষা শিক্ষা ও আয়ত্ত করা অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার মূল প্রস্রবণ যখন মাগধী, তখন পালি আয়ত্ত করা যে আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য, তাহা বলা বাহুল্য।

সংস্কৃতের অপভ্রংশে যে সকল প্রাকৃত উৎপন্ন হয়, তাহা আর্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রচলিত আর্য্য দেশ ভাষাগুলি নিম্নলিখিত রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।

১। পশ্চিম শাখা।

(ক) উত্তর পশ্চিম শ্রেণী		লোক সংখ্যা
সিন্ধী		২৫,৯০,০০০
কাশ্মীরী		৪০,৯০,০০০
	(খ) মধ্য পশ্চিম শ্রেণী	
পঞ্জাবী		১,৭৭,২০,০০০
গুজরাটী		১,১০,৬০,০০০
রাজপুতানী		১,৩১,৫০,০০০
হিন্দী		৩,৫৮,২০,০০০
	(গ) উত্তর শ্রেণী	
পাহাড়ী		১১,৫০,০০০
নেপালী		৩০,২০,০০০
	প্রাচ্য শাখা	
	(চ) মধ্য প্রাচ্য শ্রেণী	
বৈশ্বারী		২,০০,০০,০০০
বিহারী	" "	৩,০০,০০,০০০
	(ছ) দক্ষিণ শ্রেণী	
মারাঠী	" "	১,৮৯,৩০,০০০
	(জ) প্রাচ্য শ্রেণী	
বাঙ্গলা	" "	৪,১৩,৪০,০০০
আসামী	" "	১৪,৪০,০০০
উড়িয়া	" "	৯,১০,০০০
		২০,৯৩,২০,০০০

এই সকল উপভাষার মূল যে প্রাকৃত, তাহাও দেশ-ভেদে বহুরূপী হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব খণ্ডে (দক্ষিণ বেহারে) পালি ও মাগধী; পশ্চিমে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থানে সৌরসেনী। এই দুই প্রদেশের মধ্যভাগে

যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা ঐ উভয় ভাষার সম্মিশ্রণে 'অর্দ্ধ মাগধী' নামে অভিহিত। এই আর্য্য ভাষাগুলির বহির্ভূত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত যে ভাষা, তাহা 'অপভ্রংশ' বলিয়া পরিচিত। প্রাকৃতের এই চতুরঙ্গ হইতে আধুনিক গ্রাম্য ভাষা সমুদায় বিনিঃসৃত। অন্যান্য প্রাকৃতের সঙ্গে পালি ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা নিম্নলিখিত লতিকা দৃষ্টে অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যভাষা লতিকা।

এই লতিকা Calcutta Review পত্রের Oct. 1895 সংখ্যায় প্রকাশিত Grierson's Indian Vernaculars প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ও বিকৃতি।

মহাযান ও হীনযান।—

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান দুই শাখা হীনযান ও মহাযান, ইতিপুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দুই শাখার সৃষ্টি হয় নাই। রাজা কণিষ্কের সময় হইতে এই প্রভেদের সূত্রপাত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পালি যেমন শাস্ত্রীয় ভাষারূপে গৃহীত হইল, তিনি সেরূপ না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র রচনার আদেশ করিলেন এবং সেই আদেশানুসারে তাঁহার জালন্ধর সভায় বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্যত্রয়, ১। সূত্র পিটকের উপদেশ, ২। বিনয়-বিভাষা-শাস্ত্র, ৩। অভিধর্ম্ম-বিভাষা-শাস্ত্র, সংস্কৃতেই বিরচিত হয়। কণিষ্কের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র মহাযান নামে অভিহিত এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ মত হীনযান বলিয়া পরিগণিত। দক্ষিণের বৌদ্ধরা এই নামে আপনাদের পরিচয় দিতে প্রস্তুত কি না বলিতে পারি না—বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মপাল এ বিষয়ের খাঁটী খবর বলিতে পারেন। সে যাহা হউক, 'মহাযান' 'হীনযান' এই নাম-করণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে মহাযানীরা হীনযানকে নিকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করেন ও তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে মনুষ্যের সদ্গতি-সাধন পক্ষে মহাযানই উত্তম সাধন। মহাযান মত যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হয় তাহা বলা যায় না, ঐ প্রদেশেও হীনযান মতাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়; আবার দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধেরাও অনেকে কণিষ্কের প্রভাবে মহাযান মত গ্রহণ করেন। তবে এই কয়েকটী ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে যে, সিংহল শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে হীনযান মত প্রচলিত; চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বতীয় উত্তর-বাসীগণ মহাযান মতাবলম্বী। অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা মহাযান মতের প্রধান পোষক ছিলেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, আমার মতে নামকরণ উল্টা হইয়াছে। বুদ্ধোপদিষ্ট মূল ধর্ম্মের আভাস যদি কোথাও থাকে তাহা পালি ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকাই সম্ভব, আর হীনযান মত যদি সেই শাস্ত্র-সম্মত হয় তাহা হইলে ঐ মতটীই আদিম ধর্ম্মের অনুযায়ী হওয়া সম্ভব। উহারই নাম "মহাযান" হওয়া সঙ্গত বোধ হয়।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম।—

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পদে পদে প্রতিভাত হয়; বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় মহাযান শাস্ত্ররচনা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উভয় ধর্ম্মের সম্মিশ্রণ ও একীকরণ আরো ঘনীভূত হইয়া আসে। বৈদিক দেবতা অগ্নি ইন্দ্রাদি বৌদ্ধ দেব-রাজ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্র অনেক সময় মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়া সাধু পুরুষদের ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করেন; পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাব্রহ্মার জন্য বৌদ্ধ দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম হইতেই আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রহ্মা সহাম্পতি বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় তাহার পরম হিতকারী বন্ধুরূপে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয়েন। বুদ্ধের মৃত্যুকালে প্রথমেই যে বিলাপধ্বনি সমুত্থিত হয়, সে ব্রহ্মারই আকাশবাণী। উত্তরকালে বিষ্ণুও বৌদ্ধ দেবাসন গ্রহণ করেন। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর একপ্রকার বিষ্ণু-অবতার। অধ্যাপক মোনিয়র উইলিয়মস্ বলেন তিনি সিংহলের বিখ্যাত নগরী ক্যাণ্ডিতে মহাবিষ্ণুর মন্দির দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বিষ্ণুদেবের এক রূপার প্রতিমা আছে। ঐ সকল স্থানে কিন্তু বিষ্ণুর অন্য অবতার কৃষ্ণের কোন নামগন্ধ নাই। শিব তাঁহার পত্নীসহ বৌদ্ধরাজ্যে অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। শিব মহাযোগী, মহাকাল, ভৈরব ও ভীমরূপে, এবং তাঁহার পত্নী পার্ব্বতী দুর্গারূপে, উত্তরদেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। নেপালে শিবের মন্দির এবং বুদ্ধের মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে—এক দেবতার প্রীত্যর্থ রীতিমত পশুবলি চলে, অন্য দেবতা না জানি তাহা কি ভাবে দৃষ্টি করেন। দেবীগণের মধ্যে তারাদেবী প্রধানা, হুয়েন সাং মগধে তাঁহার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন। নেপালে পঞ্চশক্তির উপাসনা প্রচলিত—বজ্রধাত্রী, লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা, তারাদেবী—এই পঞ্চদেবী। দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব গরুড়, কুম্ভাণ্ড প্রভৃতি জীবেরাও বৌদ্ধধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছে।

মার।—

বৌদ্ধদের যদি কোন নিজস্ব দেবতা থাকে, তাহা 'মার'। যদিও 'মার' শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে মৃত্যুর সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগ, কিন্তু মৃত্যুরাজ যমের সহিত তাহার তেমন সাদৃশ্য নাই। মারকে বৌদ্ধ শয়তান অথবা পারসিদের অমঙ্গল দেবতা অহ্রিমান বলা যাইতে পারে,—কতকটা শনি বা কলির প্রতি-রূপ। ইহার এক নাম কামদেব। ইনি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া মনুষ্যশরীরে প্রবেশ

করিয়া কামাদি রিপুসকল উত্তেজিত করেন। বুদ্ধত্ব পাইবার পূর্ব্বে গৌতম যখন বোধিবৃক্ষতলে যোগাসনে আসীন ছিলেন, তখন 'মার' স্বীয় পুত্রকন্যা দলবল লইয়া কত ভয়, কতপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেব যোগাসনে অটল রহিলেন, অপ্সরাগণের সহস্র মায়া পরাহত হইল। আবার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরেও 'মার' বুদ্ধকে অশেষ কুমন্ত্রণা দিয়া ধর্ম্ম প্রচারের শুভ সংকল্প হইতে ফিরাইবার কত চেষ্টা পায়, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মধুর স্বরে ফুস্‌লাইতে থাকে "ভগবন্! আপনি অনেক সাধ্য সাধনায় এই দিব্যজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা লোকের মধ্যে প্রচারে কি ফল? সংসারী যারা, তারা সকলেই বিষয়মোহে মুগ্ধ, কেহই আপনার কথায় কর্ণপাত করিবে না, তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আপনি বিজনে আপন মনে একা নির্ব্বাণানন্দ উপভোগ করুন।" বুদ্ধদেবের চিত্ত বিচলিত দেখিয়া ব্রহ্মা সহাম্পতি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন ও বুদ্ধের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া নিবেদন করিলেন :—

দেখ গো মগধ রাজ্য হ'ল ছারখার,
দুরাচার, অনাচার, অধর্ম্মের জয়;
প্রভু হে তার হে ভবে, খোল স্বর্গদ্বার,
শুনাও তোমার ধর্ম্ম, বিনাশি সংশয়।
দেখাও হে পুণ্যপথ, পবিত্র, সরল;
অভ্রভেদী গিরি লঙ্ঘি দাঁড়ায় যে জন
শৈলশৃঙ্গে, দৃষ্টি তার স্থির, অচপল।
সত্যের শিখরে তুমি উঠেছ যখন,
কৃপাদৃষ্টি কর, প্রভু, মানবের পরে,
রোগ শোক জরা মৃত্যু গ্রাসে চরাচর।
জয়হস্ত তুলি, বীর, চল পথ ধরে',
জাগাও ভারতে, মর্ত্ত্যে গৌরবে বিচর।
প্রচারো সত্যের যশ দুন্দুভি-নিঃস্বনে,
পরিত্রাণ কর সবে সুর-নরগণে।

বুদ্ধদেব ব্রহ্মার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইলেন। 'মার' আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

'মারে'র প্রলোভন মন্ত্রতন্ত্র এড়াইতে হইলে কচ্ছপের ন্যায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে এই বিষয়ের উপদেশ দিতেন। "একটি

কচ্ছপ সন্ধ্যার সময় পানার্থে নদীতীরে গমন করে। সেই একই সময়ে একটা শৃগাল তাহার আহার অন্বেষণে যায়। শৃগালকে দেখিয়া কচ্ছপ আপন খোলার ভিতরে লুক্কায়িত থাকিয়া নির্ভয়ে জলে সন্তরণ করিতে লাগিল। কখন্ সে তাহার কোষের মধ্য হইতে গ্রীবা বাহির করিবে, শৃগাল তাহা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু কচ্ছপ কিছুতেই তাহার কোটরের বাহিরে মুখ বাড়ায় না, শৃগাল অনেকক্ষণ বসিয়া অবশেষে শিকার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হে ভিক্ষুগণ! 'মার' এইরূপ তোমাদের ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছে—তোমাদের চক্ষুদ্বার, কর্ণদ্বার, নাসিকা, জিহ্বা, দেহ-মনোদ্বার কখন্ কোন্ দরজা খোলা পায় সেই অবসর খুঁজিতেছে, সন্ধি পাইলেই প্রবেশ করিবে। অতএব সাবধান! ইন্দ্রিয়দ্বারের উপর নিয়ত প্রহরী নিযুক্ত রাখ, তাহা হইলে পাপাত্মা 'মার' বিফল-প্রযত্ন হইয়া তোমাদের ছাড়িয়া দূরে যাইবে, শৃগাল যেমন কচ্ছপ হইতে দূরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।"

বুদ্ধতত্ত্ব।—

আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের নিরীশ্বর কঠোর ধর্ম্মনীতি বৌদ্ধ সমাজে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। সে ধর্ম্ম যে যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সেই সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম ও রীতি নীতি আচার ব্যবহারের সহিত সম্মিশ্রণে নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই আদিধর্ম্ম কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোথায় কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে,—নেপালে শৈব শাক্ত তান্ত্রিক ধর্ম্মে মিশিয়া একরূপ, তিব্বতে যাদু ভূত প্রেতে বিশ্বাস-মিশ্রিত অন্যরূপ, এক ঐতিহাসিক বুদ্ধ হইতে অগণ্য কাল্পনিক বুদ্ধের সৃষ্টিপ্রণালীই বা কিরূপ—সে এক অপূর্ব্ব কথা। তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়, আর ঐ গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহও সামান্য পরিশ্রম ও গবেষণার কার্য্য নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যেমন স্বয়ং নেপালে অবস্থিতি করিয়া তথাকার পুরাতন পুঁথি অন্বেষণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মত শ্রম, অধ্যবসায় ও স্থানীয় গবেষণা ভিন্ন ওরূপ কার্য্যে ফললাভ করা অসম্ভব। সে যাহা হউক, এই স্থলে বুদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল গুটিকতক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধ-কাহিনী সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক বিষয় বলিবার আছে, তাহা বলিয়া রাখি। সেটি এই যে, খৃষ্টীয় সেণ্ট্ মণ্ডলীর মধ্যেও বুদ্ধদেবের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সেণ্ট জোসাফৎ।—

জোশয়স নামে একজন গ্রীক গ্রন্থকার 'বার্লাম ও জোসাফৎ' বলিয়া গ্রীক ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সে উপাখ্যানটী বুদ্ধচরিতের অবিকল চিত্র। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা ঐ জোসাফৎকে' আপনাদের সেণ্ট্‌রূপে আত্মসাৎ করিয়া লন, এমন কি, ৩০শে নবেম্বর তাঁহার মৃত্যুর দিন বলিয়া পালিত হইয়া থাকে। তাঁহার এই উপাখ্যান নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এক সময়ে ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা মধ্যেও মহাসমাদরে পরিগৃহীত হয়। পরে জানা গেল এই জোসাফৎ বোধিসত্ত্বের নামান্তর,—ইনি আর কেহ নন, স্বয়ং বুদ্ধদেব। উল্লিখিত গ্রীক গ্রন্থকারের পিতা খালিফ আলমানসুরের একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন, সুতরাং তিনি অষ্টম খৃষ্টাব্দের লোক। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে, জাতক-ভাষ্য বা ললিতবিস্তর হইতে উহার অনেক কথা রচিত হওয়া সম্ভব। "অতএব অবনীমণ্ডলে বুদ্ধের মহিমা যেমন ব্যক্তভাবে, সেইরূপ অব্যক্তভাবেও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।"

বুদ্ধতত্ত্ব—হীনযান মত।—

হীনযান ও মহাযান, এই দুই শাখার মধ্যে বুদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিষয়টীর স্পষ্টীকরণ জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস আলোচনা করিবার সময় বলা হইয়াছে যে, ঐ ধর্ম্মে ভজন পূজনের কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম চা'ন সাধন। বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ এই যে, আত্ম-প্রভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়া অন্তঃকরণকে কাম, ক্রোধ, দ্বেষহিংসা মদমাৎসর্য্য হইতে বিনির্মুক্ত কর, তাহা হইলেই স্বর্গাৎ স্বর্গে আরোহণ করত যাত্রার চরম সীমা যে নির্ব্বাণ, সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে। নির্ব্বাণে উঠিবার চারি ধাপ ও পথের বিঘ্নকারী দশ 'সংযোজন', বন্ধন বা শৃঙ্খল* আছে। এক এক ধাপে উঠিতে উঠিতে এই শৃঙ্খলগুলি কিয়ৎ

* দশ সংযোজন (শৃঙ্খল):—

১। সকায় দৃষ্টি, অহমিকা

২। বিচিকিৎসা, সংশয়

৩। শীলব্রত, কর্ম্মকাণ্ডে আস্থা

পরিমাণে খসিয়া যায়। যিনি প্রথম ধাপে উঠিয়াছেন, তিনি 'সোতাপন্নো' (স্রোত-আপন্ন), মনুষ্যের নীচে পশ্বাদি যোনিতে তাঁহার জন্ম হয় না। দ্বিতীয় ধাপে কতকগুলি শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, যিনি সেই ধাপে চড়িয়াছেন তিনি আরো উন্নত, তথাপি সংসার-বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহাকে আর একবার ফিরিতে হইবে, তিনি সকৃৎ আগামী। তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিলে কাম ক্রোধ বিচিকিৎসা প্রভৃতি পঞ্চ বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ হয়, তখন সাধক 'অনাগামী' পদ লাভ করেন, তাঁহার এই মর্ত্ত্যলোকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। এই হ'চ্ছে তৃতীয় ধাপ। যিনি চতুর্থ সোপানে আরোহণ করেন, তাঁহার সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়—জন্মান্তর-স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভ হয়, তখন তিনি জীবন্মুক্ত অর্হৎ.

প্রত্যেক বুদ্ধ।—

অর্হতেরা হাজার হোক অপূর্ণ জীব। আধ্যাত্মিক জগতে ইঁহাদের নূতন পাখা উঠিয়াছে, ইঁহারা সবেমাত্র উড়িতে শিখিয়াছেন। ইঁহাদের লক্ষ্যস্থান, গম্যস্থান এখনো বহু দূর। বুদ্ধ এবং ইঁহাদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। যে মহাত্মারা ইঁহাদের অপেক্ষাও জ্ঞানধর্ম্মে উচ্চতর পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রত্যেক বুদ্ধ, অর্থাৎ তাঁহারা নিজ নিজ সাধনা ও পুণ্যগুণে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন, অথচ লোক-মাঝে সেই জ্ঞান বিতরণে অক্ষম। তাঁহারা প্রত্যেকে আপনার মহিমাতেই আপনি বিরাজ করেন। মহাবুদ্ধের সহিত প্রত্যেক বুদ্ধের তুলনা হয় না। মহাবুদ্ধের আবির্ভাব কালে পৃথিবীতে তাঁহাদের আবির্ভাব হয় না। আর তাঁহারা তথাগত, সিদ্ধার্থ, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বুদ্ধ-উপাধি ধারণের যোগ্য নহেন।

বোধিসত্ত্ব।—

প্রত্যেক বুদ্ধের উপরের শ্রেণীতে বোধিসত্ত্বকে স্থাপন করা যাইতে পারে।

৪। কাম

৫। প্রতিঘ, ক্রোধ

৬। রূপরাগ, বিষয়কামনা

৭। অরূপরাগ, স্বর্গ-কামনা

৮। মান, অভিমান মদ মাৎসর্য্য

৯। ঔদ্ধত্য

১০। অবিদ্যা

তিনি অব্যক্ত বুদ্ধ। বোধিসত্ত্বের ভিতরে ভিতরে বুদ্ধত্বের বীজ নিহিত আছে, কালক্রমে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বুদ্ধত্বে পরিণত হয়। বুদ্ধেরা পূর্ব্বজন্মে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, এবং ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ সত্যধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করিতে উদয় হইবেন, তিনি এইক্ষণে বোধিসত্ত্বরূপে বিরাজমান।

বুদ্ধদেব।—

এই সপ্ততল গৃহের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় স্বয়ং বুদ্ধদেব আসীন। ইনিই সঙ্ঘ-স্থাপয়িতা সম্যক্-সম্বুদ্ধ সাক্ষাৎ ভগবান। ইনি এবং ইঁহার সমতুল্য আর আর বুদ্ধ নষ্টধর্ম্ম উদ্ধারের নিমিত্ত, লোকপরিত্রাণের নিমিত্ত, সুরনরের কল্যাণ উদ্দেশে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েন।

হীনযান মতে গোতম বুদ্ধের পূর্ব্বে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্বিংশতি বুদ্ধ উদয় হইয়াছেন, —বর্ত্তমান কল্পে তার মধ্যে চার জন। গোতম শেষ বুদ্ধ; ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপ, এই তিন বুদ্ধ তাঁহার অগ্রবর্ত্তী। করুণা ও মৈত্রীগুণের আধার যে মৈত্রেয়, তিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধরূপে উদয় হইবেন, এখনো তার কাল-বিলম্ব আছে। ৫০০০ বৎসর পরে যখন লোকেরা নীতিভ্রষ্ট হইবে, গোতমের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই বিশ্ববিজয়ী মহাবীর জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত অভ্যুদিত হইবেন। তাঁহার সে দিগ্বিজয় সৈন্য সামন্ত অস্ত্রবলে নয়, ধর্ম্ম ও প্রেমবলে। মৈত্রেয়ী এইক্ষণে বোধিসত্ত্বরূপে তুষিত স্বর্গে বাস করিতেছেন। সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'বুদ্ধ বংশে, গোতম ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ বুদ্ধের জীবনবৃত্ত বর্ণিত আছে, এবং জাতক-ভাষ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকের আরো বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হীনযান শাস্ত্র এইখানেই থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের চারি বুদ্ধ, এবং বোধিসত্ত্ব লইয়াই হীনযানীরা সন্তুষ্ট। অর্হৎ তাঁহাদের আদর্শ-সাধু, সাধুত্বের আরো উচ্চ স্তরে উঠিতে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই।

বুদ্ধতত্ত্ব। মহাযান মত—

মহাযানগ্রন্থে বৌদ্ধদের বুদ্ধ-কল্পনার আরো বিস্তৃত বিচিত্র গতি! হীনযানের সহিত ইঁহাদের বীজমন্ত্রে অনৈক্য নাই। ইঁহারাও বলেন মনুষ্য জ্ঞানধর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া, ভিক্ষু হইতে অর্হৎ, অর্হৎ হইতে বোধিসত্ত্ব হইতে পারেন। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জল দাঁড়ায় কোথায়? দু একটী বোধিসত্ত্ব গড়িয়া কেনই বা স্থির থাকিবে? অনেকানেক ভক্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া অর্হৎ হইয়াছেন—অনেকানেক অর্হৎ বোধি-সত্ত্ব পদে উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা কি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র নহেন? এই মতের অব্যর্থ পরিণাম

নর-দেবতা পূজা—এবং এই পূজায় মহাযানীরা সিদ্ধহস্ত। এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য বোধিসত্ত্ব মহাযানীদের আরাধ্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বুদ্ধের প্রথম দুই শিষ্য সারীপুত্র ও মুদ্গলায়ন; কাশ্যপ আনন্দ উপালি প্রভৃতি সঙ্ঘের পিতামহগণ; গৌতম ও রাহুল, মহাযানীদের প্রধান আচার্য্য নাগার্জ্জুন, আচার্য্য অশ্বঘোষ—এইরূপ কত কত সাধু সজ্জনকে তাঁহারা বোধিসত্ত্ব পদে তুলিয়া পূজা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু তা নয়—এদিকে যেমন মানুষী বোধিসত্ত্ব, তেমনি আবার গুণাত্মক ধ্যানাত্মক নানা ধরনের কাল্পনিক বোধিসত্ত্ব নির্ম্মিত হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ আর মৈত্রেয়ী বুদ্ধের আবির্ভাব, এই দুয়ের মধ্যকালে মনুষ্যের ত আরাধ্য দেবতা চাই, বৌদ্ধসঙ্ঘের রক্ষাকর্ত্তা আবশ্যক,—বোধিসত্ত্বেরা এই অভাব পূর্ণ করিতেছেন। আর এক লাভ এই যে, বোধিসত্ত্ব পদলাভের আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যের মনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকতর উৎসাহ সঞ্চার হইতেছে। বোধিসত্ত্বের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। ইহাঁরা তুষিত স্বর্গে দিব্য আরামে কাল-হরণ করিতেছেন। পরিনির্ব্বাণে নিবিয়া যাওয়া অপেক্ষা ইহাঁদের স্বর্গকামনা বোধহয় যেন বলবত্তর, সুতরাং ইহাঁরা নির্ব্বাণ-পথ খুঁজিয়া বেড়াইবার কষ্ট ভোগ অপেক্ষা, যেমন সুখে আছেন তেমনি থাকিতেই ভালবাসেন।

বোধিসত্ত্বের বেলায় মহাযানীরা যেমন কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুদ্ধ বিষয়েও সেইরূপ। হীনযানীরা বুদ্ধসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ জন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কেন? তোমরা স্বীকার করিতেছ লোকপরিত্রাণার্থ যুগে যুগে বুদ্ধোদয় হইয়া থাকে। তবে ২৫ কেন,—কত কত লোকে, কত যুগে, কত শত বুদ্ধের অভ্যুদয় হইয়াছে, কে বলিতে পারে? কেন না,

"কালোহয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"

কালের নাহিক সীমা, বিপুলা ধরণী।

মহাযান মতানুসারে সমুদায়ে কত বুদ্ধ, স্থির করা কঠিন। হজ্‌সন সাহেব ললিতবিস্তর ও অপরাপর গ্রন্থ হইতে ১৪৩ জন তথাগতের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন।

শুধু বুদ্ধ-সংখ্যা নয়, ক্রমে বুদ্ধস্বরূপেরও অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্ত্তনের প্রণালী আমার যাহা সঙ্গত মনে হয়, তাহা এই—

বুদ্ধদেব আপনাতে কখনই ঐশীশক্তি আরোপ করেন নাই; এমন কি, শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরবিষয়ক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিরুত্তর থাকাই শ্রেয়বোধে মৌনাবলম্বন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। তিনি

তাঁহার ধর্ম্ম এবং তাঁহার সঙ্ঘ, মৃত্যুর সময় এই দুইকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া গেলেন। কিন্তু পৃথিবী হইতে যেমন তিনি অপসৃত হইলেন, তাহার কিয়ৎ পরে বৌদ্ধেরা তাঁহাকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিল—মনুষ্য-বুদ্ধকে দেবতা-বুদ্ধ গড়িয়া তুলিল। তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা,—পূর্ব্বজন্ম-কাহিনী, স্বর্গ হইতে অবতরণ, গর্ভে বাস, জন্ম, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনের লীলাখেলা, মহাভিনিষ্ক্রমণ, তপশ্চর্য্যা, মারের সহিত সংগ্রাম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, ধর্ম্মপ্রচার, নির্ব্বাণ,—ইহার প্রত্যেকটিতে ইন্দ্রজালে সংগঠিত হইল। এই গেল প্রথমাবস্থা। পরে ভাবিবুদ্ধ যে মৈত্রেয়, তাঁহার পূজাও প্রবর্ত্তিত হইল। বুদ্ধদেব ত পরিনির্ব্বাণগত হইয়াছেন, যাইবার সময় তিনি মৈত্রেয়কেই আপন উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। মৈত্রেয় এখন জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, তাঁহার প্রসাদলাভ ভক্তের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। তিনি করুণার সাগর, সৌন্দর্য্যের সার, প্রিয়দর্শী, মধুরভাষী; তাঁহার তুষিত স্বর্গে গিয়া ভক্তেরা তাঁহার স্বরূপ দর্শন, মধুর বাণী শ্রবণ, তাঁহার সহবাসজনিত আনন্দ সম্ভোগ, এই জন্য লালায়িত; উত্তর দক্ষিণ উভয় সম্প্রদায়ী বৌদ্ধেরাই তাঁহাকে মানিয়া চলিতেছে। অনেকানেক সিংহল বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধ ও মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি পাশাপাশি অবস্থাপিত। হুয়েন সাং ও তাঁহার পূর্ব্বাপর অন্যান্য ভক্তেরা মৃত্যুশয্যায় মৈত্রেয়ের তুষিত স্বর্গলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন।

অতঃপর আমরা আর এক চিত্র দেখিতে পাই,—এক হইতে তিনে গিয়া পড়ি, মৈত্রেয় ছাড়া তিন বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব দেখি। তাঁহাদের নাম—

১। মঞ্জুশ্রী অথবা বাগীশ্বর
২। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর
৩। বজ্রপাণি কিনা শক্তিরূপী মহেশ্বর

এই জ্ঞান শক্তি মঙ্গলের আধার বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি কালক্রমে কল্পিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের আদি যুগে ইঁহাদের নাম শুনা যায় না, ললিতবিস্তর প্রভৃতি উত্তর-শাখার প্রাচীন গ্রন্থেও ইঁহাদের নাম নাই, যদিও সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক ও আর কতকগুলি গ্রন্থে ইহাদের কথা পাওয়া যায়, আর ফাহিয়ানের তীর্থযাত্রার সময় এই ত্রিদেবতার অর্চ্চনা কোন কোন বৌদ্ধক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, তাহাও দেখা যায়। তিনের অঙ্কে কি এক মোহিনীশক্তি আছে, তাহার আদর সর্ব্বত্রই; বিশেষতঃ আমাদের দেশে ত্রয়ীবিদ্যা, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ত্রিলোক, ত্রিকাল, ত্রিমূর্ত্তি—অনেক জিনিসেই ত্রিত্ব আসিয়া পড়ে; এমন কি, পরব্রহ্ম যিনি তিনিও সৎ-চিৎ-আনন্দ ত্রিগুণাত্মক। বৌদ্ধদের মধ্যেও এই তিনের গৌরব রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম, বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিরত্ন—পরে মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি ত্রিদেব। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই তিন দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরই রূপান্তর। মঞ্জুশ্রী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম, বাগীশ্বর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—এই ত গেল ব্রহ্মা-সরস্বতী। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বিষ্ণু, তাহাতে বিষ্ণুর পালনীশক্তি আরোপিত। বজ্রপাণি বজ্রধর ইন্দ্র অথবা শূলপাণি মহেশ্বর, সর্ব্বশক্তির মূলাধার। বোধিসত্ত্ব-শ্রেণীর মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের বিশেষ মাহাত্ম্য। তিনি করুণার্ণব, লোকপাল, সকলের শরণ্য সম্ভজনীয় দেবতা রূপে বর্ণিত। ফাহিয়ান, হুয়েন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বৌদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পূজার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। তাঁহারা নিজেও যে ঐ দেবতার পরম ভক্ত ছিলেন, তাহারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। ফাহিয়ান বলেন সমুদ্রে একবার ঝড় উঠিয়া তাঁহার জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তিনি অবলোকিতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া রক্ষা পাইলেন। চীন ও জাপানে অবলোকিতেশ্বরের করুণাময়ী নারীপ্রকৃতি ক্বান্‌ইন এবং ক্বানন্ নামে অর্চ্চিত হয়।

ইহার উত্তরকালে একপ্রকার ধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি হইল। ধ্যানীবুদ্ধ মনুষ্যবুদ্ধের অশরীরী প্রকৃতি, তাঁহারা অরূপ-লোকে বাস করেন। পঞ্চ অরূপ-লোকের অধিষ্ঠাতা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকে ধ্যানপ্রভাবে আত্মস্বরূপ হইতে এক একটী বোধিসত্ত্ব উৎসৃষ্ট করেন, আবার প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে রূপলোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইক্ষণে চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অধিকার যাইতেছে,—আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই।

এই বহুদেবতার পূজায় পরিতৃপ্ত না হইয়া বৌদ্ধেরা ক্রমে এক আদিদেবে গিয়া পৌঁছিলেন, ইনি নিত্য, নিরাকার, ন্যায় ও করুণার আধার, জ্ঞানময় আদি বুদ্ধ—ইনিই পরব্রহ্ম। নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে দশম শতাব্দে এই আদি বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। আদি বুদ্ধ ইচ্ছানুসারে আত্মস্বরূপ হইতে অন্য পাঁচটী ধ্যানীবুদ্ধ উৎপন্ন করেন। তাঁহারা আবার পাঁচটী বোধিসত্ত্বের জন্মদাতা। এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ, পঞ্চ বোধিসত্ত্ব এবং গৌতম, মৈত্রেয় প্রভৃতি পঞ্চ মানুষী বুদ্ধসম্বলিত এক অপূর্ব্ব ত্রিপঞ্চক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

ধ্যানীবুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব	মানুষীবুদ্ধ
১ বিরোচন	১ সামন্তভদ্র	১ ক্রকুচ্ছন্দ
২ অক্ষোভ	২ বজ্রপাণি	২ কনকমুনি
৩ রত্নসম্ভব	৩ রত্নপাণি	৩ কাশ্যপ

৪ অমিতাভ ৪ অবলোকিতেশ্বর ৪ গৌতম

৫ অমোঘ সিদ্ধি ৫ বিশ্বপাণি ৫ মৈত্রেয়

দেখিবেন ইঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক বুদ্ধ একমাত্র গৌতম, আর সকলেই মন-গড়া কাল্পনিক বুদ্ধ। এই প্রত্যেক পঞ্চকের চতুর্থ দেবতাই বাছিয়া বাছিয়া লইবার যোগ্য। বাছিয়া বাছিয়া যে তিন দেবতা বৌদ্ধদের বিশেষ পূজার্হ হইয়াছেন, তাঁহারা হচ্ছেন ১। অমিতাভ, ২। অবলোকিতেশ্বর, ৩। গৌতম। গোড়ায় অপরিমিত জ্যোতিঃ অমিতাভ, মধ্যে তাঁহার অধ্যাত্ম-সুত, শেষে তাঁহার ছায়াময়ী প্রকৃতি। ধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে কি জানি কেন মঞ্জুশ্রী স্থান পায় নাই। আপাততঃ ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে বৌদ্ধজগতের কোন কোন ভাগে অমিতাভই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। মহাযান শাস্ত্র তাঁহার 'সুখাবতী' স্বর্গ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সে স্বর্গ মহম্মদী স্বর্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের স্থান নয়, তাহা ধ্যানস্থ মুনিঋষির আশ্রম তুল্য। সেখানে 'হুরী' অপ্সরাগণ তাহাদের মায়াজাল বিস্তার করে না, সেই অরূপ-লোকে জ্যোতির্ম্ময় ধ্যানী বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া ধ্যানানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

সহজ সত্য ছাড়িয়া কল্পনায় ঈশ্বর গড়িতে গেলে মনুষ্য-কল্পনা যে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যায়।

তান্ত্রিক মত প্রচার।—

মহাযান মতের উৎপত্তি ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরখণ্ডে ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মিশ্রণ আরম্ভ হয়, এই যে বলা হইল—নেপাল তাহার মুখ্য দৃষ্টান্তস্থল। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে সেদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের যে ধর্ম্ম প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক, নেপালী বৌদ্ধেরা সেই তান্ত্রিক পদ্ধতি নিজ ধর্ম্ম মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহারা শিব শক্তি গণেশ, কুমার ভৈরব হনুমান, রুদ্র মহারুদ্র, মহাকাল মহাকালী, অজিতা অপরিজিতা, উমা জয়া চণ্ডী, খড়গহস্তা, ত্রিদশেশ্বরী, ইন্দ্রী কপালিনী কম্বোজিনী, ঘোরী ঘোররূপ মহারূপা, মালিনী কপালমালা, খট্টাঙ্গা পরশুহস্তা বজ্রহস্তা, মাতৃকা যোগিনী পঞ্চডাকিনী, যক্ষ গন্ধর্ব্ব গৃহদেবতা, ভূত পিশাচ দৈত্য প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত দেবদেবীগণকে স্ব-সম্প্রদায়ের স্থান দান করিয়াছেন। কেবল তন্ত্রোক্ত দেবাদি গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তন্ত্র শাস্ত্রের মন্ত্রাদি এবং সাঙ্কেতিক আঁকজোঁকও গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রিয়াস্থলে তন্ত্রোক্ত যন্ত্রমণ্ডল অঙ্কিত করিবার রীতি আছে। হিন্দু ক্রিয়াতে হিন্দুদেবতারই মণ্ডল

করা হয়। বৌদ্ধ ক্রিয়াতে বুদ্ধমণ্ডলও অঙ্কিত হইয়া থাকে। নেপালী বৌদ্ধেরা শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে অষ্টমী ব্রত নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। প্রথমে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, দিকপাল প্রভৃতির পূজার পর উল্লিখিত দেবদেবীর আহ্বান ও অর্চ্চনা হইয়া থাকে। (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত।)

নেপালের এই তান্ত্রিকমতের আদিগুরু পেশোয়ার-নিবাসী অসঙ্গ নামক একজন সন্ন্যাসী। ইনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া "যোগাচার ভূমি শাস্ত্র" ও যোগ-দর্শন সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ লিখিয়া উক্ত দর্শনের বহুল প্রচার করেন। হুয়েন সাং তাঁহার মঠের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যান। তিনি শৈব দেবদেবী, ভূত, পিশাচ, বৌদ্ধধর্ম্মে মিলাইয়া সেই পার্ব্বত্য অধিবাসীদের উপাদেয় এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী প্রস্তুত করেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রভাবে নেপালীদের মধ্যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত শৈব ও শাক্ত দেবদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হয়, এবং তাঁহারা বুদ্ধদেবের সরল নীতিমার্গ ছাড়িয়া অলৌকিক সিদ্ধিলাভ মানসে, ধারণী মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মঠ মন্দিরে এই সকল তান্ত্রিক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

নেপাল ভোট সিকিম ঐ সকল প্রদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন পৌরাণিক তান্ত্রিক সংস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তিব্বতের ধর্ম্মও অন্যান্য কারণে অশেষ কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। জপমালায় মন্ত্র উচ্চারণ তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের এক প্রধান অঙ্গ বিবেচনা করেন; শব্দসংখ্যার উপর পুণ্যের ফলাফল নির্ভর করে, যতবার আবৃত্তি ততই বেশী পুণ্য। আরাধনার সময় যেমন সমস্বরে শ্লোকাবৃত্তির নিয়ম আছে, তেমনি আবার ভিন্ন ভিন্ন বচন অনেকে মিলিয়া একত্রে পাঠ করিয়া থাকেন—অল্প সময়ের মধ্যে যত অধিক শব্দ উচ্চারিত হয় ততই ভাল। এই সকল বৌদ্ধের প্রার্থনা-মন্ত্র হচ্ছে—

*** ওঁ মণি পদ্মে হুঁ।**

এ প্রার্থনা-অঙ্কিত চক্রধ্বজাদি যেখানে যাও চারিদিকে ছড়াছড়ি। "পদ্মে

---

* হৃৎপদ্মে ধর্ম্মের মণি। কেহ বলেন, পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রার্থনা মন্ত্র রচিত।

এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ধর্ম্মপাল মহাশয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন।

মণি" এই দুই শব্দের যে কি নিগূঢ় অর্থ তাঁহারাই জানেন, এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে এই প্রার্থনায় দেবতার প্রসন্নতা লাভ ও মহাপুণ্য উপার্জ্জন হয়। এই উদ্দেশে তাঁহারা অগণ্য অগণ্য প্রার্থনা-চক্র নগরে নগরে গ্রামে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে স্থাপন করেন, পথযাত্রীরা তাহা একবার ঘুরাইয়া প্রার্থনার ফললাভ করেন। কল ফিরাইয়া প্রার্থনা করা, তিব্বতীরা এই এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চক্র ঘোরানো লইয়া অনেক সময়ে দুই প্রতিযোগী ভক্তদলের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। জনকত ফরাসী খৃষ্ট মিশনরি এই বিষয়ে এক মজার গল্প করেন। একদিন তাঁহারা এক মঠের নিকটস্থ একটী প্রার্থনা-চক্রের কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দুই জন লামার মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত। ব্যাপারখানা এই যে, তাঁহাদের একজন চাকা ঘুরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছেন, মুখ ফিরাইয়া দেখেন আর একজন লামা সে চাকা থামাইয়া নিজের খানায় পুণ্যের আঁক পাড়িবার অভিপ্রায়ে চাকা ঘুরাইয়া দিতেছে—দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ পিছু ফিরিয়া তার চাকা বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার আপনি ফিরাইয়া দেয়। এ বলে আমি ঘুরাইব, আমার চাকায় তুমি কেন হাত দেও? ও বলে আমি ঘুরাইব, তুমি কেন হাত দেও? ক্রমে উভয়তঃ গালাগালি, গালাগালি হইতে মারামারি। অবশেষে একজন বৃদ্ধ লামা বিবাদস্থলে আসিয়া উভয় পুণ্যেচ্ছুর কল্যাণার্থ স্বহস্তে চাকা ঘুরাইয়া উহাদের কলহ মিটাইয়া দেয় (Buddhism—Monier Williams.)

প্রার্থনা-চক্র ভিন্ন ঐ সকল প্রদেশে প্রার্থনার নিশান উড়িতে দেখা যায়—বোধ করি দার্জিলিং পাহাড়ে ঐ দৃশ্য অনেকে দেখিয়া থাকিবেন; নিশান বাতাসে উড়িয়া যেমন আকাশাভিমুখে যায়, ভক্তজন অমনি মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্য উপার্জ্জন করেন।

লামাধর্ম্ম।—

তিব্বতী বৌদ্ধদের আচার অনুষ্ঠান মত ও বিশ্বাস, মূল ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন বিষয়েই মিল নাই; উহাদের পৌরোহিত্য-প্রধান জনসমাজও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। তিব্বতী ভিক্ষুর নাম লামা, জনপদের প্রায় পঞ্চমাংশ এই লামা শ্রেণীভুক্ত। লামাদের মধ্যে দুই জন প্রধান লামা, দালাই লামা এবং পঞ্চন লামা; একটীর রাজধানী লহাসা, অন্য লামার মঠ ভারতের প্রান্তসীমার অদূরবর্ত্তী তাসি-লুন্পো নামক নগরে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান লামারা বুদ্ধাবতার বলিয়া পূজিত। লোকের বিশ্বাস এই যে, ইহাঁদের কাহারও মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রেতাত্মা কোন একটী শিশু অথবা ছোট বালকে প্রবেশ করে,—এই

বালকটীকে চিনিয়া বাহির করাই এক সমস্যা। কখন কখন মৃত লামা মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া যান কোন্ কুলে তিনি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবেন; কখন বা দুই লামার মধ্যে যিনি জীবিত, তিনি মৃত লামার উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া দেন; কখন বা দৈবজ্ঞের পরামর্শ, শাস্ত্রের বিধান ও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা মঠাধিকারী লামা নিরূপিত হয়। এই নির্ব্বাচনে চীনরাজেরও মতামত গৃহীত হইয়া থাকে। নবাবতার আবিষ্কৃত হইলে লামামণ্ডলীর কাছে আনিয়া তাঁহার পরীক্ষা হয়; তিনি মৃত লামার গ্রন্থ বস্ত্রাদি চিনিয়া বলেন, ও তাঁহার পূর্ব্বজীবনের ঘটনা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ মহালামা মহাধুমধামে নিজ মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

দালাই লামা আদি বুদ্ধের প্রতিনিধি; তাঁহাকে বৌদ্ধ 'পোপ' বলা অসঙ্গত হয় না। অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে (১৪১৯এ) তিব্বতে দালাই লামার আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই লামা বিদেশীদের চক্ষে আকাশ-কুসুমের ন্যায় দুর্লভ দর্শন। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে কয়েক বৎসর হইল (১৮৮২) আমাদের খ্যাতনামা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস এই লামার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এ ঘটনাটি আমাদের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ শরৎবাবুর ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণিত আছে। মোনিয়র উইলিয়ম্‌সের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' গ্রন্থে ৩৩১ পৃষ্ঠায় তাহার সারভাগ সন্নিবেশিত হইয়াছে। লামার প্রাসাদ-মঠ লহাসার উত্তর-পশ্চিম পোতালায় অবস্থাপিত। ইহা এক প্রকাণ্ড উচ্চ চৌতালা গৃহ, দশ সহস্র ভিক্ষুর বাসোপযোগী কক্ষরাজিতে সুসজ্জিত; ইহার শিখরদেশ স্বর্ণচূড়ায় বিভূষিত। সিঁড়ির পর সিঁড়ি উঠিয়া পরিব্রাজক মহাশয় লামা-মঞ্চে আরোহণ করিলেন, সেই লোহিত প্রাসাদের উচ্চ শিখর হইতে লহাসা নগরী ও তাহার আশপাশের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহার নয়ন-মন মুগ্ধ হইল। মহালামা ৮ বৎসরের বালক, বক্র চক্ষু ছাড়া মুখশ্রী আর্য্যাকৃতি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, রঙ্গীণ রেশম-মণ্ডিত সিংহাসনে দুই সিংহমূর্ত্তি মাঝে উপবিষ্ট। দেহোপরি গৈরিক বসন, মাথায় পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের নিদর্শনস্বরূপ পঞ্চকোণ পীতবর্ণ টোপর। প্রাচীরের গায়ে বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের চিত্রাবলী, জাফ্রাণ রঞ্জিত আরক্ত শান্তিজল সিঞ্চন, ধূপধুনা দীপালোকে আনুষ্ঠানিক ঘটার সীমা নাই। দর্শকমণ্ডলীর জন্য নীচে নয় পঙ্‌ক্তিতে সারি সারি পশমের আসন বিছানো, সকলে শান্ত সংযতভাবে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন। শরৎবাবুর আসন তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে। পরে আশীর্ব্বাদের সময় আসিলে দর্শকবৃন্দ মাথা হেঁট করিয়া সিংহাসনের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল। শরৎবাবু

বলিতেছেন—"যখন আমার পালা আসিল মহাপ্রভু আমাকেও আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন আমি তাঁহার দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার সুযোগ পাইলাম।" এই বিবরণে পোপের পদাঙ্গুলি চুম্বনের ন্যায় কোন অনুষ্ঠানের আভাস নাই। এই অনুষ্ঠানের এক প্রধান অঙ্গ—চা-পান। লামারা সকলেই এক এক চায়ের পেয়ালা আপন বস্ত্র মধ্যে গচ্ছিত রাখেন। প্রথমে একজন পরিচারক মহালামার স্বর্ণ পাত্রে চা ঢালিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল, পরে দর্শকগণের পাত্র পূর্ণ হইলে তাঁহারা তিনবার পাত্র নিঃশেষ করিয়া নিঃশব্দে পান করিলেন, পরে শূন্য পেয়ালা বক্ষের পকেট-জাত করিলেন। তৎপরে একটী তণ্ডুলপূর্ণ স্বর্ণথাল মহালামার সম্মুখে আনীত হইল, তিনি তাহা স্পর্শ করিয়া দিলে সেই মহাপ্রসাদ দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল। পরিশেষে বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ, এই ত্রিরত্নের নামে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণের পর দরবার ভঙ্গ হইল। সভাস্থলে একজন লামা, যিনি শরৎবাবুর পাশে বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার কানে কানে কহিলেন—"তুমি পূর্ব্বজন্মে না জানি কি পাপ করিয়া এমন দেশে জন্মিয়াছ যেখানে জীবন্ত বুদ্ধ নাই!"

তিব্বতের দালাই লামার অধিকার ধর্ম্মরাজ্যেই আবদ্ধ, অথবা এই সঙ্গে তাঁহার কোন রাজকীয় ক্ষমতা সম্মিশ্রিত, এ বিষয় লইয়া এইক্ষণে অনেক স্থানে অনেক কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি রুষ সম্রাটের নিকট তাঁহার যে দৌত্য গিয়াছে তাহাই এই সমস্ত তর্কবিতর্কের মূল, এবং তাহা হইতে আমাদের রাজপুরুষদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। মেষ-ভল্লুকে মিত্রতা-বন্ধনের চেষ্টা দেখিলে লোকের মনে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। "উনবিংশ শতাব্দী" সংবাদ পত্রে একজন ইংরাজ লেখক দালাই লামাকে বশ করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৃষ্ণা জিলায় যে বুদ্ধদন্তাদি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা উপহার দেওয়া বেশ একটী লামা-বশীকরণ মন্ত্র। আমাদের বিবেচনায় আর কোন উপায় চিন্তা করা আবশ্যক, যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে কোন ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সং খাপা নামক একজন ধর্ম্মসংস্কারক উঠিয়া গাল্‌ডানে এক প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মাণ করেন। এই লামার মৃত্যুর পর ইঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এক দীপাবলির উৎসব প্রবর্ত্তিত হয়। ইনিও বুদ্ধাবতার বলিয়া পূজিত এবং বৌদ্ধ মন্দিরে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি দালাই ও পঞ্চন লামা-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। এ ভিন্ন আরো কয়েক জন লামাগ্রগণ্য

মহালামা আছেন, যথা মোঙ্গোলিয়ার কুরুণ, তাতারের কুকু, পেকিনের মহালামা, ভোটের ধর্ম্মরাজ, (যাঁহার উপাধিচ্ছটা আবৃত্তি করিতে কণ্ঠরোধ হয়) —"বুদ্ধশ্রেষ্ঠ, দেবাবতার, শাস্ত্রজ্ঞানে অনুপম, বিদ্যায় সরস্বতীসম, পাপহরণ, দানব-মর্দ্দন, নীতি-নিপুণ, সর্ব্বধর্ম্মশিরোমণি রাজাধিরাজ ধর্ম্মরাজ!" নামাবলীর গৌরবে ইনি গৌতম বুদ্ধকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন।

স্বর্গ নরক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে স্বর্গ নরক কল্পনা এইরূপ।—

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড চক্রাবালে পরিপূরিত। প্রত্যেক চক্রাবালে ছয় প্রকার জীবের বাসযোগ্য ৩০টী সত্বলোক স্তরে স্তরে বিনির্ম্মিত, তাহাদের মধ্যভাগে সুমেরু পর্ব্বত। পাতালে ১৩৬ নরক বিভিন্ন-জাতীয় পাতকীকুলের জন্য নির্ম্মিত, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধদ্বেষ্টাদের জন্য 'অবীচি' নরক সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। নরকবাস সুদীর্ঘকাল হইলেও অনন্ত নরকভোগের বিধান নাই। নরকের উপরিভাগে কামলোক চার প্রকার—১। পশু-লোক, ২। প্রেত-লোক, ৩। অসুর-লোক, ৪। নর-লোক। তদুপরি ছয় দেব-লোক। প্রথম, চার মহারাজার (দিক্‌পালের) স্বর্গ—

পূর্ব্ব দিকে, গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র।
দক্ষিণে, কুম্ভাণ্ডরাজ বিরূধক।
পশ্চিমে, নাগাধিরাজ বিরূপাক্ষ।
উত্তরে, ধনপতি কুবের।

দ্বিতীয়, ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ ইন্দ্রের অমরাপুরী, যেখানে ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাদের সঙ্গে রাজত্ব করেন। বুদ্ধজননী মায়া-দেবীর মৃত্যুর পর বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে এই স্বর্গে আরোহণ করেন। তাহা ছাড়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বুদ্ধ নিজেই ইন্দ্র ছিলেন।

তৃতীয়, যমলোক।

চতুর্থ, তুষিত স্বর্গ, বোধিসত্ব ধাম, মৈত্রেয় যার অধিপতি।

পঞ্চম, নির্ব্বাণরতি স্বর্গ, সৃষ্টিকুশল দেবতাদের বাসগৃহ।

ষষ্ঠ পরনির্ম্মিত বাসবর্ত্তী স্বর্গ, এখানে যাঁহারা বাস করেন সৃজনকার্য্যে তাঁহাদের নিজেদের ক্ষমতা নাই, তাঁহারা অপর দেবগণের সৃষ্টি-ভণ্ডুলকরণে বিলক্ষণ পটু—বৌদ্ধ শয়তান "মার" এই লোকে বাস করেন। ছয় দেবলোকের তালিকা এই :—

ক

১। চতুর্মহারাজ স্বর্গ
২। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ
৩। যম স্বর্গ
৪। তুষিত স্বর্গ
৫। নির্ম্মাণরতি দেবগণের স্বর্গ
৬। পরনির্ম্মিত বাসবর্ত্তী স্বর্গ

এই ছয় দেবলোকের উপরিভাগে ১৬টী রূপলোক ধ্যানসিদ্ধ পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ; যথা—

খ

প্রথম ধ্যান—ব্রহ্মলোক

৭। ব্রহ্ম পরিসজ্জা
৮। ব্রহ্ম-পুরোহিত
৯। মহাব্রহ্ম

দ্বিতীয় ধ্যান—আভাময় লোক

১০। পরিত্তাভা
১১। অপ্রমাণাভা
১২। আভাস্বরা

তৃতীয় ধ্যান—শুভলোক

১৩। পরিত্ত শুভ
১৪। অপ্রমাণ শুভ
১৫। শুভ কৃৎস্ন

চতুর্থ ধ্যান—মহাযোগী স্বর্গ

১৬। বৃহৎ ফল
১৭। অসংজ্ঞাসত্ত্ব
১৮। অবৃহ
১৯। অতপা
২০। সুদর্শী
২১। সুদর্শন
২২। অকনিষ্ঠ

এই ১৬ রূপ-লোকের শিখরদেশে চারিটি অরূপ-লোক, অশরীরী ধ্যানী বুদ্ধদের আবাস-স্থান।

অরূপ লোক

২৩। আকাশ আয়তন

২৪। বিজ্ঞান আয়তন

২৫। আকিঞ্চন্য আয়তন

২৬। নৈব সংজ্ঞা অসংজ্ঞায়তন

অভিধর্ম্ম মতে অরূপ লোকের সংখ্যা পাঁচ। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ এক এক জন করিয়া পঞ্চ অরূপ লোকের অধীরশ্বর। অতএব বৌদ্ধ স্বর্গ নরক সংক্ষেপে এই। বৌদ্ধ মতে জীব ছয় প্রকার—

১ দেবতা, ২ মানব, ৩ অসুর, ৪ পশু, ৫ প্রেত, ৬ নারকী। এই সমস্ত জীবের জন্য ৪ কামলোক, ৬ দেবলোক, ১৬ রূপলোক, ৪ অরূপ লোক, এবং ১৩৬ নরক অনন্ত আকাশে সুমেরু পর্ব্বতের উপর নীচে অবস্থাপিত।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়-ভেদ। দার্শনিক শাখা।—

যেমন আচার অনুষ্ঠানে, সেইরূপ দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারেও বৌদ্ধজগতে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধেরা অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, যথা—মহাসাঙ্ঘিক, স্থবির, এক ব্যবহারিক, চৈতন্যবাদ, সর্ব্বাস্তিবাদ, বাৎস্য-পুত্রীয়, কাশ্যপীয়,—এইরূপ নানা মুনির নানা মত প্রচারিত হয়। হুয়েন সাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং সিংহল গ্রন্থাবলীতে এই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহাদের কোনটি মহাযান, কোনটি হীনযান শাখাশ্রিত। প্রাচীন গ্রন্থে এই যে সম্প্রদায় সমূহের নাম দেখা যায়, ইহাদের কোন শাখা আধুনিক বৌদ্ধসমাজে বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। বৌদ্ধদের মধ্যে এইরূপ মতান্তর ঘটিয়া ক্রমে চারিটি দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে এই চারি মতের নামোল্লেখ আছে,—যথা মাধ্যমিক, যোগাচার, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। মাধ্যমিক দর্শন একপ্রকার বৌদ্ধ মায়াবাদ বলিলেই হয়। ইহার মতে সকল পদার্থই মায়া, নির্ব্বাণও মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। যোগাচার দর্শনের মতে বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য পদার্থ, আর সকলি মিথ্যা; এই মতের অপর নাম বিজ্ঞানবাদ। বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং আলয়-বিজ্ঞান। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার নাম প্রকৃতি-বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞানধারা বা জ্ঞানসমষ্টির নাম আলয়-বিজ্ঞান। জ্ঞানসমূহ নানা প্রকার;—কালিক জ্ঞান, দৈশিক জ্ঞান, বস্তু প্রতিবিকল্প জ্ঞান; এই সমস্ত জ্ঞানের যোগাযোগে নিখিল পদার্থের উৎপত্তি

হইয়া থাকে। ঐ ধারাবাহিক জ্ঞানই 'অহং' বা আত্মা। যেমন অসংখ্য জলকণার সমষ্টি ভিন্ন নদী নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, সেইরূপ জ্ঞানসমষ্টিই আত্মা, 'অহং' পদবাচ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই ; তেমনি আবার জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থও নাই। একমাত্র জ্ঞানই সত্য, ঘটপট প্রভৃতি জ্ঞেয় পদার্থমাত্রেই জ্ঞানের আকারবিশেষ। মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই মত, একটী বেদান্ত, অন্যটি যোগশাস্ত্রের কতকটা অনুরূপ। অপর দুই সম্প্রদায়ী অস্তিবাদী, অর্থাৎ তাঁহারা আত্মা ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। কিন্তু কোন বিষয়ে ইঁহাদের পরস্পর কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৈভাষিকেরা কহেন, বাহ্যবস্তু সমুদায় কেবল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে, অনুমান-সিদ্ধ। আমাদের মনে বহির্জগতের প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়। সেই প্রতিরূপ হইতেই বিষয়-জ্ঞান জন্মে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ, যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে, সেই মানসচিত্র হইতে আমরা বহির্ব্বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই। উভয় মতেই, যে সময়ে বস্তু প্রত্যক্ষ হয় সেই সময়েই অস্তিত্ব থাকে, প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় ধ্বংস হইয়া যায়। অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ আমার একটা মনের ভাব মাত্র, তাহা আমি ভাবিলেই আছে—না ভাবিলেই নাই। ভাব-জগতের মূল সত্য জগৎ নাই। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা এই মতের নাম 'সর্ব্ব-বৈনাশিক' দিয়াছেন। বৈভাষিকের আবার চতুঃশাখা—সর্ব্বাস্তিবাদ, মহাসাঙ্ঘিক, সম্মতীয়, স্থবির। ফা-হিয়ান বলেন, প্রথমোক্ত দুই শাখার নিয়মাবলী তিনি পাটনার মঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া চীনভাষায় অনুবাদ করেন।

ইৎ সিং, যিনি সর্ব্বশেষে এদেশে তীর্থভ্রমণে আসেন, তিনি 'সর্ব্বাস্তিবাদী' ছিলেন ; তাঁহার সময়ে উত্তরে এই মত এবং দক্ষিণে 'স্থবির' মতের প্রচার ছিল। হীনযান ও মহাযান সম্বন্ধে ইৎ সিং বলিয়াছেন—"এই দুইই বিশুদ্ধ মত, উভয়ই সত্য, ইঁহারা উভয়েই ভিন্ন মার্গ দিয়া সেই একই নির্ব্বাণে পৌঁছাইয়া দেয়।"

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধ দর্শন প্রস্তাবে তাহার চারি তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

১ম। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক

২য়। সকলই দুঃখময়

৩য়। সমুদয়ই স্বলক্ষণ—নিজ নিজ লক্ষণাক্রান্ত

৪র্থ। সকলই শূন্য

যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ফলে দাঁড়ায় এই যে বৌদ্ধ দর্শন শূন্যবাদে পর্য্যবসিত। তাহার মতে সকলই শূন্য, মূলে সত্য বস্তু কিছুই নাই।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, তাহার কতক আভাস পাইয়া থাকিবেন। যাহা বলা হইল তাহা ছাড়া কত দেশের কত উৎসব, পাগোডা, বিহার, ধর্ম্মমন্দিরে বিচিত্র পূজার্চ্চনা, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও প্রতিমা পূজা, কত কত বুদ্ধবতার, বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধের অস্থিদন্তের সমাধিক্ষেত্র, কতদিকে কত স্তূপ চৈত্য, কত 'মার' ভূত প্রেত দেব দেবীর কল্পনা, কত প্রকার স্বর্গ নরক কল্পনা, কত প্রকার মত ও সম্প্রদায়—সে সমস্ত আর কত বলিব? ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, আশানুরূপ ফললাভও হয় না। সার কথা এই যে, আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম যাহা পালি বৌদ্ধশাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়,—আর প্রচলিত ধর্ম্ম, বিশেষত তাহার উত্তর শাখা—ইহাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা এরূপ গুরুতর যে একটি চিত্র দেখিয়া অপরটিকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি, অবনতি ও পতন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শাক্য সিংহ বুদ্ধত্ব পাইবার পর বারাণসীতে গিয়া তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চ ভিক্ষুকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শিষ্য করিয়া লইলেন ; তখন হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি যে যে উপায়ে শিষ্যমণ্ডলী সংগ্রহ করিলেন, তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা কিরূপে ক্রমান্বয়ে পরিবর্দ্ধিত হইল, তাহার বিবরণ মহাবগ্‌গে প্রকাশিত। পঞ্চ ভিক্ষুর দীক্ষার পর যশ নামক কাশীর জনৈক ধনী শ্রেষ্ঠিয়া তাঁহার পিতা মাতা পত্নীসহ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। পাঁচ মাসের মধ্যে ষাট জন শিষ্য হইল ; বুদ্ধ তাহাদিগকে প্রচার-কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়া নিজে উরুবেলার বনে গিয়া রহিলেন, তথায় কাশ্যপ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, এই তিন শিষ্য পাইলেন। এ অঞ্চলে কাশ্যপের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, অনেকগুলি যুবক তাঁহার নিকটে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব কাশ্যপের আশ্রমের নিকট থাকিয়া উপদেশ দিতেন ও ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে তাঁহার দ্বারে গমন করিতেন। একদিন গিয়া দেখেন, এক অজগর সর্প কাশ্যপের হোম-কক্ষে ফণা ধরিয়া বসিয়া আছে। বুদ্ধ সাপকে মন্ত্রে বশ করিয়া আপনার ভিক্ষার ঝুলিতে পুরিয়া রাখিলেন। এইরূপ আরো কতকগুলি অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া কাশ্যপ সদলবলে গৌতমের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইলেন। উরুবেলায় শিষ্যসংখ্যা সর্ব্বসমেত ১০০০ হইল।

এই শিষ্যমণ্ডলী সঙ্গে বুদ্ধ একদিন গয়ার নিকট গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উপবিষ্ট আছেন, রাজগৃহের অধিত্যকা তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত—এমন সময় সামনের এক পাহাড়ের ঘোর দাবানল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই অনলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দিলেন—তাহা "আগ্নেয় উপদেশ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই।

"হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কি হুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছে ! দেখ, আদিত্য আদীপ্ত, চক্ষু জ্বলিতেছে, সমুদায় দৃশ্যমান জগতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই সকল ইন্ধন পাইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় জ্বলিয়া উঠিতেছে। বাসনাগ্নি, রাগাগ্নি, লোভাগ্নি, মোহাগ্নি জ্বলিতেছে—জন্ম মৃত্যু রোগ শোক নৈরাশ্য দুর্ম্মনস্য সেই অনলে প্রসূত। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, দেহ মন চিন্তা

সকলই এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড। ইন্দ্রিয়সকল কাম্য বস্তুর উপভোগে উত্তেজিত—বাসনানল নিরন্তর প্রজ্বলিত রহিয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ! এই অনিবার্য্য জ্বালা প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সংযত হন; পঞ্চেন্দ্রিয় দেহ মন সকলেরই প্রতি তাঁর বৈরাগ্য জন্মে। এই বিষয় জ্বালা কিসে প্রশমিত হয়, এই সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে উদ্ধার পাওয়া যায়, তিনি তাহার উপায় চিন্তা করেন, এবং অবশেষে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সাধনা দ্বারা সেই নির্ব্বাণ রাজ্যে উপনীত হন, যেখানে বাসনা ছিন্নমূল; যেখানে তিনি জন্ম ভয় জরা মৃত্যু জ্বালা যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করেন।"

তৎপরে তিনি উরুবেলা হইতে সেনীয় বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া সুপতীর্থের নিকট যষ্টিবন নামক আরামকাননে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বুদ্ধের আগমন সংবাদ পাইয়া স্বীয় অনুচরবর্গসহ বুদ্ধদর্শনে সমাগত হইলেন, তখন অগ্নিহোত্রী কাশ্যপকে দেখিয়া ও তাঁহাব শিষ্যত্ব-গ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্ময়ে অবাক্। বুদ্ধদেব তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রাজা, ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও অন্যান্য উপস্থিত গৃহপতিগণেব সমক্ষে কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কাশ্যপ, তুমি তাপসজনের মধ্যে খ্যাতনামা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, বল কেন তুমি জপ তপ যাগ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া এই নবীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছ? তোমার অগ্নিগৃহ শূন্য পড়িয়া রহিবার কারণ কি? হে উরুবেলার ব্রাহ্মণ, তুমি এমন কি সত্য উপার্জ্জন করিয়াছ, যাহার জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত? স্বর্গমর্ত্ত্যে এমন কি আছে, যার জন্য তুমি লালায়িত?"

কাশ্যপ উত্তর করিলেন—

"আমি বেশ বুঝিয়াছি হোম যাগ যজ্ঞ নিতান্ত নিষ্ফল, কেন না সে সমস্ত অনুষ্ঠান বাহ্য-আডম্বর মাত্র, তাহাতে এমন কিছুই নাই যদ্দ্বারা বিষয়-লালসা প্রশমিত হয়, মোহপাশ হইতে মুক্তি-লাভ করা যায়। আমি জানিয়াছি সংসারের সকলি অলীক, ক্ষণিক, ঘৃণিত, শূন্য। আমি সেই মোক্ষাবস্থার সন্ধান পাইয়াছি, যে অবস্থায় জন্ম-বন্ধন ছিন্ন হয় লোভ মোহ দ্বেষ হিংসা বিনষ্ট হইয়া যায়, বিষয়-তৃষ্ণা স্বর্গকামনা নিরস্ত হয়। আমি সেই পরম সম্পদ লাভ করিয়াছি, যাহার ক্ষয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই, এই হেতু হোম বলি যাগযজ্ঞে আর আমার প্রবৃত্তি নাই।" এই বলিয়া তিনি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন—"ভগবান বুদ্ধই আমার গুরু, আমি ইঁহার শিষ্য—

ভগবান বুদ্ধই আমার গুরু।" তখন উপস্থিত জনগণ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, ও নির্ম্মল শুভ্র বসনে যেমন সহজে রং ধরে, তাহাদের মনও তেমনি সত্য ধারণের জন্য প্রস্তুত হইল। বুদ্ধ তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন, এবং অনেকে সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া গৃহীশিষ্যরূপে দীক্ষিত হইলেন। তাহার মধ্যে রাজা বিম্বিসারও একজন।

পরে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! আমি যখন যুবরাজ ছিলাম, তখন আমার মনের সাধ এই পাঁচটি ছিল—প্রথম, রাজ্যাভিষেকের অভিলাষ; দ্বিতীয়, আমার রাজ্যে বুদ্ধদেবের চরণধূলি পড়ে, এই ইচ্ছা; পরে তাঁহার দর্শন, উপদেশ শ্রবণ, এবং তার উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ। প্রভো, আমার এই পাঁচটী মনোরথই পূর্ণ হইয়াছে, আমি এখন আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। এইক্ষণে আমার মিনতি এই যে, প্রভু ভিক্ষুমণ্ডলী লইয়া কল্য রাজবাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন।" বুদ্ধদেব মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নপূর্ব্বে বুদ্ধদেব শিষ্যবর্গসহ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পরিবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদের যথোচিত আতিথ্য সৎকার করিলেন, এবং ভোজনান্তে বৌদ্ধ সঙ্ঘে বেণুবন উৎসর্গ করিয়া গুরুজীর মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। (মহাবগ্‌গ)

এই আশ্রমে বুদ্ধদেব দুই মাস অতিবাহিত করেন।

ঐ সময়ে রাজগৃহে সারীপুত্র ও মুদ্গলায়ন, এই দুই ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহারা পরিব্রাজক সঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন, ও পরম বন্ধুভাবে গুরুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, আমাদের মধ্যে যিনি প্রথমে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইবেন তিনি বন্ধুকে তাহা খুলিয়া বলিবেন। একদিন সারীপুত্র বুদ্ধ শিষ্য অশ্বজিৎকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন তিনি রাজগৃহে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী এবং প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ানন্দ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তোমার মুখশ্রী কি সুন্দর! তাহাতে কি উজ্জ্বল বিমল কান্তি দীপ্তি পাইতেছে! কাহার মন্ত্রে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ? কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন?"

অশ্বজিৎ কহিলেন, "শাক্যবংশীয় গৌতম মুনি আমার গুরু, তাঁহারই উপদেশে আমি দীক্ষিত।"

সারীপুত্র—"তোমার গুরুর নিকট কি শিক্ষা পাইয়াছ?"

অশ্বজিৎ—"আমি অল্প দিন হইল এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, বিশেষ কিছু জানি না, আমি সবটা আপনাকে খুলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আপনি আমার গুরুজির নিকটে গেলে যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি সকলি বলিয়া দেবেন—আপনার সর্ব্ব সংশয় দূর করিবেন। বুদ্ধদেব কার্য্যকারণ শৃঙ্খল সমস্তই অবগত আছেন, হেতু-প্রভব ধর্ম্মসকলের হেতু এবং তাহাদের নিরোধ, তাহাদের আদি অন্ত সকলি জানেন, ও সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন।"*

সারীপুত্র এই গুটিকতক কথার মধ্যে সত্যের কতক জ্ঞান উপলব্ধি করিলেন, দেখিলেন বিশ্বচরাচর সকলি নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর—যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যাহার আদি তাহার অন্ত অবশ্যম্ভাবী। এই নিয়ত ঘূর্ণায়মান ভবচক্র হইতে কিসে মুক্তি লাভ হয় তাহা ভাবিতে লাগিলেন; এবং কি সত্য জানিলে এই ভব-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সারীপুত্র মুদ্গলায়নের নিকটে গিয়া স্বীয় মনোভাব ও সংশয় সকল ব্যক্ত করিলেন। উভয়েই বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের গুরু সঞ্জয়ের অধীনে আর তাঁহারা থাকিতে চাহিলেন না, সঞ্জয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বুদ্ধের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন,—"এই যে দুজন ব্রাহ্মণ দেখছ, ইঁহারা আমার শিষ্যদের মধ্যে কৃতী ও অগ্রগণ্য হইবেন।" এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে তাঁহাদের দীক্ষা দান করিলেন। এই দুই শিষ্য বুদ্ধদেবের অগ্রশ্রাবক নামে

* শ্লোকটী এই।—

যে ধম্মা হেতু প্পভবা
যেসাং হেতুন্ তথাগতঃ।
অহ যেসঞ্চ যো নিরোধো
এবম্বাদী মহা সমনো (পালি)
যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতঃ।
হ্যবদৎ তেষাং চ নিরোধ-এবম্বাদী মহাশ্রবণঃ (সংস্কৃত)

অর্থ—দুঃখময় এ ভবের উৎপত্তি কোথায়,
শ্রমণ জানেন তার তথ্য সমুদায়।
কেমনে বা হয় সেই দুঃখের নিরোধ,
তথাগত যথাযথ করি দেন বোধ।

পরিচিত ছিলেন। ইহারা বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে বসিতেন বলিয়া লোকেরা তাঁহাদের একজনকে 'দক্ষিণ হস্ত', অন্যকে 'বাম হস্ত' শ্রাবক বলিয়া ডাকিত।

এই নবীন শিষ্যদের প্রতি গুরুদেবের বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ দৃষ্টে পূর্ব্ব শিষ্যেরা কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিলেন; পরিশেষে তিনি তাঁহাদের সকলকে একত্র করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-বীজের* ব্যাখ্যান ও সদুপদেশ দানে বিদ্বেষানল প্রশমিত করেন।

কথিত আছে এই রাজগৃহে অবস্থিতি কালে প্রাতিমোক্ষের প্রধান সূত্রগুলি বিরচিত ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের পত্তন হয়—সেই প্রথম সভার নাম "শ্রাবক সন্নিপাত।"

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। কেহ বলিল গৌতম আমাদের গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছেন; কেহ বলিল গৌতম আমাদের স্ত্রীদের বিধবা করিবার জন্য আসিয়াছেন; তিনি আমাদের পরিবার সমাজ সকলি উলট পালট করিয়া দিতেছেন; সকলেই গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইতে চলিল। হাজার জটাধারী সন্ন্যাসীকে তিনি শিষ্য করিয়াছেন, সঞ্জয়ের আড়াই শো শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়া গৌতমের পদানত; মগধ ভাঙ্গিয়া যুবকেরা দলে দলে তাঁহার পদতলে আসিয়া লুণ্ঠিত। নাগরিকেরা গৌতমের শিষ্যদের এইরূপ বিদ্রূপ আরম্ভ করিল—

রাজগৃহে আইলেন গুরু মহাশয়,
আসিয়া পর্ব্বত-চূড়ে বাঁধেন আলয়;
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে বুদ্ধি-বৃহস্পতি,
কোথায় কে গেল চলে, হায় কি দুর্গতি!

---

* দীর্ঘ নিকায়ের মহাপদান সুত্তে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মবীজ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই—

সর্ব্বপাপস্স অকরণং
কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্ত পরিয়োদপণং
এতং বুদ্ধানুসাসনং

অর্থ—অকরণ পাপ-আচরণ,
নিয়ত কুশল-উপার্জ্জন,
চিত্তের সম্যক্ শোধন,
এই বুদ্ধানুশাসন।

ইহার উত্তরে গৌতম-শিষ্যেরা বলিতেন—

ধর্ম্মবীর বুদ্ধ যিনি, সত্য তাঁর একমাত্র বল।
তাঁহার কি দোষ ভাই, মহিমা এ সত্যেরি কেবল।

এইরূপ শাক্যপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে কথা কাটা-কাটি চলিত, তা ভিন্ন আর কোন গুরুতর দ্বন্দ্ব বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। বুদ্ধ এই বাগ্‌বিতণ্ডার ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন—ভয় নাই, এ বিবাদ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, এক সপ্তাহের মধ্যেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। ফলে তাহাই হইল। (মহাবগ্‌গ)

বুদ্ধের যে কি আকর্ষণী শক্তি ছিল, তিনি নগরে গ্রামে বনে উপবনে যেখানে যাইতেন তাঁহার দর্শনার্থে, তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতে ঝাঁকে ঝাঁকে লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইত। অবন্তী প্রদেশে সোন নামক এক ভক্তের কথা শুনা যায়, ঐ দূর দেশে গৌতমের নাম তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, ও তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল। একবার বিরলে বসিয়া তিনি ভাবিলেন, "আমি ভগবান বুদ্ধের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে কখন চাক্ষুষ দেখি নাই। আমার গুরুর আদেশ পাইলে আমি একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।" গুরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন, "যাও, গিয়া ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন কর। তিনি আনন্দের উৎস, মধুরভাষী, সংযমী, জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার দর্শনে বহু পুণ্য উপার্জ্জন হইবে।" কিন্তু সোনের দীক্ষাবিধি অনুষ্ঠানের জন্য ১০ জন ভিক্ষু উপস্থিত থাকা আবশ্যক—তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া অনেক কষ্টে এই দশজন ভিক্ষু সংগ্রহপূর্ব্বক সোন শ্রাবস্তী যাত্রা করিলেন, এবং জেত-বনে গিয়া বুদ্ধদেবের সন্নিধানে উপনীত হইলেন।

এই সকল ভক্ত বুদ্ধের আশ্রয়ে আকৃষ্ট হইত, ইহা অপেক্ষাও উচ্চ দলের লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত। বুদ্ধ যখন কোন প্রখ্যাত নগরে বা কোন রাজার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তখন রাজা, নাগরিক, বড় বড় লোকেরা কেহ রথে, কেহ গজপৃষ্ঠে, তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ সমাগত হইতেন। 'সন্ন্যাস ধর্ম্ম' নামক বৌদ্ধগ্রন্থের ভূমিকায় আমরা এইরূপ একটী চিত্র দেখিতে পাই। এইরূপ লিখিত আছে যে, একরাত্রে মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার প্রাসাদের ছাদে সচিবসহ উপবিষ্ট হইয়া শরতের জ্যোৎস্না উপভোগ করিতেছেন। আহা! সে জ্যোৎস্না কি সুন্দর, কি মনোহর! এই মধুর যামিনীতে সহসা রাজার মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইল। তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ শ্রমণের মধ্যে এমন সদ্‌গুরু কে আছেন, যিনি আমার

মনের স্পৃহা পূর্ণ করিতে পারেন। মন্ত্রীরা কেহ একজনের নাম, কেহ অপরের নাম করিলেন। পরে রাজবৈদ্য জীবককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন—"ভগবান বুদ্ধ শিষ্য সমভিব্যাহারে আমার আম্রবনে বিশ্রাম করিতেছেন, তিনশত ভিক্ষু তাঁহার সহচর। ত্রিজগতে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত—তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, সুরনর-গুরু, মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব। তাঁহার দর্শনে চলুন, তাঁহার উপদেশ শ্রবণে মহারাজ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।" রাজা তখনি হস্তীসজ্জা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া রাণীদের সঙ্গে সেই মধুময় জ্যোৎস্না রাত্রে রাজগৃহদ্বার দিয়া জীবকের আম্রবনে উপনীত হইলেন।

অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান বুদ্ধ এবং উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবান বুদ্ধদেবের আদেশ হইলে আমি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি।"

"মহারাজ! আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

প্রশ্ন—"হে দেব! সংসারে নানা শ্রেণীর লোক কাজ করিয়া থাকে, গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম্মের পুরস্কার ইহজীবনেই লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমের কোন পুরস্কার কিংবা লাভ আপনি এরূপ দেখাইতে পারেন কি, যাহার ফল ইহ-জীবনেই ভোগ করা যায়?"

বুদ্ধদেব বলিলেন—"মহারাজ। আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন?"

রাজা পাঁচ ছয় জন ধর্ম্মোপদেষ্টার নাম করিলেন, যথা—পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বল, ককুধকাত্যায়ন, নির্গ্রন্থনাথপুত্র ও বেলাস্থপুত্র সঞ্জয়। "কিন্তু তাঁহারা কেহই কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। এক্ষণে ভগবন্! আপনাকে আমি সেই প্রশ্ন করিতেছি।"

পরে বুদ্ধদেব নিম্নলিখিত প্রকারে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের ফলাফল বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

"মহারাজ! আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনাকে একটি প্রশ্ন করিব।

মহারাজ! আপনার দাসগণ প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে আপনার সেবা করিয়া থাকে। তাহারা পরিশ্রম স্বীকার করে, কিন্তু আপনি সমস্ত সুখ সম্ভোগ করেন। ইহাদের মধ্যে যদি একজন মনে করে অপরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সে যদি গৈরিক বসন

পরিধান করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, যদি তাহার সন্ন্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয়, এবং যদি আপনি শুনিতে পান যে আপনার ভৃত্যগণের মধ্যে একজন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে সামান্য আহারে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করিতেছে, তখন কি আপনি তাহাকে পূর্ব্ববৎ দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিবেন ?"

রাজা—কখনই না। বরং তাহার সহিত দেখা হইলে আমি আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে সম্মান দেখাইব, তাহার সেবাশুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিব।

—এরূপ হইলে মহারাজ, আপনাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কিছু ফল ইহজীবনেই লাভ করা যাইতে পারে।

—হাঁ ভগবন! তাহা স্বীকার্য, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ফলের বিষয় আপনি বলিতে পারেন কি ?

তখন বুদ্ধদেব সন্ন্যাস-ধর্ম্মের হাতে হাতে আরও অশেষ প্রকার ফললাভ হয়, যথা—আত্মসংযম, জীবনের পবিত্রতা সাধন, পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি অর্জ্জন ইত্যাদি একে একে বুঝাইয়া বলিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন—

"মুক্ত-সন্ন্যাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ হয়, তিনি বস্তু ও জীবের স্বরূপ দর্শন। কোন্ ব্যক্তি কি কর্ম্ম করিতেছে এবং তাহার কি প্রকার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতে হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারেন। যেরূপ, মহারাজ! প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়াইয়া কেহ নিম্নে জলস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পায় লোকগণ কে কিভাবে কাজ করিতেছে, কে আসিতেছে, কে কোন্ পথে যাইতেছে, ইত্যাদি। মুক্ত-সন্ন্যাসী কামনার পরিণতি প্রথম দর্শনেই দেখিতে পান। কোন্ কামনার পরিণাম বিষময় কোন্ পথ কণ্টকময়, কোন্ কামনার দ্বারা উদ্বেগ ও অনর্থের সৃষ্টি হয়, কোন্ কার্য্যের দ্বারা উহা নিবারিত হয়। তাহার বর্ত্তমান কামনা, ভবিষ্যৎ কল্পনা ও অজ্ঞানজনিত মোহ—এই ত্রিবিধ কষ্টের কারণ একেবারে দূর হইয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জ্ঞানময়, পরম আনন্দপূর্ণ জীবন লাভ করিয়া চিরশান্তি উপভোগ করে।"

ভগবান বুদ্ধ এইভাবে উপদেশ প্রদান করিলে অজাতশত্রু বলিলেন—"আপনার উপদেশে আমার সকল সংশয় দূর হইল। যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাশিত হইল। পথহারা পথিককে পথ দেখাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ, ভগবন্। আপনি নানা উজ্জ্বল বিচিত্র উপমার দ্বারা আমাকে সত্যের পথ দেখাইলেন।

এখন হে দেব ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয়দানে যেন ত্রুটী না হয়। ভগবন্! আমাকে আপনার শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন। আমি যাবজ্জীবন আপনাতে অনুরক্ত থাকিব। আমি মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ এবং ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন। আমি রাজ্যলাভের জন্য আমার পরম পূজনীয়, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি। তিনি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়-পরায়ণ নৃপতি, এবং অতি উদার-চরিত দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। আমার মত নরাধমকে আশ্রয় দান করুন, যেন ভবিষ্যতে আর আমি পাপ করিতে না পারি।

—মহারাজ ! তুমি পাপাসক্ত হইয়া এরূপ কার্য্য করিয়াছিলে, কিন্তু যখন ইহা পাপ মনে করিতেছ, এবং সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না, তখন আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া মনে করিয়াছে, সে ভবিষ্যতে আর পাপ করতে পারে না।"*

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে আমরা বুদ্ধদেবের জীবন-চিত্র কতকটা মনে আনিতে পারি। তিনি কোন নগরের সন্নিকট হইলে রাজা প্রজা ছোট বড় সকলেই তাঁহার দর্শন আশে ঝুঁকিয়া পড়িত। কুশীনগরে মল্লেরা, বৈশালীর লিচ্ছবি যুবকগণ তাঁহার দর্শনার্থে সমাগত, তার সঙ্গে অম্বপালী গণিকাও ফেলা যায় না। উপদেশ সমাপ্ত হইলে বুদ্ধের ভক্তমণ্ডলী পরদিন তাঁহাকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত। মধ্যাহ্নে আহার প্রস্তুত হইলে গৃহস্বামী বলিয়া পাঠাইতেন যে ভোজন প্রস্তুত, তখন বুদ্ধ তাঁহার বসনত্রয় পরিধানপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে গম্যস্থানে উপস্থিত হইতেন। তথায় সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জন যাহা কিছু প্রস্তুত হইত, গৃহকর্ত্রীই পরিবেশন করিতেন। আহারান্তে শ্রাবকবর্গ দলবলে বুদ্ধপার্শ্বে উপবিষ্ট হইতেন, ও তাঁহার উপাদেশামৃত পান করিয়া আনন্দমনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।

যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর আস্থাশূন্য ছিলেন, প্রত্যুত ব্রাহ্মণ শূদ্র আর্য্য ম্লেচ্ছ নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে সর্ব্বজাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিতেন, তথাপি কার্য্যতঃ দেখা যায় বুদ্ধের প্রথম শিষ্যমণ্ডলী প্রায় সকলেই উচ্চকুলোদ্ভব। বুদ্ধ তিনি নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যও উচ্চকুলজাত। তাঁহার নবোপাদ্বিত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে-সকল নাম দেখা যায় তাহা—

---

* শ্রামণ্যফল-সুত্ত

সুত্ত-পিটক (বুদ্ধের উপদেশমালা)

দীঘ-নিকায়

সারীপুত্র, মুদ্গলপুত্র, কাশ্যপ, ব্রাহ্মণসন্তান।

আনন্দ, দেবদত্ত, বুদ্ধের আত্মীয়; রাহুল তাঁহার পুত্র।

অনিরুদ্ধ, রাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

যশ বণিকসন্তান, তাঁহার কুলমর্য্যাদা কম মনে হয় না। দুই একজন নীচবর্ণও দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, যেমন উপালী—কিন্তু নিতান্ত সামান্য নহেন, তিনি রাজনাপিত।

সারীপুত্র ও মুদ্গলায়ন, এই দুই ব্রাহ্মণ শিষ্য বুদ্ধের প্রথম শিষ্যদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সারীপুত্র তাঁর সঙ্ঘের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ভূষণস্বরূপ গণ্য ছিলেন। আনন্দ তাঁহার প্রিয় শিষ্য, আমরণ গুরুসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধের শেষ বয়সের ঘটনাবলী আনন্দের সহিত জড়িত, ও তাঁহার অন্তিমকালের শেষ উপদেশ আনন্দকে সম্বোধন করিয়াই প্রদত্ত হয়। উপালীও বৌদ্ধ শাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া বৌদ্ধসমাজে খ্যাতিলাভ করেন। বুদ্ধের শ্যালক দেবদত্তের সহিত আপনারা কতক পরিচিত আছেন; তিনি স্বীয় গুরুর বিরুদ্ধে যে-সমস্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

অতঃপর বুদ্ধের অনেক গৃহস্থ শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা গৃহ সম্পত্তি পরিবারে পরিবৃত থাকিয়াও বৌদ্ধ সঙ্ঘে দানাদি অনুষ্ঠানে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ভিক্ষুদলের পার্শ্বে এই সমস্ত ধর্ম্মশীল গৃহস্থেরা দণ্ডায়মান ছিলেন। ভিক্ষুদের নিকট হইতে তাঁহারা উপদেশ গ্রহণ করিতেন, ও তাহার বিনিময়ে অন্ন দান, ভূমি-দান দ্বারা ভিক্ষুসমাজ পোষণ করিতেন। এই সকল ভক্তের মধ্যে মগধাধিপতি বিম্বিসার ও কোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ (পসেনদী) পরিগণিত হইতে পারেন। বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবক—তিনি শুধু রাজ-পরিবারের বৈদ্য ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-সঙ্ঘের চিকিৎসাভারও তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল। তাহা ছাড়া অনাথপিণ্ডদ বণিক, যাঁহার অনুগ্রহে বৌদ্ধ সঙ্ঘ বুদ্ধদেবের প্রিয় শান্তি-নিকেতন জিতবন উপার্জ্জন করেন; বুদ্ধদেব প্রচারে পরিভ্রমণ কালে এই সমস্ত গৃহস্থ শিষ্য সংগ্রহ করিতেন। ভিক্ষাদান, ভূমিদান, গৃহ ও উদ্যানে সভার আয়োজন, এইরূপে তাঁহারা ভিক্ষু দলের আতিথ্যসংকারে নিযুক্ত থাকিয়া বিবিধ উপায়ে ধর্ম্মপ্রচারে সহায়তা করিতেন।

ধর্ম্মপ্রচার।—

ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম যে-সমস্ত কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা

ফেলিয়া দিয়া, সেই ধর্ম্মের যে সত্য সুন্দর মধুর ভাব তাহা রক্ষা করিয়া, বাহ্যাড়ম্বর বাদ দিয়া ধর্ম্মের সহজ সত্যসকল আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করিয়া; সমুদায় ভারতবাসীকে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বুদ্ধদেব সরল সহজ ভাষায় জাতিকুলনির্ব্বিশেষে আমার সাধারণ জনপদের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার কর্ষণক্ষেত্র প্রয়াগের পূর্ব্ব গৌড়ের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ ও গন্দোয়ানার উত্তর, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তীস্থল—অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী, মগধ, এই সমস্ত রাজ্য। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার হস্তের বীজ লইয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইবার জন্য বাহির হইলেন।

হিন্দুধর্ম্ম প্রচার-সুলভ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম নহে। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে হিন্দু হওয়া যায় না—এমন কি হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কঠোর নিয়মে আটেঘাটে এমনি বদ্ধ যে, যে ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মিয়াছে সে কোন উপায়েই তাহার বাহিরে যাইতে পারে না, এবং স্ববর্ণের গণ্ডীর ভিতর অন্যকে গ্রহণ করিতেও অপারক। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ উচ্চ বর্ণের আবদ্ধ। সে শিক্ষা সর্ব্ব জাতির সাধারণ সম্পত্তি নহে, উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া—শূদ্রাদি হীনবর্ণ তাহা হইতে বঞ্চিত। বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার ঠিক বিপরীত। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে যেমন স্বধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিতেন, সেইরূপ দেশ বিদেশে বিভিন্ন জনপদের মধ্যে সেই ধর্ম্ম প্রচারেও উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার উপদেশানুসারে ভিক্ষুদল দেশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-বীজ বপনে প্রাণপণে সচেষ্ট হইলেন।

যক্ষ-রক্ষো-দমন।—

বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রচার কালে মধ্যে মধ্যে তাঁহার অসাধারণ বশীকরণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কপিলবস্তু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বুদ্ধদেব জেতবন বিহারে কিছুদিন বাস করেন। আলাবি নামক নিকটস্থ একটি গ্রামে এক নৃশংস যক্ষ বাস করিত। একদিন বুদ্ধ সেই লোকটিকে দেখিবার জন্য সেখানে গেলেন। তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, তাঁহার উপর অকারণে সে তীব্র কটুকাটব্য বর্ষণ করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সাধু ব্যবহারে তাহাকে বশ করিলেন। পরে যক্ষ একটু শান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল—হে শ্রমণ! আমি তোমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিতে চাই, তাহার সদুত্তর দিতে পারত ভাল, নতুবা তোমাকে এই জলে ডুবাইয়া প্রাণে বধ করিব। বুদ্ধ তথাস্তু বলিয়া সেই সকল প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

সেই অবধি সে তাঁহার পদানত দাস হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল, এবং ক্রমে তাঁহার সঙ্ঘভুক্ত হইয়া শুদ্ধাচারী সন্ন্যাসীরূপে সুখ্যাতি লাভ করিল। লোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বুদ্ধদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জিজ্ঞাসুদিগকে কি বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন কোন গ্রন্থে তার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু তাঁহার বাণী আমার কাণে যাহা বাজিতেছে, তাহা এই :—

"আমি অতিথি হইয়া যক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলাম, আমার আতিথ্য সংকার করা কি তাহার কর্ত্তব্য ছিল না? তাহা না করিয়া সে কুৎসিত গালিমন্দ দিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। সংকারের বদলে তিরস্কার, যেখানে বহুমান দেওয়া উচিত, সেখানে অপমান। আমি সেই অপমান অকাতরে মাথায় তুলিয়া লইয়া শিষ্টাচারে ও সদুপদেশ প্রদানে তাহাকে বশে আনিলাম। সেই অবধি সে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। 'অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবেক'— এই যক্ষের জীবনে তোমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপলব্ধি করিলে। আমার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিলে তোমাদেরও মঙ্গল হইবে।" গ্রামবাসীগণ বুদ্ধের কথায় প্রীত হইয়া ঐ স্থানে এই আশ্চর্য্য ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এক অপূর্ব্ব বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিল।

আর এক একটি ঘটনার এইরূপ বর্ণনা আছে—তাহা অঙ্গুলিমালকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।

এই লোকটি কোশলের রাক্ষসতুল্য এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি; চুরি ডাকাতি নরহত্যা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বুদ্ধদেব নির্ভীকচিত্তে জঙ্গলের মধ্যে তাহার কোটরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ধীর নম্রভাবে তাহাকে সদুপদেশ দিয়া তাহার উদ্ধত উগ্র স্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। সেই রাক্ষস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে অর্হৎ মণ্ডলীতে স্থান লাভ করিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহার আত্মীয়স্বজনবর্গ চমকিত হইল। সদ্ধর্ম্ম গ্রহণের ফলে কিরূপে মনুষ্যের চরিত্র শোধন হয়, বুদ্ধদেব তাহা লোকদিগকে বুঝাইয়া বলিলে তখন তাহাদের প্রতীতি জন্মিল।

নন্দের দীক্ষা গ্রহণ।—

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে গিয়া প্রথমে তাঁহার পুত্র রাহুলকে দীক্ষা দান করিলেন, পরদিবস তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পালা আসিল। সেদিন নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক, ও 'জনপদ-কল্যাণী' নামক একটি

লোকপ্রথিতা সুন্দরীর সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছিল। গুরুদেব গৃহে প্রবেশ করিয়া নন্দকে নগরের বাহিরে এক বটবৃক্ষ তলে লইয়া গিয়া, তাহাকে যথানিয়মে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দান করিলেন। কন্যা ব্যাকুল অন্তরে বরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু বর আর বাড়ী ফিরিলেন না। পরে শুনা গেল, নন্দ তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্ন্যাসী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন—সকলি ভাঙ্গিয়া গেল।

সুপ্রবুদ্ধ।—

গুরুদেব তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষা জেতবনে যাপন করেন, তথায় রাহুল তাহার ২০ বৎসর বয়ঃক্রমে উপসম্পদা দীক্ষা গ্রহণ করে। সেই বৎসর তিনি কপিলবস্তু পুনর্দর্শন করিতে যান।

দেবদত্তের ন্যায় বুদ্ধদেবের আর এক গৃহশত্রু ছিল—তাঁহার শ্বশুর সুপ্রবুদ্ধ। কপিলবাস্তুতে প্রবাস কালে বুদ্ধদেব সুপ্রবুদ্ধ কর্ত্তৃক সাতিশয় অবমানিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব নগরের বহিরুদ্যানে এক বটবৃক্ষ তলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুপ্রবুদ্ধ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তথাগত ভিক্ষায় বাহির হইবেন শুনিয়া সেই পাষণ্ড মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার পথ রোধ করতে আসে, ও তাঁহার উপরে বিস্তর কটুকাটব্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। গুরুদেব আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—দেখ, লোকটার আসন্নকাল উপস্থিত; এক সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবী ইহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সুপ্রবুদ্ধ এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে ভাবিল, আমি সপ্তাহকাল আমার প্রাসাদের স্তম্ভোপরি দিনপাত করিব, দেখা যাক পৃথিবী আমাকে কেমন করিয়া গ্রাস করে। সেই দুরাত্মা ভাবে নাই যে দুরাচারীর কোনখানেই নিস্তার নাই, তাহার পাপের দণ্ডভোগ অবশ্যম্ভাবী। ফলে তাহাই হইল। সপ্তম দিবসে পৃথিবী তার পদতলে বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহার অপরাধের দণ্ড স্বরূপে তাহাকে 'অবীচি' নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিল।*

বুদ্ধদেব ও ব্রাহ্মণ ভারদ্বাজ।—

ধর্ম্ম প্রচারের একাদশ বর্ষে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে বর্ষা যাপন করিতেছিলেন। একদা তিনি নিকটবর্ত্তী একনালা গ্রামে গিয়া ভারদ্বাজ নামক এক ধনশালী ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। দেখেন যে ভারদ্বাজ তাঁহার শস্যক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দেখিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "হে

---

* বুদ্ধের পঞ্চ বিদ্রোহীর মধ্যে সুপ্রবুদ্ধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল—অপর চারিজন দেবদত্ত, নন্দ, যক্ষ নন্দক এবং চিঞ্চা।

গৌতম! আমি কৃষক। লাঙ্গল ধরিয়া, বীজবপন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। তুমিও লাঙ্গল ধর, বীজ বপন কর, অনায়াসে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! আমিও কৃষিকার্য্য করি, বীজবপন করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করি।"

—কি আশ্চর্য্য! তুমি বলিতেছ তুমি শ্রমজীবী কৃষক, অথচ তোমার বৃষ লাঙ্গল নাই, বন্ধনরজ্জু নাই, অঙ্কুশ, যুগকাষ্ঠ এ সব কিছুই দেখিতেছি না।

—শ্রদ্ধাই আমার বীজ, সেই বীজ আমি সর্ব্বত্র বপন করি; কর্ম্মোদ্যম আমার বৃষ্টির জল; প্রজ্ঞাই আমার লাঙ্গল, আমি সেই লাঙ্গল চালনা করিয়া অজ্ঞান-কন্টক মোচন করি। মন আমার বন্ধনরজ্জু, মনের একাগ্রতা আমার দণ্ড ও অঙ্কুশ। সত্য দ্বারা আমি লোকসকলকে বন্ধন করি এবং মায়ামমতা দ্বারা আমি বন্ধন মুক্ত করি। বীর্য্যই আমার চাষের বৃষ। আমি কৃষি করিয়া যে ধান্য আহরণ করি, তাহা দুঃখান্তকারী নির্ব্বাণ।"

ভারদ্বাজ বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেন।

বৈশালীতে মহামারীর উপদ্রব।—

তথাগতের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির তৃতীয় বর্ষায় যখন তিনি রাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৈশালী হইতে তাঁহার নিকট লিচ্ছবী নাগরিকদের এক দৌত্য প্রেরিত হয়। দূত বিনীত ভাবে নিবেদন করিল, "ভগবন্! ভয়ঙ্কর মহামারীর উপদ্রবে আমাদের নগর ছারখার হইয়া যাইতেছে। আমরা অনেকানেক উপাধ্যায়ের নিকট গিয়া বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হয় না। প্রভু, আপনার পদধূলি দিয়া আমাদের দেশ রক্ষা করুন"। বুদ্ধদেব বলিলেন, "রাজার অনুমতি হইলে আমি যাইতে পারি"। রাজা বিম্বিসার এই প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করিলেন না, কেবল বলিলেন "আমি আমার রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত ভগবান বুদ্ধকে পৌছিয়া দিব, পরে তোমরা তাঁহার যথাযোগ্য আতিথ্য-সৎকার করবে"। এই বলিয়া রাজধানী হইতে গঙ্গার দক্ষিণ পার পর্য্যন্ত যে পথ চলিয়াছে তাহা প্রশস্ত, সুমার্জ্জিত ও পুষ্পমাল্য এবং রঙীন পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং মন্ত্রী, সভাসদ, পরিজনবর্গ সহ গিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিলেন। গঙ্গা পার হইবামাত্র লিচ্ছবীগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহু সমারোহে রাজধানীতে লইয়া গেল। বুদ্ধদেব ঐ প্রদেশে পদার্পণ করিতে না করিতেই রোগের অপদেবতাগণ দূরে পলায়ন করিল, এবং নগরবাসীদের মধ্যে যাহারা উৎকট পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া বুদ্ধের জয়জয়কার

করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব নগরে প্রবেশ করিয়া রত্নসূত্র হইতে পদাবলী আবৃত্তি করিলেন এবং অনেকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনন্তর বহুবিধ মূল্যবান উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া রাজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। লিচ্ছবীরা নগরের কূটাগারশালা তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিল, এবং আরো অনেক বহুমূল্য উপহার দিয়া যথোচিত সম্মান-সহকারে বিদায় করিল।*

জীবক —

বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে শালবতী নাম্নী গণিকার গর্ভে রাজগৃহে জীবকের জন্ম হয়। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে ভারতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা মহাবগ্গে বর্ণিত জীবক-চরিত হইতে কতক পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না— এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কোন এক উচ্চাঙ্গ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, এইরূপ স্থির করেন। তদনুসারে তক্ষশীলায় গমন করিয়া তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক আত্রেয়ের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। অধ্যাপক জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে কত করিয়া বেতন দিতে পারিবে"? জীবক উত্তর করিল, "মহাশয়, কাহাকেও না বলিয়া আমি গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, আপনাকে দিবার মত আমার নিকট একটি কপর্দ্দকও নাই। শিক্ষা সমাপন করিয়া আমি চিরজীবন আপনার দাস হইয়া থাকিব"। অধ্যাপক জীবকের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জীবক ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তখন অধ্যাপক তাহার অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "এই বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকে ষোল মাইলের মধ্যে যে সকল লতা ও বৃক্ষ আছে, উহার মধ্যে যেগুলি চিকিৎসায় প্রয়োজন হয় না, সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া আন"। চারিদিন পরে জীবক অধ্যাপকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, ঔষধে প্রয়োজন হয় না, এমন লতা পাইলাম না"। অধ্যাপক প্রীত হইয়া জীবককে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। জীবক মগধে প্রত্যাবর্ত্তন কালে একদিন শাকেত (অযোধ্যা) রাজ্যে অবস্থিতি করেন। তথায় কোন রমণীর ঘোর শিরঃপীড়া

* মহাবগ্গ—Kern's Manual of Buddhism.

হইয়াছিল। জীবক একটু মাখন উত্তপ্ত করিয়া উহার সহিত একটি ঔষধ মিশ্রিত করেন, এবং উক্ত রমণীকে এই মিশ্রিত দ্রব্যের নস্য লইতে বলেন—তাহাতেই তাহার শিরঃপীড়ার শান্তি হইল। রাজগৃহে আসিয়া জীবক রাজা বিম্বিসারকে কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে মুক্ত করিয়া বহু ধনরত্ন পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বারাণসী এবং উজ্জয়িনীতেও তিনি অনেকের চিকিৎসা করেন। রাজগৃহে অস্ত্র-চিকিৎসাতেও তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের বিংশতি বৎসর পরে জীবক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধদেব তাঁহার চিকিৎসায় অনেক সময় উপকার পাইতেন। এক সময়ে বুদ্ধের আমাশয় রোগ জন্মে ; জীবক একটি পদ্মপুষ্পের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া তাঁহাকে সেবন করিতে বলেন, উহাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। আর একবার বুদ্ধ অসুস্থ হইলে, জীবক পদ্মের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঔষধ রাখিয়া তাঁহাকে আঘ্রাণ করিবার ব্যবস্থা দেন, এই চিকিৎসাতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন। বুদ্ধকে সেবা শুশ্রূষা করিবার সুযোগ হইবে, এই আশায় জীবক স্বীয় উদ্যানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। ঐ বিহার তিনি বুদ্ধকে উপহার দিয়াছিলেন।

একদা মগধে কুষ্ঠ, ধবল, অপস্মার প্রভৃতি পঞ্চবিধ রোগের উপদ্রব হইয়াছিল। রোগীরা দলে দলে জীবকের নিকট গমন করিয়া চিকিৎসা প্রার্থনা করায় জীবক বলিলেন, "আমার হাতে অনেক কাজ, আমি রাজা বিম্বিসারের গৃহ-চিকিৎসক। বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের চিকিৎসার ভার আমার উপর, আমার সময় নাই। আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না"। রোগীরা ভাবিল আমরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করি—তাহা হইলে ভিক্ষুগণ আমাদের পরিচর্য্যা করিবেন, আর জীবক আমাদের চিকিৎসক হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া ঐ সকল লোক দীক্ষা গ্রহণ করিল। পরে উহারা সারিয়া উঠিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারাশ্রমে ফিরিয়া গেল। জীবক তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা উত্তর করিল, "এক্ষণে আমরা সুস্থ সবল হইয়াছি, আর আমাদের ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন নাই"। জীবক বুদ্ধের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বুদ্ধদেব তাহা শুনিয়া ভিক্ষুদের ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "তোমরা কুষ্ঠ, ধবল, যক্ষ্মা, এই সকল মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দীক্ষা দান করিবে না" ও তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। (বৌদ্ধধর্ম্ম—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত—পৃঃ ১৬৬—১৭০)।

নবম পরিচ্ছেদ।

অশোক।

অশোক খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭২-৭৩ অব্দে মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন, এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করিয়া, ধর্ম্মাশোক নামে জগতে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান। সিংহাসন প্রাপ্তির চার বৎসর পরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার রাজত্বের প্রথম তের বৎসরের ইতিবৃত্ত একপ্রকার গভীর তিমিরাচ্ছন্ন, তাহার কিছুই জানা যায় না। পরে যখন তাঁহার শিলালেখ্যসকল স্থানে স্থানে উৎকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতে আমাদের অশোক-যুগের জ্ঞানলাভের সুযোগ হয়। তাঁহার এই শিলা ও স্তম্ভগাত্রে খোদিত অনুশাসনগুলি ভারতের নানা প্রদেশে বিক্ষিপ্ত থাকায় তাঁহার কীর্ত্তিসকল অদ্যাবধি সজীব আছে। বৌদ্ধযুগের স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে এই সকল শিলালিপি বিশেষ সমাদৃত ও শিক্ষাপ্রদ। অশোক যেন স্বহস্তে তাঁহার জীবন-কাহিনী, তাঁহার ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস, তাঁহার প্রজাবাৎসল্য সূচক শাসনপ্রণালী এই উপায়ে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অশোক-ইতিহাসের উপাদানসকল সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। এই লিপিমালা হইতে আমরা যে-সকল তথ্য জানিতে পারি, তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধানতঃ কলিঙ্গ-বিজয় বার্ত্তা। কলিঙ্গ প্রদেশ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সুবিখ্যাত। বিন্ধ্যাচলের পূর্ব্বঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী জগন্নাথক্ষেত্র যাহার অন্তর্ভুক্ত, এ সেই দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। অশোকের রাজত্বের আরম্ভকালে, ইহা স্বাধীন রাজ্য ছিল। অশোক স্বরাজ্য বিস্তার মানসে, উহা আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ হত, আহত ও বন্দীকৃত হয় এবং সমগ্র দেশ ছারখার হইয়া যায়। এই ভীষণ ঘটনায় রাজার মনে এমনি আঘাত লাগিয়াছিল যে, সেই অবধি তিনি দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মরাজ্যবিস্তারে ব্রতী হইলেন, এইসকল ব্যাপার ত্রয়োদশ শিলালিপিতে দৃষ্ট হইবে।

কলিঙ্গ বিজয়ের অল্পকাল মধ্যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৯ অব্দে, অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে গৃহস্থ-উপাসকরূপে দীক্ষিত ও তৎপরে বিধিমত সঙ্ঘভুক্ত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়, এবং তিনি এত চৈত্য, এত স্তূপ ও অন্যান্য

এত প্রকার কীর্ত্তি-নিকেতন স্থাপনা করেন যে, তাহার চিহ্নসকল দুই সহস্র বৎসরান্তেও কালের অত্যাচারে বিলুপ্ত হয় নাই। মগধ রাজ্যে অন্যূন চৌত্রিশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রতিপালিত হইত, এবং উহাদের বাসোপযোগী বিহারশ্রেণীতে ঐ প্রদেশ এমনি ভরিয়া যায় যে, "বিহার"ই উহার নামকরণ হইল। ঐ নাম এখনও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। রোম সাম্রাজ্যে কন্‌ষ্টানটাইন্ (Constantine) যেরূপ খৃষ্টধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অশোকও সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হয়েন; কেবলমাত্র স্বরাজ্যে নয়, পররাজ্যে ও দেশান্তরে ধর্ম্মযাজকগণ প্রেরণ করেন। রুষদেশে বল্গা নদী হইতে জাপান, সাইবিরিয়া মঙ্গোলিয়া হইতে সিংহল শ্যাম পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার, সেইখানেই অশোকের নাম প্রকীর্ত্তিত। রোম-সম্রাট কন্‌স্ট্যানটাইনের ন্যায় অন্যান্য রাজর্ষিদিগের সহিত অশোকের তুলনা করা হইয়া থাকে। মোগল-আকবরও তাঁহার উপমাস্থল বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। এই উপমাটি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উভয়েই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর, সুশাসনে কীর্তিমান; ধর্ম্মে, ঔদার্য্যগুণে উভয়েই সমতুল। আকবর হিন্দু, পার্সি, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মকেই সমান শ্রদ্ধা করিতেন, সকল ধর্ম্ম হইতেই সারসত্য গ্রহণ করিতে উৎসুক ছিলেন; এইরূপে তিনি নিজ প্রতিভাবলে এক অভিনব ধর্ম্ম গড়িয়া তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত এই ধর্ম্মসমন্বয় অধিক কাল স্থায়ী হইল না, জীবনান্তে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আমরা দেখিতে পাই অশোকের পৌত্র দশরথ আজীবক জৈন সম্প্রদায়ে তিনটী গুহাশ্রম উৎসর্গ করেন, ইহা হইতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন না। ইহাও নিশ্চয় যে, মৌর্য্যরাজের উত্তরাধিকারী পুষ্যমিত্র, যিনি ১৮০ খৃষ্টাব্দে সুঙ্গবংশ পত্তন করিয়া যান, তিনিও বুদ্ধ-সঙ্ঘের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই; প্রত্যুত তাঁকে বৌদ্ধ-আখ্যান-মালায় বৌদ্ধদ্রোহী নৃপতি রূপেই চিত্রিত দেখা যায়।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্প্রদায়সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, বিশ্বজনীন ধর্ম্মরূপে দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতে উদ্যোগী হইলেন। পরিণামে তাঁহার জন্মভূমি এই ভারতবর্ষেই শুষ্ক, শীর্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল; তাহার শাখা প্রশাখা এসিয়ার দূর দূরান্ত প্রদেশে বিস্তারিত হইয়া সারবান ও ফলবান বৃক্ষরূপে সমুত্থিত হইল।

অশোকের অনুশাসন-লিপিগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে:—

*সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বশুদ্ধ তাহাদের সংখ্যা প্রায় একত্রিংশৎ। কতক বা শিলাস্তম্ভগাত্রে মুদ্রিত। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই অনুশাসনগুলি নিম্নলিখিত নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে ঃ—

১। চতুর্দ্দশ শিলালিপি। (খৃঃ পূঃ ২৫৭—২৫৬)

২। ভাবরা অনুশাসন।

৩। কলিঙ্গ অনুশাসন।

৪। দুই তিনটি অপ্রধান শিলালিপি।

৫। সাতটি প্রধান (২৪২) চারটি অপ্রধান স্তম্ভ অনুশাসন।

এতদ্ভিন্ন দুইটি প্রধান বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দর্শনের স্মৃতি স্তম্ভ (২৪৯) এবং কতকগুলি গুহাখোদিত লিপি। এই গুহাগুলি আজীবক নামক জৈন সম্প্রদায়ের বাসের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৭ অব্দ হইতে পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে এই সকল গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে চতুর্দ্দশ শিলালিপি অগ্রগণ্য। ইহা হইতে আমরা সম্রাটের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানসকল কতক পরিমাণে জানিতে পারি।

শিলালিপি।—

১। জীবহত্যা নিবারণ।—এই অনুশাসন অনুসারে সম্রাটের রন্ধনশালায় যে অসংখ্য জীবহত্যা হইত, তাহা নিয়মিত হইয়া ক্রমে দুইটী ময়ুর ও ক্বচিৎ একটি হরিণে পরিণত হইয়াছে—পরে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যজ্ঞে কিম্বা পর্ব্বাদিতেও জীবহত্যা প্রথা নিষিদ্ধ (খৃঃ পূঃ ২৫৬)

২। মনুষ্য ও পশুদিগের হিতার্থে ঔষধালয় স্থাপন, কূপ খনন, বৃক্ষাদি রোপণ ইত্যাদি।

৩। পিতৃমাতৃভক্তি, ব্রাহ্মণ শ্রমণে দান, প্রাণীহিংসা বর্জ্জন, আয়ব্যয় সঙ্কোচ ; এই সকল অনুশাসন প্রচার করিবার জন্য পাঁচ বৎসরান্তর রাজকর্ম্ম-চারীগণ বিভিন্ন প্রদেশসকল পর্য্যটন করিবেন।

৪। কর্ত্তব্যপালন।—যুদ্ধাভিনয়ের পরিবর্ত্তে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শোভাযাত্রা। জীবহত্যা ও অশোভন আমোদ প্রমোদ নিবারণ। আত্মীয়স্বজন, সাধু সন্ন্যাসী, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের প্রতি সদ্ব্যবহার। সম্রাটের উত্তরাধিকারী বংশধরগণ, এই

* Asoka, by Vincent A. Smith (Rulers of India Series)

অনুশাসন মত কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবেন, এবং সৎপথে থাকিয়া, অপরকে সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও ধর্ম্মোপদেশ দান করিবেন।

৫ম অনুশাসনের উপদেশ যে, সৎকর্ম্ম কঠিন, এবং পাপকর্ম্ম অনায়াসসাধ্য। এই সকল অনুশাসন কার্য্যে পরিণত হইল কিনা, তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য ধর্ম্মাধিকারী নিযুক্ত হইবে। তাঁহারা যে কেবলমাত্র উপদেশ দিবেন, তাহা নহে,—অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধান, বিপন্ন ও বার্দ্ধক্যপীড়িতের দুঃখমোচন, এবং বহু পরিবার-ভারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সহায়তা করাই তাঁহাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য। রাজধানী পাটলিপুত্র এবং প্রধান প্রধান নগরে রাজপরিবারভুক্ত অন্তঃপুরচারিণীদিগের দৈনিক জীবনযাত্রার প্রতি তাঁহারা সাবহিত দৃষ্টি রাখিবেন।

ষষ্ঠ অনুশাসন।—রাজকর্ম্মচারীদিগের শাসনকার্য্যে তৎপরতা, ও দীর্ঘসূত্রতা বর্জ্জন। বিলম্ব নিবারণার্থে সম্রাট সর্ব্বদাই চরমুখে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। আহারে, বিহারে, অন্তঃপুরে, রাজসভায় কিম্বা প্রমোদ-উদ্যানে, যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কখনই তাহাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল না। 'এইরূপে লোকহিত সাধন করিয়া যাহাতে মানব-জীবনের ঋণমুক্ত হইতে পারি, এই আমার নিয়ত চেষ্টা।"

৭ম অনুশাসন।—দানশীলতা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম, কৃতজ্ঞতা, চিত্তশুদ্ধি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—এই সকল অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম সকলেরি পালনীয়।

৮ম অনুশাসন।—মৃগয়া কিম্বা আমোদপ্রমোদ উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণের পরিবর্ত্তে —দরিদ্রে দান, ধর্ম্মশিক্ষা ও আলোচনার নিমিত্ত তীর্থযাত্রা করণীয়। এই সকল স্থানে সম্রাট বিশেষ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীদের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহাদিগকে দান করিবেন।

৯ম অনুশাসন।—ধর্ম্মানুষ্ঠান ইহপরকালের সুখের সাধন। গুরুভক্তি, জীবে দয়া, শ্রমণ ব্রাহ্মণে উপযুক্ত দান, দাস-দাসীর প্রতি ন্যায়াচরণ, ইহাই ধর্ম্মানুষ্ঠান।

১০ম অনুশাসন।—নিম্নলিখিত দুইটি বচন হইতে এই অনুশাসনের সারমর্ম্ম জানিতে পারা যায়:—

"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

"যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্রং সুখং নয়েৎ"॥

একাদশ অনুশাসন।—প্রকৃত ধর্ম কি? পিতৃ-মাতৃভক্তি, দাসবর্গ সংরক্ষণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ব্রাহ্মণ শ্রমণে দান, জীবহত্যা হইতে বিরতি। এই ভাবে চলিয়া মানব ইহকালে পুণ্য ও পরকালে সুগতি লাভ করে।

দ্বাদশ অনুশাসন।—ধর্মমতে ঔদার্য্য। স্বধর্মের স্তুতিবাদ ও পরধর্মের অকারণ নিন্দাবাদ করিবে না। সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। এই অনুশাসনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, এই উদ্দেশ্যে নারীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইবে।

ত্রয়োদশ অনুশাসন।—এই সকল অনুশাসনের মধ্যে ত্রয়োদশ শিলালিপি সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কলিঙ্গবিজয় ও তাহার আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড বর্ণন হইতে ইহার আরম্ভ।

দেবানামপ্রিয়, প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক বলিতেছেন, "আমার রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ দেশ বিজিত হয়, এই যুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র ব্যক্তি বন্দীকৃত ও লক্ষাধিক হত হয়, এবং ততোধিক দৈব-দুর্ব্বিপাকে প্রাণত্যাগ করে।"

কলিঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই সম্রাটের শুভ ধর্ম্ম-বুদ্ধি জাগ্রত হয়, যুদ্ধের ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাঁহার মনে অনুশোচনার উদ্রেক করে। "বিশেষ ক্ষোভের কারণ এই যে, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, সাধুসন্ন্যাসী ও অপরাপর গৃহস্থগণ—যাঁহারা যুদ্ধের সহিত আদৌ সংশ্লিষ্ট নহেন—তাঁহারাও এই ঘটনাচক্রে দুঃখভাগী হইয়া থাকেন"। এই শিলালিপিতে পঞ্চ গ্রীক রাজ্যে দূত প্রেরণের উল্লেখ আছে।*

প্রিয়দর্শী বলিতেছেন:—

"গ্রীকরাজ আণ্টিওকাসের রাজ্যে (Antiochus) এবং তুরময় (Ptolemy), আণ্টিকিনি, (Antigonus), মক (Magus) আলেক্‌সুন্দ (Alexander), উত্তরখণ্ডের এই পঞ্চ রাজার, এবং দক্ষিণে তাম্রপর্ণী সীমান্তে চোলপাণ্ড্য রাজাদিগের রাজত্বে, স্বয়ং সম্রাটের অধীন যবন, কাম্বোজ, ভোজ,

---

* পঞ্চ গ্রীকরাজ—

1. Antiochus of Syria
2. Ptolemy of Egypt, father of Ptolemy Philadelphus.
3. Antigonus of Lyciade.
4. Magus of Cyrene.
5. Alexander of Epirus, maternal uncle of Alexander the Great.

পিটিনক, আন্ধ্র ও পুলিন্দ প্রদেশে, দেবানামপ্রিয় অনুশাসনকল যেখানেই প্রচারিত, সেখানেই প্রজাবর্গ আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। দেশ বিজয় বহু প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের জয় সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দজনক।

এই বিজয়ই শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছনীয়। আমার উত্তরাধিকারী এবং বংশধরগণ যাহাতে দিগ্বিজয়ের উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন, সেই অভিপ্রায়ে এই অনুশাসন প্রচারিত হইল।"

চতুর্দ্দশ অনুশাসন।—সম্রাট প্রিয়দর্শীর আদেশক্রমে এইসকল শিলালিপি রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে, বারম্বার নানাস্থানে উৎকীর্ণ করা হইল। যদি ইহাতে কোন ভ্রম প্রমাদ স্থান লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহা মার্জ্জনীয়।

এই চতুর্দ্দশ অনুশাসন ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। উত্তরে পেশোয়ার হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত, পশ্চিমে কাটেওয়াড় হইতে পূর্ব্বে উড়িষ্যা অবধি ইহার প্রতিলিপিসকল পাওয়া গিয়াছে। এইসকল স্থানের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ধৌলী (উড়িষ্যা), কটকের দশক্রোশ দক্ষিণে ও পুরীর দশক্রোশ উত্তরে।

২। গির্ণার—কাটেওয়াড়ে, জুনাগড নগরের নিকট, সোমনাথের বিশক্রোশ উত্তরে।

৩। জস্তগড়,—গঞ্জাম বিভাগ, মান্দ্রাজ।

৪। খালসি, যমুনা যেখানে হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইখানে নদীর পশ্চিম তীরে।

৫। মানসাহারা।

৬। সাহাবাজ গড়—পেশোয়ারের উত্তরপূর্ব্ব, ২০ ক্রোশ দূর, ইয়ুসুফ জাই বিভাগে।

ইহার মধ্যে দেরাদূন প্রদেশে মশুরি হইতে পনেরো মাইল পশ্চিমে খালসি নামক স্থানে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহাতে ও অন্যান্য অনুশাসন-পত্রে যে ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহৃত, তাহাই দেবনাগরী অক্ষরের মূল। বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত হয়। কেবলমাত্র উত্তর পশ্চিমে সাহাবাজ গড় প্রভৃতি স্থানে, খরোষ্ঠি অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা পারসিক অক্ষরজাত, দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয়।

কলিঙ্গানুশাসন।

ইতিপূর্ব্বে চতুর্দ্দশ প্রধান শিলালিপি বর্ণিত হইল; এতদ্ভিন্ন কয়েকটি

অপ্রধান শিলানুশাসন আছে—তন্মধ্যে দুইটি, কলিঙ্গানুশাসন নামে অভিহিত। একটি ভুবনেশ্বরের সাত মাইল দক্ষিণ ধৌলি গ্রামের সন্নিকট, অশ্বথামা নামা শৈল-গাত্রে খোদিত; অপরটি মাদ্রাজ বিভাগের গঞ্জাম জিলায় জৌগদ নামক ভগ্নদুর্গে আবিষ্কৃত হয়,—দুর্গের মধ্যভাগে একটি শিলাখণ্ডে খোদিত। এই দুই পত্র বিজিত প্রদেশের নাগরিক এবং সীমান্তবর্ত্তী প্রজাবর্গের প্রতি প্রযুজ্য। উভয় পত্রেই বিজিত প্রদেশের সুশাসন সম্বন্ধে রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রদেশের সীমান্তে অর্দ্ধসভ্য অনার্য্য জাতিসকল বাস করে। তাহাদিগকে আবশ্যকমত কঠোর কিম্বা করুণ শাসনের দ্বারা বশ মানাইতে হইবে। রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন, "প্রজাগণ সকলেই আমার পুত্রতুল্য—আমি আপন সন্তানের ন্যায় তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করি, এই কথাগুলি তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে।"

এই সকল শিলালেখ্য অল্প লোকেরি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা। অতএব সময়ে সময়ে প্রজাসমূহকে একত্রিত করিয়া যেন সম্রাটের এই সকল আদেশ জ্ঞাপন করা হয়।

নাগরিক পত্রে অধিকন্তু আদেশ এই,—যেন কোন প্রজা অন্যায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।

অপ্রধান শিলালিপি।—

অশোকের অনুশাসনগুলি স্নেহবাৎসল্য, দয়াদাক্ষিণ্য, পিতৃ-মাতৃগুরুভক্তি, অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মনীতির উপর দিয়াই গিয়াছে—অথবা প্রজাহিতার্থে বৃক্ষ রোপণ, কূপ খননাদি পূর্ত্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে। তাহার একটি ভিন্ন অপর কোন শিলালিপিতে প্রিয়দর্শী আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি উদার-পন্থী ছিলেন; প্রত্যুত এক স্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "প্রিয়দর্শীর ইচ্ছা এই যে, অবৌদ্ধ পাষণ্ডেরাও তাঁহার রাজ্যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করুক। কেননা তাহারাও ভাবশুদ্ধি ও ধর্ম্মের শান্তি কামনা করে।"

কেবল একটিমাত্র অনুশাসনে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ বার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে—তাহা অপ্রধান শিলালিপির মধ্যে প্রথম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১। সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।—

"আড়াই বৎসর পূর্ব্বে, দেবানামপ্রিয় অশোক রাজা গৃহস্থ-উপাসকরূপে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি বৎসরেক যাবৎ সঙ্ঘভুক্ত হইয়া কায়মনে

ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছেন। এই কালের মধ্যে ভারতবাসীগণ পূর্ব্বে যাঁহারা অসহযোগী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা দেবতাদের সহযোগী হইয়াছেন।"

এই অনুশাসনের মর্ম্ম গিরিপৃষ্ঠে খোদিত হইয়া ঘোষিত হউক। তোমরা ইহা দিক্‌দিগন্তে ঘোষণা করিয়া দাও। এই ঘোষণা পত্র প্রচারার্থে ২৫৬ জন প্রচারক নিযুক্ত হইল।

এইরূপে সম্রাট অশোক ধর্ম্মরাজ (Pope) এবং পৃথ্বীরাজ (Emperor), এই দুই গৌরব-পদের সঙ্গমক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইলেন।*

বৌদ্ধধর্ম্মে নরপতির প্রব্রজ্যা গ্রহণের দুইটি উদাহরণ আছে,—খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠাব্দে চীন সম্রাট কাউৎসু, এবং আধুনিক কালে ব্রহ্মরাজ বোদো আপ্রা (খৃষ্টাব্দ ১৭৮১—১৮১৯)। অশোক গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া রীতিমত বৌদ্ধ-পরিব্রাজক-রূপে শিবির স্থাপনা পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যটন করিতেছেন, সেই এক সুন্দর চিত্র আমাদের কল্পনাপথে উদিত হয়।

২। অপর একটি ধর্ম্মানুশাসন ভাব্রা লিপি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজপুতানার অন্তঃপাতী বৈরাট নামক নগরের নিকটবর্ত্তী শৈল-শিখরস্থিত বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামের কোন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে ইহা খোদিত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। ইহাতে সম্রাট মগধ সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"রাজা প্রিয়দর্শী সঙ্ঘের কুশল কামনা করিতেছেন। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপর আমার কি প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা, মহাশয়েরা অবগত আছেন। বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলই সদুপদেশ, তাঁহার আজ্ঞানুরূপ চলিলে সত্যধর্ম্ম বহুকাল সুরক্ষিত থাকিবে।"

পরে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সাতটি ধর্ম্মতত্ত্ব পালিশাস্ত্র হইতে প্রকট করিয়াছেন—

১। বিনয় সমুৎকর্ষ (প্রাতিমোক্ষ হইতে)

২। আর্য্যবশ (সঙ্গীতি সূত্র হইতে)

৩। অনাগত ভয় (অঙ্গুত্তর)

৪। মুনিগাথা।

৫। মৌনী সূত্র।

৬। উপতিসস-পসিণ, উপতিষ্য=সারীপুত্র, পসিণ=প্রশ্ন (বিনয়)

---

* Asoka, by J. M. Macphaili (Heritage of India Series P. 43.

* ৭। রাহুল-বাদ, রাহুলের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ।

এই সকল কথা শ্রমণ, শ্রমণা ও বৌদ্ধ-গৃহস্থগণ প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ ও মনন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই অনুশাসন প্রচার করিতেছি।

চতুর্দ্দশ শিলালিপির ন্যায় সপ্ত স্তম্ভানুশাসনও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সুবিদিত।

সপ্ত স্তম্ভলিপি।—

১। সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের ষড়বিংশতি বৎসরে এই অনুশাসন স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হয়।

ধর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুচেষ্টা, আত্ম-পরীক্ষা, এই সকল সাধনা ব্যতীত ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয় না। যাহা হউক, আমার অনুশাসন প্রভাবে এই ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে।

আমার ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ ছোট বড় যাহাই হউক, আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া প্রজাবর্গকে—"এই চঞ্চল-চিত্ত লোকসকলকে সৎপথে লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইবে।"

২। দয়া, দান, সত্য, চিত্তশুদ্ধি, পুণ্যানুষ্ঠান, পাপাচরণ হইতে বিরতি, ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ।

সম্রাটের অহিংসা প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অন্য সকলে অনুসরণ করিলে মঙ্গল হইবে।

৩। লোকে আপনার ভালই দেখে, কি মন্দ তাহা বিবেচনা করে না। ইহা ঠিক নহে, সদসৎ বিচার করা কর্ত্তব্য—রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অহঙ্কার, ঈর্ষা, ক্রূরতা, এই সকল পাপ হইতে বিরত থাকিবে। দেখিবে একপথে ঐহিক সুখ, অপর পথে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল।

৪। শাসনকর্ত্তাদের অধিকার ও কর্ত্তব্য নিরূপণ।—

আমি আমার শাসনকর্ত্তাদিগকে দণ্ডপুরস্কার বিধানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি, যাহাতে তাহারা নির্ভীক চিত্তে আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে।

তাহারা প্রজাবর্গের সুখদুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদের সুখবর্দ্ধন ও দুঃখ মোচন করিতে যত্নশীল হইবে। আপনাপন অধীনস্থ কর্ম্মচারী কর্তৃক তাহাদের ঐহিক পারত্রিক হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবে।

---

* ইহার মধ্যে (১) এবং (৬) এই দুইটির মূল এখনো ঠিক জানা যায় নাই, —অন্য বচনগুলি ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

পিতা যেমন বালককে সুদক্ষ রক্ষকের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, সেইরূপ আমার কর্ম্মাধ্যক্ষগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে প্রজার হিত সাধনার্থে নিয়োগ করিলাম। আর একটি এই নিয়ম বাঁধিয়া দিতেছি যে, যে-সকল অপরাধী প্রাণদণ্ড বিধানে বন্দী রহিয়াছে, তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য যেন তিনদিন সময় দেওয়া হয়।

যদিও সে দণ্ড অপরিহার্য্য হয়, তথাপি অপরাধীদের পারলৌকিক সুগতি ও প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উত্তেজনা করা আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫। **প্রাণীহত্যা ও পীড়ন নিবারণের ব্যবস্থা।—**

কোন প্রাণী প্রাণীদিগের আহার্য্য স্বরূপে ব্যবহৃত হইবে না। পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্ব্বদিনে মৎস্যাদি ধরা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

বন্দীগণের মুক্তিদান।—আমার ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে ২৫ বার বন্দীদিগের কারামোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

৬। সম্রাটের উপদেশ এই যে, স্বধর্ম্ম পালন করাই মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাহাদের ধর্ম্ম যাহাই হৌক, সকল সম্প্রদায়ের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

৭। **ধর্ম্মপ্রচারের নিয়ম।—**

কূপ খনন, বৃক্ষ রোপণ, পান্থশালা নির্ম্মাণ, ধর্ম্মাধিকারী নিয়োগ।

সৎপাত্রে দান।—কেবলমাত্র আমার নিজস্ব দান নহে, যাহা যাহা আমার মহিষীদিগের দান, তাহা যোগ্যপাত্রে বিতরিত হয়, ইহাই আমার আদেশ।

আমার অনুশাসনগুলি যাহাতে শাশ্বত কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি এই সকল স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।*

উল্লিখিত সপ্ত প্রধান স্তম্ভলিপি ব্যতীত চারিটি অপ্রধান স্তম্ভ-অনুশাসন আছে।

* ১।২। ইহার মধ্যে দুইটি স্তম্ভ (ফিরোজ সা লাট) ফিরোজ সা বাদসার আদেশে সিবালিক এবং মিরাট হইতে স্থানান্তরিত হইয়া দিল্লীতে রাখা হইয়াছে।

৩। আলাহাবাদ—প্রয়াগের দুর্গ মধ্যে।

৪। লৌরিয়া—বেটিয়ার নিকটস্থ লৌরিয়া গ্রামে।

৫। লৌরিয়া—পাটনার উত্তর পশ্চিম ৭৭ মাইল।

১। সারনাথ।* সম্ভবত পাটলিপুত্র সভায় সমসাময়িক (২৪০—২৩২)।

২। কৌশাম্বী।

৩। কাঞ্চী।

এই অনুশাসন ত্রয়ের মর্ম্ম এই, যে-কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সঙ্ঘের মধ্যে বিরোধ সংঘটন করে, সে দণ্ডনীয়। সাধুজনোচিত অভ্যস্ত গৈরিক বসন কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার করা হইবে,—কারণ সঙ্ঘের ঐক্যবন্ধন ও স্থায়িত্ব সম্রাটের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪। দ্বিতীয় মহিষী কুরুবকীর দানের ব্যবস্থা।

আম্রবন, প্রমোদোদ্যান, অন্নছত্র, যাহাই হোক—মহিষীর নামে এই সকল দানের সুব্যবস্থা হয়—ইহাই সম্রাটের অনুজ্ঞা।

নেপাল তরাই হইতে সংগৃহীত

দুইটি স্মারক-লিপি।—

১। বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনী উদ্যানে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা। রাজস্বের অষ্টমাংশ ব্যতীত রাজপ্রাপ্য অন্যান্য সকল কর হইতে এই গ্রামের প্রজাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। (রুমিন্দেই লেখ)

২। পূর্ব্ববুদ্ধ কনক মুনির সমাধিক্ষেত্রে স্তূপ স্থাপন।

ধর্ম্ম মহামাত্র—প্রতিবেদক।

এই সমস্ত অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে, অশোকের রাজত্ব কালে "ধর্ম্ম মহামাত্র" নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন,—ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষণ এবং ধর্ম্মপ্রচার, এই দুই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। প্রজাবর্গের নিম্নস্তরের ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ আবশ্যক, এই হেতু অনার্য্য জাতিগণের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন উল্লিখিত ধর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নাম প্রতিবেদক, প্রজাদিগের নীতি সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করা তাহাদেরও কার্য্য ছিল। প্রজাদের আচার ব্যবহার হিতাহিত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধীয় সকল সংবাদ প্রতিবেদকেরা মহারাজের নিকট আনিয়া দিতেন।

---

* বারাণসীর মৃগদাব, যাহা ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের পুণ্যভূমি, তাহা এক্ষণে সারনাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে সিংহচতুষ্টয় মণ্ডিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যসমন্বিত যে একটি অশোক-স্তম্ভের শিরোভাগ কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দর্শনীয়।

অশোক স্বীয় রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হন নাই,—পথের ধারে বৃক্ষরোপণ, কূপবাপী খনন, পশুহিংসা নিবারণ, পশু ও মনুষ্যের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপন, অন্তঃপুরবাসিনী ও আর আর লোকের জন্য ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন,—এইরূপ বিবিধ উপায়ে প্রজাগণের হিতসাধনের চেষ্টা পান। তাঁহার অনুশাসন লিপিতে এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং কর্ম্মচারী নিয়োগের বার্ত্তা লিখিত আছে।

অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের তৃতীয় মহাসভা হয়, সে সভায় প্রায় ১০০০ স্থবির ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। মুদ্গলপুর তিষ্য তাহার অধ্যক্ষস্থানে ছিলেন এবং সভার কার্য্য প্রায় ৯ মাস ধরিয়া চলে। বিনয় ও ধর্ম্মের পাঠ ও আবৃত্তি—তাহার কোন্ ভাগ শাস্ত্রীয় কোন্ ভাগ অশাস্ত্রীয়—কি গ্রাহ্য কি ত্যজ্য তাহা নিরূপণ, আদিসমাজের নিয়ম ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক মত খণ্ডন ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা বলা আবশ্যক যে, উত্তর দেশীয় বৌদ্ধশাস্ত্রে এই পাটলিপুত্র সভার কোন উল্লেখ নাই; ইহার বিষয় যাহা কিছু জানা যায়, তাহা একদেশ-দর্শী দক্ষিণ শাখার গ্রন্থসকল হইতে জানা গিয়াছে, বিরুদ্ধ পক্ষের কথা শুনিতে পাইলে এ সভার বিবরণ আরো স্পষ্ট বুঝা যাইত।

কিন্তু এ সভার শাস্ত্রীয় বিচার যাহাই হউক না কেন, ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ইহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হয়, এবং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করায় ইহার সমধিক গৌরব বলিতে হইবে। সভার কার্য্য শেষ হইবামাত্র অশোক রাজা কাশ্মীর, গান্ধার, মহীশূর, বনবাস (রাজস্থান), অপরন্তক (পশ্চিম পাঞ্জাব), মহারাষ্ট্র, যবন লোক (বক্ট্রিয়া ও গ্রীক রাজ্য), হিমালয়, স্বর্ণ ভূমি (মলয়) এবং লঙ্কাদ্বীপে ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রেরণ করেন। অশোকের অনুশাসন লিপিতে আরো অনেক দেশের নাম পাওয়া যায়; চোলা (তাঞ্জোর), পাণ্ড্য (মদুরা), সাতপুর (নর্ম্মদার দক্ষিণ পর্ব্বতশ্রেণী) এবং আণ্টিয়োকসের গ্রীকরাজ্য, এই সকল দেশকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করা অশোকের মনোগত অভিপ্রায় ছিল, এবং তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন ধর্ম্মবিজয়ই সমধিক বাঞ্ছনীয় ও আনন্দজনক।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে অশোক যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশ বিদেশে প্রেরণ করেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার নিজের পুত্র* মহেন্দ্রের সিংহল প্রয়াণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন দেবানাং প্রিয় তিষ্য সিংহলের রাজা, তাঁহার নিকট অশোকপুত্র* মহেন্দ্র দলবলে উপস্থিত হয়েন। তিষ্য তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা

* কোন কোন গ্রন্থকারের মতে মহেন্দ্র অশোক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

করেন ও আপনি অনতিকালবিলম্বে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অনুরাধাপুরের অনতিদূরে মহিন্তালী পর্ব্বত শিখরে যে বৌদ্ধ মঠ আছে, তাহা তাঁহারই আদেশক্রমে নির্ম্মিত হয়। এই পর্ব্বতাশ্রমে মহেন্দ্র কতিপয় বৎসর যাপন করেন। পাহাড় খুদিয়া তাঁহার জন্য যে গুহাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্নসকল অদ্যাপি বর্ত্তমান। মহেন্দ্রের পর্ব্বতাশ্রম হইতে নিম্নদেশস্থ সুবিস্তৃত অধিত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়। গিরিচ্ছত্র ছায়ায় আশ্রমটী সূর্য্যকিরণ হইতে সুরক্ষিত। জনমানব নাই, সকলি নিস্তব্ধ; নিম্নদেশ হইতেও জনকোলাহল শ্রুতি-গোচর হয় না, কেবল ভ্রমরের গুণগুণ শব্দ ও বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ Rhys Davids এই আশ্রম দর্শন করিয়া বলিয়াছেন "এই শান্তিপূর্ণ শীতল কক্ষে প্রবেশ করিয়া যেদিন এই স্থান দর্শন করিলাম—এই সুন্দর বিজন স্থান যেখানে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই মহোৎসাহী ধর্ম্মপ্রচারক ধ্যান করিতেন ও লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন—সে দিন আমার স্মৃতি-পথ হইতে কখনই অপসারিত হইবার নহে।"

রাজার অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহেন্দ্র তাঁহার বৌদ্ধ ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাকে ডাকিয়া আনাইলেন। পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সঙ্ঘমিত্রা কতকগুলি ভিক্ষুণীসহ সিংহলে উপস্থিত হইলেন ও নূতন শিষ্যদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

সঙ্ঘমিত্রা সঙ্গে করিয়া বোধিবৃক্ষের এক বৃক্ষশাখা লইয়া আসেন—সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ, যাহার তলে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই শাখা অনুরাধাপুরে রোপিত হয় ও ইহা বদ্ধমূল হইয়া এইক্ষণে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতিহাসিক বৃক্ষের মধ্যে ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া বিখ্যাত। খৃঃ পূঃ ২৮৮ শতাব্দে ইহা রোপিত, সুতরাং ইহার বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইবে।

সিংহলে এই ধর্ম্মের প্রভাব অব্যাহত ছিল।

দেবানাংপ্রিয় তিষ্য—যাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়—৪০ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তীয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন। তিষ্যের মৃত্যু হইতে অভয় দত্তগামিনীর রাজ্যপ্রাপ্তির মধ্যে প্রায় ৯৬ বৎসর অতিবাহিত হয়। দত্তগামিনীর রাজ্যারম্ভ মোটামুটি খৃঃ পূঃ ১১০ ধরা যাইতে পারে।

এই রাজা সঙ্ঘের প্রধান পরিপোষক ছিলেন এবং স্তূপ, বিহার, লৌহ-প্রাসাদ, স্তম্ভ প্রভৃতি ইমারতসকল নির্ম্মাণ করেন। গৌতমের মৃত্যুর ৩৩০

বৎসর পরে বত্ত-গামনীর রাজত্বকালে ত্রিপিটক বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলী হইতে পালি ভাষায় প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। (৩মহাবংশ)

মহেন্দ্রের কয়েক শতাব্দী পরে বুদ্ধঘোষ সিংহলে আসিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্য (অর্থকথা) প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। মহেন্দ্রের নীচেই তাঁহার নাম সিংহলে প্রকীর্ত্তিত। ৪৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গমনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে শ্যামদেশে ঐ ধর্ম্ম প্রবেশ করে, তথা হইতে সুমাত্রা যবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য স্থানে নীত হয়। সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে অনেকানেক বৌদ্ধ ভিক্ষু তিব্বত, নেপাল, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে গমন করত ধর্ম্ম প্রচার করেন। ধন্য তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ! ধন্য তাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়।

গ্রীকরাজ মিলিন্দ।—

খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সময় ভারতে গ্রীকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও ঐ ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীকরাজ মিলিন্দের মধ্যে যে বৌদ্ধমত সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা আছে, তাহাতে নাগসেন যবনরাজের সমুদয় যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিয়া কিরূপে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বৌদ্ধ তপস্বীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজা কনিষ্ক।—

খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের কিছু পূর্ব্বে এক শক-জাতীয় নৃপতি উত্তর ভারতখণ্ডে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। ঐ জাতীয় তৃতীয় রাজা কনিষ্ক কাবুল হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত এক সুবিস্তৃত রাজ্য পত্তন করিয়া যান। কাশ্মীর তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ক একজন উৎসাহী বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার গুরু পার্শ্বকের পরামর্শানুসারে জালন্ধরে ৫০০ ভিক্ষুর এক মহাসভা আহ্বান করেন, বসুমিত্র তাহার সভাপতি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সভায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের তিনটী মহাভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই সকল গ্রন্থ হইতে মূলধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন সাহায্য হয় নাই। দক্ষিণে প্রথম হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রসমুদায় পালি ভাষায় প্রস্তুত হওয়াতে ধর্ম্মবিষয়ক উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকাংশে নিবারিত হয়; উত্তরে সেরূপ দেখা যায় না। সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম কোন বন্ধন না পাইয়া কামরূপী মেঘের ন্যায় নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। হুয়েন সাং বলেন, এই

ত্রিভাষ্য কতিপয় তাম্রপত্রে মুদ্রিত এবং এক প্রস্তরনির্ম্মিত বাক্সে বদ্ধ হইয়া মাটীতে পুঁতিয়া রাখা হয় ও তদুপরি এক দাঘোবা নির্ম্মিত হয়। হুয়েন সাঙের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হয়ত এই ত্রিভাষ্য এখনও পর্য্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত আছে, ঐ স্থানে খনন করিতে করিতে ঐ বহুমূল্য তাম্রপাত্রগুলি আবিষ্কৃত হইয়া বৌদ্ধ-সমাজে প্রচারিত হইতে পারে—আশ্চর্য্য কি?

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

৬১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত পত্তন হয়। প্রবাদ এই যে, তখনকার সম্রাট মিং তি স্বপ্ন দেখেন একটি সোণার দেবতা তাঁহার প্রাসাদে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তাহার অর্থ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রী এই অর্থ করেন যে পশ্চিমাঞ্চলে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছে, হয়ত তাঁহার সঙ্গে এই স্বপ্নের কোন যোগ থাকিবে। চীন সম্রাট বুদ্ধের আসল তথ্য জানিবার নিমিত্ত ভারতে দূত প্রেরণ করেন। দূতগণ দুই জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পুঁথি ছবি প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস লইয়া প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট ভিক্ষুদের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজধানীতে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। সেই সময় হইতে চীন দেশে অল্পে অল্পে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইতে লাগিল। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী কুমারজীব অপর ৮০০ ভিক্ষুক সাহায্যে চীন ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেন। বুদ্ধঘোষ-কৃত বুদ্ধচরিত কাব্য উদীচ্য Liang বংশের রাজত্বকালে খৃঃ ৪১৪ হইতে ৪২১ অব্দ মধ্যে ধর্ম্মরক্ষক নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, চারিটি, সূর্য্যোদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে, বুদ্ধচরিত কাব্য প্রণেতা বুদ্ধঘোষ উঁহাদের অন্যতম। তৎপরে ফাহিয়ান, হুয়েন সাং, ইৎসিং প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকগণ ভারতের তীর্থ হইতে ফিরিয়া স্বদেশে ঐ ধর্ম্ম বিস্তার করেন; ক্রমে কনফ্যুসস্, তাও-মত ও অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারের সংশ্রবে চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম এই ক্ষণকার বিমিশ্র ভাব ধারণ করিয়াছে। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে চীন ও কোরিয়া হইতে ঐ ধর্ম্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপ দক্ষিণে উত্তরে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া যায়।

মার্কিণ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণে সিংহল শ্যাম ব্রহ্মাদি দেশে, উত্তরে নেপাল তিব্বত কাবুল গান্ধার, পূর্ব্বে চীন, চীন হইতে মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া জাপান ও মধ্য এসিয়া খণ্ডে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম 'দূরাৎ সুদূরে' ছড়াইয়া পড়ে—

এসকল ত জানা কথা ; কিন্তু কলম্বসের আবিষ্ক্রিয়ার ১০০০ বৎসর পূর্ব্বেও যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ ঐ ধর্ম্ম আমেরিকায় লইয়া যান, এ কথা অনেকের নূতন ঠেকিবে। বাস্তবিক যে তাহাই ঘটিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিষয়টী এরূপ কৌতুকাবহ যে, পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। "কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়া" শীর্ষক একটী সচিত্র প্রবন্ধ আমেরিকার এক মাসিক পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, এই স্থলে তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল ; যাঁহারা সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ পত্র আনাইয়া দেখিবেন।

কতকগুলি প্রমাণ হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু রুষের উত্তর সীমা কামস্কাট্কা হইতে পাসিফিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আলাস্কা দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ পথ দিয়া আমেরিকা যাত্রা দুরূহ ব্যাপার নহে ; মধ্যে যে আল্যুসিয়াদি দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া কি সহজে আমেরিকা পৌছান যায়, মানচিত্র দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন ; বলিতে কি, চীন পরিব্রাজকদিগের স্থলপথ দিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ অপেক্ষা অনেক সহজ। মেক্সিকো ও তৎসন্নিহিত আদিম আমেরিকানদের ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপের চিহ্নসকল এই ঘটনার সত্যতা বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলীতে ফুস নামক এক পূর্ব্বদেশের উল্লেখ আছে, সে দেশের এক বৃক্ষ হইতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো দেশে 'আগুয়ে' বা 'মাগুয়ে' যে বৃক্ষ জন্মে, তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, তার লেখাটী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই যাহা লেখকের কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, হুই-সেন কাবুলবাসী ছিলেন, ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে য়ু-আন সম্রাটের রাজত্ব কালে ফুসন হইতে কিঞ্চেন রাজধানীতে আগমন করেন। তখন রাজ্য-বিপ্লব বশতঃ তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহ থামিয়া গেলে পরবর্ত্তী নূতন সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি ফুসং হইতে কৌতুকজনক নানা নূতন নূতন সামগ্রী ভেট লইয়া আসেন, তাহার মধ্যে একরকম কাপড় ছিল, তাহা রেশমের মত নরম অথচ তার সূতা এরূপ কঠিন যে, কোন ভারি জিনিস ঝুলাইয়া রাখিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। মেক্সিকোর 'আগুয়ে' গাছ হইতেও ঐ রকম রেশম উৎপন্ন হয়। আর একটী সুন্দর ছোট দর্পণ উপহার দেন, যাহার

অনুরূপ দর্পণ মেক্সিকো অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। রাজাজ্ঞায় হুই-সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার কথামত লিখিয়া লওয়া হয়, তাহার সারাংশ এই :—

পূর্ব্বে ফুসংবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুই জানিত না, ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে সুং বংশীয় তা-মিং সম্রাটের রাজত্বকালে কাবুল হইতে পাঁচজন বৌদ্ধভিক্ষু ফুসং গমন করত সে ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরূপে দীক্ষিত হয়, ও তখন হইতে লোকদের রীতিনীতি সংশোধন আরম্ভ হয়। পরিব্রাজক ভিক্ষুরা কামস্কাট্‌টা হইতে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে যাত্রা করেন, কোন্ পথ কত দূর অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ, ঐ গ্রন্থে সকলি বিন্যস্ত আছে। ফুসং বৃক্ষের গুণাগুণ, তার ছাল হইতে সূতা বাহির হওয়া ও বস্ত্র বয়ন এবং তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যথাযথ বর্ণিত আছে। সেদেশে একপ্রকার রাঙ্গা পিয়ারা ও প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মানোর কথা আছে, যাহা মেক্সিকো প্রদেশের ফলের সঙ্গে ঠিক মেলে। ও দেশে তাম্র পাওয়া যায়, লৌহ খনি নাই, সোনা রূপার ব্যবহার নাই, জিনিসের দরের ঠিক নাই। ওখানকার লোকেদের রাজ্যতন্ত্র, রীতিনীতি, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি, নগর দুর্গ সেনা ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, এই সকল বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত আদিম আমেরিকা, বিশেষতঃ মেক্সিকো অঞ্চলে যাহা দেখা যায়, তাহার চমৎকার ঐক্য দৃষ্ট হইবে।

মেক্সিকোবাসীদের মধ্যে এক জনশ্রুতি আছে যে, একজন শ্বেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন তার উপর এক আলখাল্লা, এই বেশে আগমন করেন। তিনি লোকদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায় সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত ব্যবহারধর্ম্মের উপদেশ দেন। পরে সেই সাধু পুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়াতে, তিনি প্রাণভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই সন্ধান পাইল না, শুধু এক পাহাড়ের উপর তাঁর পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন। তাঁহার স্মরণার্থ ম্যাগডালিনা গ্রামে তাঁহার এক প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তার নাম উই-সি-পোকোকা, সম্ভবতঃ 'হুই-সেন-ভিক্ষু' নামের অপভ্রংশ। আর একজন বিদেশী ভিক্ষু কতকগুলি অনুচর সঙ্গে প্যাসিফিক সাগর তীরে আসিয়া নামেন। হয়ত তাঁহারা উল্লিখিত পঞ্চ ভিক্ষু। এই সকল ভিক্ষুরা যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তাহা অনেকটা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। স্প্যানিষ জাতি কর্ত্তৃক আমেরিকা বিজয় কালে তাঁহারা মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার জনপদে যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন; তাহাদের শিল্প, গৃহনির্ম্মাণ-কৌশল, মাস গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন,—এসিয়ার ধর্ম্ম ও সভ্যতার সহিত তাহার এমন

আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য যে, তাহা দুই দেশের পরস্পর লোকসমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

আর এক প্রকার [illegible] তাহা ভাষাগত। এসিয়া খণ্ডে 'বুদ্ধ' নামের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্মনাম গৌতম এবং জাতীয় নাম শাক্যই প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপভ্রংশ শব্দ মেক্সিকোর প্রদেশসমূহের নামে মিলিয়া গিয়াছে। দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধিও ঐরূপ সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক।

গ্বাতেমালা=গৌতম আলয়, হুয়াতামো ইত্যাদি স্থানের নাম; পুরোহিতের নাম গ্বাতেমোট্-জিন—'গৌতম' হইতে ব্যুৎপন্ন বোধ হয়। ওয়াক্সাকা, জাকাটেকাস, শাকাটাপেক, জাকাটলাম, শাকা পুলাস—এই সকলের আদি পদে শাক্য নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। মিক্‌স্‌টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্ছে "তায়-সাক্কা" অর্থাৎ শাক্যের মানুষ। পালেঙ্কে একটী বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার নাম "শাক্-মোল" (শাক্যমুনি)। কোলোরাডো নদীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে একজন পুরোহিত বাস করিতেন, তাঁর নাম গৌতুশাক্কা (গৌতম শাক্য)। তিব্বতী কোন নাম চা'ন ত দেখিতে পাইবেন মেক্সিকোর পুরোহিতের নাম ত্লামা। আর এক কথা, মেক্সিকো দেশের নাম সেখানকার এক বৃক্ষ হইতে হইয়াছে; হুই-সেন যদি ঐ দেশে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে ফুসং বৃক্ষ হইতে দেশের নামকরণ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমেরিকায় এমন কতকগুলি জিনিস পাওয়া গিয়াছে, যাহা সে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের মূর্ত্তিমান প্রমাণ স্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ-ভিক্ষু মূর্ত্তি, হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় কোন জন্তু নাই), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ বিহার অলঙ্কার, এই সকল জিনিসে বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অধ্যাপক ফ্রায়র (Fryer)* স্থির করিয়াছেন যে, ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ প্রচার কার্য্যে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক বিঘ্ন বাধা আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কার্যসিদ্ধিও করিয়াছিলেন। এইক্ষণে জাপানের সিন্-স্যু বৌদ্ধ

*"The Buddhist Discovery of America,"
Harper's Magazin,
July, 1901.

সম্প্রদায়ী তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হইয়াছেন। স্যানফ্রান্সিস্কো সহর তাঁহাদের মিসনের পীঠস্থান। ইহার মধ্যে তাঁহারা ক্যালিফর্ণিয়া অঞ্চলে পাঁচজন প্রচারক প্রেরণ করিয়া মিসনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রচারকেরা সেখানে যে ধর্ম্ম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ৫০০ জাপানী বৌদ্ধ তাহার সভ্য। ক্যালিফর্ণিয়ার আর আর সহরে এই সভার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকানদের জন্য প্রতি রবিবারে ইংরাজী ভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনাদি হইয়া থাকে। বিংশতি বা ততোধিক আমেরিকান তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ১১ জন আমেরিকান বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়াছেন, ইহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সারবত্তার সামান্য পরিচায়ক নহে।

উপসংহার।—

গৌতম যদি শুধু দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে কৃতকার্য্য হইতেন কি না সন্দেহ। ন্যায় সাংখ্য বেদান্তাদি ষড় দর্শনের পাশে হয়ত বৌদ্ধ দর্শন সাত ভাইয়ের এক ভাই বলিয়া গণ্য হইত, আর কিছু নয়। সেইরূপ আবার বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রবলেও হিন্দু-সমাজ বিকম্পিত হইত না। জাতি বর্ণ ছোট বড় বিচার না করিয়া বুদ্ধদেব সাধারণ সকল মনুষ্যের উপযোগী বিশুদ্ধ ব্যবহারধর্ম্মের শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট নীতিশিক্ষা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্রেরও অঙ্গীভূত, সেরূপ উচ্চ শিক্ষার গুণে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। বাকী রহিল বিনয়-শাস্ত্র নিয়মে বৌদ্ধ-সমাজ বন্ধন, এক কথায় 'সঙ্ঘ'—এই এক শক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের মুখ্য সাধন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহা ছাড়া, সেই সময়কার রাজকীয় অবস্থাও এই নূতন ধর্ম্ম বিস্তার পক্ষে অনুকূল বলিতে হইবে। নানাদিক হইতে নানা প্রকার শক্তি আসিয়া তখন ভারতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে দেশীয় আচার বিচারের অনেক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্ম কতকগুলি কর্ম্মজালে আচ্ছন্ন হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। সেই সময় আবার সেকন্দর-সা'র ভারত আক্রমণ হইতে যবন আধিপত্যের সূত্রপাত; অবশেষে গ্রীক প্রতাপ রোধ করিয়া মৌর্য্যবংশীয় শূদ্র রাজাদের অভ্যুদয়। সেকন্দর এদেশে কোন চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধ রাজ্য অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্ত জাতিতে শূদ্র ছিলেন। মৌর্য্যবংশীয় শূদ্র রাজাদের রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার। মৌর্য্যবংশীয় রাজাদের এই

ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক টান থাকা স্বাভাবিক। ভারতে এ দুইই নূতন শক্তি, উভয়েই ব্রাহ্মণ্যের বিরোধী—বৈদিক ধর্ম্মাসনে বৌদ্ধধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের আসনে শূদ্র রাজা। শীঘ্রই এই দুই দলের মধ্যে সখ্যবন্ধন হইল। অশোক রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও পোষণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এবং রাজকীয় দূরদর্শিতা দুয়েরই পরিচয় দিলেন। দূর দূরস্থিত রাজাদের সহিত অশোকের মিত্রতা বন্ধন এই ধর্ম্ম প্রচারের আনুষঙ্গিক ফল। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রকে দিয়া দাক্ষিণাত্যেও তিনি তাহার ধর্ম্মাধিকার বিস্তার করিলেন। পরে একদিকে যেমন মৌর্য্যবংশের অবনতি হইল, অন্যদিকে, অর্থাৎ ভারতের উত্তর খণ্ডে, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক্, পার্থিয়ান শকজাতির প্রভুত্ব বিস্তার হইতে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এই রাজ্য-বিপ্লবের ফলভাগী হইলেন। ব্রাহ্মণ্য কেবল হিন্দু জাতিতেই আবদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি। যবন রাজাদের সঙ্গে উত্তর হইতে যে সকল অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করিল, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদের আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। তা ছাড়া অশোকের প্রতাপে যেমন দাক্ষিণাত্য বিজিত হইয়াছিল, ঐ সকল রাজার প্রভুত্ববলে তেমনি হিমালয়ের ওদিক্‌কার প্রদেশ, আফগানিস্থান, বাক্তিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে তাহার প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হইল।

উদয়াচল হইতে মধ্যাহ্নে উঠিয়া পরে ঐ ধর্ম্ম কালক্রমে অস্তোন্মুখ হইল। একদিকে যেমন সঙ্ঘ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতি, আবার সে ধর্ম্মের পতনের কারণও সেই সঙ্ঘ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মজ্জাগত একটী ঔদার্য্য আছে, তাহাতে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদিগকে স্বদলে টানিয়া লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন নহে। মত ও বিশ্বাসের প্রভেদে তাঁহার এমন কিছু যায় আসে না। মতের অমিলে তিনি খ্রীষ্টীয় ইনকিজিসানের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু একটী বিষয় তাঁহার অসহনীয়, সে কি না বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ —জাতি-ভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদ-চেষ্টা। কোন নূতন সম্প্রদায় যতক্ষণ হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী হইয়া না দাঁড়ায়, ততক্ষণ তাহাদের মতামত তিনি নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি করেন। এই হেতু বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রও নয়, বৌদ্ধ নীতি শাস্ত্রও নয়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যের বৈরভাব হইবার কারণ অন্য। আমার মতে "সঙ্ঘ"—তাহার খাঁটী ধর্ম্মভাগটুকু নয়, সঙ্ঘের সামাজিক বন্ধন—দুই প্রতিযোগী ধর্ম্মের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রধান কারণ। যখন বৌদ্ধ-সঙ্ঘ কতকগুলি বিশেষ নিয়মে গঠিত হইয়া হিন্দু-সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল, যখন সে ব্রাহ্মণ শূদ্র গৃহী সন্ন্যাসী সকলকেই অবাধে স্বদলভুক্ত করিতে লাগিল; বিশেষতঃ যখন রাজারা, ধনাঢ্য গৃহস্থেরাও তাহাকে বহুমূল্য দানাদি দ্বারা প্রশ্রয়

দিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—তখন তাহা হিন্দুসমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ্য স্বীয় আধিপত্য ও অর্থোপার্জ্জনের পথ যুগপৎ অবরুদ্ধ দেখিয়া তাহার বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইল। আমার মনে হয় বেদাচারবিরুদ্ধ সঙ্ঘের স্বতন্ত্র গঠন প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাঙ্ঘাতিক বিরোধের সূত্রপাত। একদিকে ব্রাহ্মণ্যের গৃহাশ্রম, অন্যদিকে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসধর্ম্ম; এক সমাজ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্য সমাজ মনুষ্যের সাম্যবাদী কঠোর ধর্ম্মনীতিমূলক; এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি কতদিন আর শান্তি সদ্ভাবে কার্য্য করিবে? এই বিরোধ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অবশেষে ব্রাহ্মণ্যের জয়, বৌদ্ধধর্ম্মের পতন সঙ্ঘটিত হইল।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম কোনকালে সমূলে নির্ম্মূল হয় নাই। অনেক বৎসর ধরিয়া এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর শান্তি সদ্ভাবে একত্রে বাস করে। হুয়েন সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, রাজা শিলাদিত্য ব্রাহ্মণ্য শ্রমণ উভয় পক্ষেরই আনুকূল্য করিতেন, উভয় দলকেই আমন্ত্রণ দানাদির দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিবার প্রয়াসী ছিলেন। প্রয়াগে যখন তাঁহার মহাসভা হয়, তখন তাহাতে উভয়ধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্যদের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা চলে, এবং বুদ্ধ সবিতা শিবমূর্ত্তি এক এক দিন এক এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয়। নাগানন্দ নামক বৌদ্ধ নাটক ঐ সময়কার প্রণীত, তাহাতেও বিভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়; ঐ নাটকের নান্দীতে 'মারদুহিতা অপ্সরাগণের মায়ামন্ত্রে অপরাজিত' ধর্ম্মবীর বুদ্ধের অবতারণা আছে। ইলোরা ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু গুহামন্দির পাশাপাশি দেখা যায়, তাহাও এই দুই ধর্ম্মের সদ্ভাব-সূচক। খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দেও পশ্চিমাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব উপলক্ষিত হয়। বেহার ও গোদাবরী প্রদেশে খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ নৃপতিগণের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের নিতান্ত হীনাবস্থা। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক, যাহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মণ্যের আসন্ন বিজয় সূচিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহার চিহ্নসকল স্থানে স্থানে বর্ত্তমান, তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপে কোথা হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, আশ্চর্য্য!

বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস—কারণ-নির্ণয়।—

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার কারণ কি? এই প্রশ্ন লোকের মনে সহজেই উৎপন্ন হয়, এবং ইহার উত্তরে নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত

করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও মুসলমানদের উৎপীড়নে বৌদ্ধেরা এদেশ হইতে বিতাড়িত হয়; এ মত যে নিতান্ত অমূলক তাহাও বলা যায় না। হিন্দুরা এক সময় বৌদ্ধদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহার উদাহরণ স্বরূপ রাজা সুধন্বার নৃশংস আদেশ-পত্র প্রকটিত হইয়াছে। তেমনি আবার মুসলমানেরা মুণ্ডিতমস্তকগণকে যারপরনাই উৎপীড়ন করেন—তাহাদের তীর্থক্ষেত্রসকল লণ্ডভণ্ড বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা মানিয়া নিলেও, এইরূপ স্থানীয় সাময়িক অত্যাচার বৌদ্ধধর্ম্মের সমূল উৎপাটনের প্রকৃত কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। যে দেশ ধর্ম্মবিষয়ক এমন ঔদার্য্যগুণের জন্ত প্রথিত, যে দেশে পরস্পরবিরোধী এত প্রকার মত ও সম্প্রদায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবাধে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, সে দেশ হইতে নিরীহ বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী তাড়াইবার জন্য কেনই বা সকলে খড়্গহস্ত হইবে? আর এক দলের মত এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত হয় নাই—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত আস্তে আস্তে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার নিজস্ব মতসম্পত্তির বিনিময়ে ব্রাহ্মণ্যের কতকাংশ হরণ করিলেন—ব্রাহ্মণ্যও কতক কতক বিষয়ে প্রতিপক্ষের মত ও ভাব গ্রহণ করিলেন; এইরূপে পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষীণ প্রাণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রখর ব্রহ্মতেজে বিলীন হইয়া গেল। আমার বিবেচনায় এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব। শৈব শাক্ত তান্ত্রিক মত বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহার যে কি রূপান্তর ও বিকৃতি উৎপাদন করিয়াছে আমরা তাহা কতক কতক দেখিয়াছি; এইরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিতও তাহার আদান প্রদান সংঘটিত হয় সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ঐকান্তিক দুঃখবাদরূপ কঠোর ধর্ম্মনীতির কাঠিন্য নিবারণচেষ্টা—আত্মপ্রভাবের সহিত দেবপ্রসাদের সংমিশ্রণ—নিরীশ্বরবাদের স্থানে বুদ্ধ-দেবাদির পূজার্চ্চনা—নির্ব্বাণের স্থানে স্বর্গনরক কল্পনা—এই সমস্ত পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব বিলক্ষণ প্রতিভাত হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপে তাঁর নিজস্বত্ব বিসর্জ্জন করিবার দরুণ আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আর একদিকে দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্ম্মের সার্ব্বভৌম প্রেম ও মৈত্রীভাব, অহিংসা দয়া দাক্ষিণ্য, মনুষ্যে মনুষ্যে সাম্যভাব ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ, বর্ণবিচার বর্জনে আপামর সাধারণের জ্ঞান-ধর্ম্মে সমান অধিকার, বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই সমস্ত উদার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক বৌদ্ধদের নিজের অস্ত্রে তাহাদিগকে মর্ম্মাহত করিলেন। অপিচ, বিষ্ণুর দশাবতার অবতারণ করিয়া বুদ্ধাবতারগণকে পদচ্যুত করিলেন—শুধু তা নয়, বুদ্ধদেবকেও আপনাদের

দেবমণ্ডলী মধ্যে স্থান দান করত আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। দেখুন হিন্দুরা লোকভুলানো মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগে কেমন পটু! তাঁহারা ধ্যানস্থ বুদ্ধকে যোগাসনারূঢ় মহাদেব গড়িয়া তুলিয়াছেন, কত কত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধক্ষেত্র আপনাদের তীর্থ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধদের ধর্মক্রিয়া যাত্রা মহোৎসবাদিরও অনুকরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বুদ্ধগয়ার একটি দেবালয়ে একখানি গোলাকৃতি প্রস্তরে ছুইটি পদচিহ্ন আছে। ঐ দেবালয়ের নাম বুদ্ধপদ ছিল, পরে তাহা বিষ্ণুপদ বলিয়া প্রচারিত হয়। গয়াও পূর্ব্বে বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল; পরে একটি প্রধান হিন্দুতীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গয়ামাহাত্ম্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, তীর্থযাত্রীরা বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবার পূর্বে বুদ্ধগয়া গমন পূর্ব্বক বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করিবেন—

ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধি তরুং নমেৎ।

জগন্নাথ ক্ষেত্র।—

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ব্যাপারটিও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বিলক্ষণ সংশ্লিষ্ট। জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটি জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাবতার স্থলে জগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়; জগন্নাথের ত্রিমূর্ত্তি, রথযাত্রা, বিষ্ণুপঞ্জর প্রবাদ, বর্ণবিচার পরিহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বৌদ্ধভাব প্রচ্ছন্ন দেখা যায়। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচার পরিত্যাগ হিন্দুধর্ম্মের অনুগত নয়—সাক্ষাৎ বৌদ্ধ-আদর্শ হইতে গৃহীত বলিলে বলা যায়। হুয়েন্ সাং উৎকলের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতটে চরিত্রপুর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। ঐ চরিত্রপুরই এইক্ষণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে পাঁচটি অত্যুন্নত স্তূপ ছিল। কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন তাহারই একটি জগন্নাথের মন্দির। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এই মন্দির প্রস্তুত হয়। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি কেশ প্রভৃতি দেহাবশেষ সমাহিত থাকে, ইহার দেখাদেখি জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জর অবস্থিত, এইরূপ এক প্রবাদ রটিয়া গিয়াছে। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতে তীর্থযাত্রার সময় পথিমধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটি বৌদ্ধ মহোৎসব সন্দর্শন করেন, তাহাতে এক রথে তিনটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধ মূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে ছুইটি বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। জগন্নাথের রথযাত্রা সম্ভবতঃ খোটানস্থ বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার অনুকরণ, এবং জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বৌদ্ধত্রিমূর্ত্তির রূপান্তর ভিন্ন আর

কিছুই নহে। স্তূপালের প্রায় ৯ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর বেতোয়া নদীতীরস্থ সাঞ্চিগ্রামে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অনেকগুলি স্তূপাদি আছে। সেই স্থানের দক্ষিণ দ্বারে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী তিনটি ধর্ম্মযন্ত্র একত্র খোদিত রহিয়াছে। কনিংহাম সাহেব ঐ তিনটি বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তির বিজ্ঞাপক হওয়াই অতিমাত্র সম্ভাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি সাঞ্চি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানাস্থান হইতে, এমন কি, শক রাজাদিগের মুদ্রা হইতেও ঐ ধর্ম্ম-যন্ত্র অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত তিনটি ধর্ম্মযন্ত্রের সহিত জগন্নাথাদির তিন মূর্ত্তির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কনিংহাম সাহেব ভিলসা স্তূপ বিষয়ক বত্রিশ সংখ্যক চিত্রপটে ঐ উভয়কেই পাশাপাশি করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন; দেখিলেই, শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণব ত্রিমূর্ত্তি উল্লিখিত তিনটি বৌদ্ধধর্ম্ম যন্ত্রের অনুকরণ বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়, বেশীর ভাগ কেবল চোখ নাক আর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ওষ্ঠ। বৌদ্ধেরা সচরাচর 'ধর্ম্ম'কে স্ত্রীরূপে কল্পনা করেন, প্রস্তরেও ধর্ম্মের স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। নেপালে এই ধর্ম্ম 'পারমিতা প্রজ্ঞা' রূপিণী দেবী। খুব সম্ভব ইনিই জগন্নাথের সুভদ্রা—এইরূপ নারীমধ্য ত্রিমূর্ত্তি অন্য কোন হিন্দু দেবালয়ে কোনরূপ পরিজ্ঞাত দেবাকৃতি নয়। তবেই হইতেছে জগন্নাথের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধপদের চক্রচিহ্ন সবিশেষ বর্ণিত আছে। বৌদ্ধেরা বহু-পূর্ব্বাবধি তাহার একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত থাকে। তাহাদের অনেকানেক মুদ্রাও ঐ চিহ্নে চিহ্নিত দেখা যায়। শ্রীক্ষেত্রে বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র খোদিত আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই বিষ্ণুচক্রকে বৌদ্ধদিগের ঐ বুদ্ধচক্র বলিয়া অনুমান করেন। জগন্নাথ ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট সুদর্শনের প্রতিরূপ দৃষ্ট হয় না, মিত্র মহাশয়ের উল্লিখিত অভিপ্রায়ই সমধিক সম্ভাবিত বলিতে হয়।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জগন্নাথক্ষেত্র পূর্ব্বে একটী বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, এই অনুমানটি একরূপ নিঃসংশয়ে নিষ্পন্ন হইতেছে।*

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—দ্বিতীয় ভাগ।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

The Antiquities of Orissa, Vol. II.

Dr. Rajendralal Mitra.

বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল বটে, তবুও হিন্দু, সমাজে তার পূর্ব্ব প্রভাবের যে কতকগুলি চিহ্ন রাখিয়া গেল, তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি, অনেক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, সে ঋণভার যেন বিস্মৃত না হই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৌদ্ধেরা ভারতে গৃহনির্ম্মাণ-বিদ্যার আদি গুরু—তাহাদের হস্তের কারুকার্য্যসকল সর্ব্বত্র তাহাদের অক্ষয় কীর্তি প্রচার করিতেছে। বৌদ্ধেরা কর্ম্মফলের অখণ্ডনীয় নিয়ম লোকের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। তাঁহারাই যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণ করিয়া, অহিংসা* ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। দেখুন, কবি জয়দেব কি বলিতেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে!

বৌদ্ধেরাই সংযম, স্বার্থত্যাগ, জলন্ত ধর্ম্মানুরাগ, উদার ভ্রাতৃ-বন্ধনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান; তাঁহাদের ব্যবহারধর্ম্মের প্রভাব হিন্দুসমাজ হইতে কখনই সম্পূর্ণ বিদূরিত হইবার নহে। বুদ্ধ-জীবনীর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, নিঃস্বার্থকতা ও উদার প্রেমগুণে সে ধর্ম্ম ভারতে চির-রঞ্জিত থাকিবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোকসংখ্যা গণনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর প্রায় ৫০ কোটী লোক বৌদ্ধ মতাবলম্বী। কেহ কেহ বলেন এ গণনায় অত্যুক্তি দোষ আছে। হিসাবে অনেক বাদসাদ দিয়া ধরিয়া নিলেও এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম্মের তুলনায় এ ধর্ম্মের ভক্ত-সংখ্যা নিতান্ত অবমাননার পাত্র নহে। এ ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় কে মনে করিতে পারিত—বুদ্ধদেব স্বয়ং

---

* বৌদ্ধদের ন্যায় জৈন-সম্প্রদায়ের লোকেরাও 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' পালন করিয়া থাকেন। ইহারা নিরামিষভোজী এবং অকারণ প্রাণীহত্যা নিবারণ উদ্দেশে সূর্য্যাস্ত পূর্ব্বে ইঁহাদের ভোজনের নিয়ম। তাহা ছাড়া ইঁহাদের অন্যান্য অনেক রীতিনীতি আচার ব্যবহারে জীবের প্রতি দয়া মায়া প্রকাশ পায়। কি জানি নিঃশ্বাস সহকারে কোন কীটপতঙ্গ উদরস্থ হয়, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ মুখে একরূপ বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখে। পশুর হাসপাতাল পিঞ্জরাপোল, এই হাসপাতালে জরাজীর্ণ রুগ্ন পশু গ্রহণ ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন জৈনদের অহিংসা ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত।

কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ইহা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমুদায় এসিয়া খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া অসংখ্য মানবকে আশ্রয় দান করিবে, অথচ ইহার নিজের জন্মভূমি ইহাকে দেখিবে না, চিনিবে না। আপন মাতৃক্রোড় হইতে বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীর অজ্ঞাতকুলশীল বিজন প্রান্তবর্ত্তী অধিবাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া বদ্ধমূল হওয়া আশ্চর্য্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। আপনারা এই বিচিত্র ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করুন। এ ধর্ম্ম জোরজবরদস্তীতে এ দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, কিম্বা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্ম্মে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, অথবা ইহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কাল-বিবরে প্রবিষ্ট হইল? হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান, হিন্দু আচার্য্যদিগের বুদ্ধি ও যুক্তিবল প্রয়োগ, মুসলমান অত্যাচার, বৌদ্ধধর্ম্মে ভজন পূজনের অনাদর, বেদাচারে অনাস্থা, অনাত্মবাদ, শূন্যবাদ, মন্ত্রতন্ত্র ভূতপ্রেত পিশাচ সিদ্ধি ইত্যাদি তান্ত্রিক কাণ্ডের প্রবেশজনিত আদিম ধর্ম্মের অশেষ দুর্গতি, হিন্দু-সমাজে সঙ্ঘ-নিয়ম প্রণালীর অনুপযোগিতা, উদ্বাহ বন্ধনের শৈথিল্য—এই ত বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংসের অনেকগুলি কারণ মনে হইতেছে। ইহাদের কোন্‌টা সযৌক্তিক, কোন্‌টা অমূলক, আপনারা তাহা নিরূপণ করুন, আমি এইখানে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

পরিশিষ্ট।

১। ধনিয়া সুত্ত।

(মহীতীরবাসী গোপাল ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন।)

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
১। ধনিয়ো গোপো:।	১। গোপাল ধনিয়া।
পক্কোদনো দুদ্ধখীরোঽহমস্মি	পক্ক অন্ন, গাভী-দুগ্ধ আছি খেয়ে পিয়ে,
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো,	মহীতীরে ভাই বন্ধু মিলি করি বাস;
ছন্না কুটী, আহিতো গিনি,	কুটীর ছায়িত, অগিনি আহিত,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
২। ভগবাঃ।	২। বুদ্ধদেব।
অক্কোধনো বিগতখিলো-ঽহমস্মি (১)	অক্রোধ বন্ধনশূন্য আমি যে এখন,
অনুতীরে মহিয়' একরত্তিবাসো,	মহীতীরে সবেমাত্র এক রাত্রি বাস;
বিবটা কুটী, নিব্বুতো গিনি,	গৃহ অনাবৃত, অগ্নি নির্ব্বাপিত,
অথ চে পত্থয়সিঁ পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
৩। ধনিয়ো গোপোঃ।	৩। ধনিয়া।
অন্ধকমকসা ন বিজ্জরে,	অন্ধক-মশক হতে মুক্ত ধেনুগুলি
কচ্ছে রূঢ়তিণে চরন্তি গাবো,	তৃণাচ্ছন্ন গোচারণে চরিয়া বেড়ায়,
বুটিটম্ পি সহেয়্যাম্ আগতম্,	আসুক্ না বৃষ্টি, না করিবে দৃষ্টি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

---

(১) বিগতখিলো

এই শব্দটী বেদ ও পালি সাহিত্য উভয়ে ব্যবহার আছে। সংস্কৃতে "কীল", গ্রাম্য ভাষায় "খিল্"। ইহার অর্থ গরু বাঁধার খুঁটি—তাহা হইতে, বাঁধা, বন্ধন। ফজ্‌বোল সাহেব ধনিয়া সুত্তের অনুবাদে (S. B. E. Series, Vol. & Part II). অর্থ করিয়াছেন, "Stubbornness", কিন্তু ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
৪। ভগবাঃ।	৪। বুদ্ধদেব।
বদ্ধা হি ভিসী সুসঙ্খতা	নৌকাখানি সুগঠন, বাঁধা আটে ঘাটে,
তিণ্ণো পারগতো বিনেয্য ওঘম্,	বড় বড় ঢেউ ঠেলি তাহে হৈনু পার ;
অথো ভিসিয়া ন বিজ্জতি,	নৌকায় এখন, বিনা প্রয়োজন,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
৫। ধনিয়ো গোপোঃ।	৫। ধনিয়া।
গোপী মম অস্সবা অলোলা (২)	গোপী মম সুচরিতা পতিব্রতা সতী,
দীঘরত্তম্ সমবাসিয়া মনাপা,	একত্রে করিনু ঘর দীর্ঘকাল ধরি ;
তস্স ন সুনামি কিঞ্চি পাপম্,	নাহি তার নামে, নিন্দা শুনি কাণে,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
৬। ভগবাঃ।	৬। বুদ্ধদেব।
চিত্তম্ মম অস্সবম্ বিমুত্তম্	চিত্ত মম সংযত স্বাধীন, বহুকাল
দীঘরত্তম্ পরিভাবিতম্ সুদন্তম্,	বহু তপস্যায় তায় আনিনু স্ববশে,
পাপম্ পন মে ন বিজ্জতি,	তাহে পাপলেশ, না করে প্রবেশ,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
৭। ধনিয়ো গোপোঃ।	৭। ধনিয়া।
অত্ত-বেতন-ভতোঽহমস্মি	আপন অর্জ্জিত ধনে চালাই সংসার,
পুত্তা চ মে সমানিয়া অরোগা,	পুত্রগণ নীরোগ সবল, নিন্দা কোন
তেসম্ ন সুনামি কিঞ্চি পাপম্,	তাহাদের নামে, শুনি নাই কাণে,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

(২) অস্সবা অলোলা।

অস্সবা = আশ্রবা, "বচনে স্থিতা"।

ইহার আর এক অর্থ হয় "অস্রবা" = non-corrup = সতী।

অলোলা = অচঞ্চলা।

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
৮। ভগবাঃ।	৮। বুদ্ধদেব।
নাহম্ ভতকোঽস্মি (৩) কস্সচি,	কারো নহি বৃত্তিভোগী, আপনার প্রভু,
নিব্বিট্‌ঠেন চরামি সব্বলোকে,	অবাধে আপন মনে ভ্রমি সর্ব্বলোকে;
অত্থো (৪) ভতিয়া (৫) ন বিজ্জতি,	দাসত্বে কি কাজ, বল মোর আজ,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
৯। ধনিয়ো গোপোঃ।	৯। ধনিয়া।
অত্থি বসা (৬) অত্থি ধেনুপা, (৭)	আছে গাভী দুগ্ধবতী, আছে বৎস কত,
গোধরণিয়ো পবেনিয়ো (৮) পি অত্থি,	গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও আছে হেথা,
উসভো পি গবম্পতি চ অত্থি;	বৃষভ গোপতি, আছয়ে তেমতি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
১০। ভগবাঃ।	১০। বুদ্ধদেব।
ন' অত্থি বসা, ন' অত্থি ধেনুপা	নাহি গাভী দুগ্ধবতী, না আছে বাছুর,
গোধরণিয়ো পবেনিয়োপি ন' অত্থি,	গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও নাহি মোর;
উসভো পি গবম্পতীধ ন' অত্থি,	নাহিও তেমতি, বৃষভ গোপতি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

(৩) ভতক=ভৃতক, বেতনভুক্, বৃত্তিভোগী।

(৪) অত্থো=প্রয়োজন।

(৫) ভতিয়া=ভৃত্যা, ভৃতি অর্থাৎ বেতন দ্বারা।

(৬) বসা=বৃষা, গাভী। (৭) ধেনুপা=বৎসগণ।

(৮) গোধরণীয়ো পবেনিয়ো=গরুর ধারণ বা আচ্ছাদনের জন্য প্রবেণি অর্থাৎ আস্তরণ বা কম্বল। ফজবোল সাহেব অর্থ করিয়াছেন—I have cows in calves & heifer, ইহার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।

পালি।

১১। ধনিয়ো গোপো।

খীলা নিখাতা অসম্পবেধী,
দামা মুঞ্জময়া নবা সুসণ্ঠানা,
ন হি সক্‌খিস্তি ধেনুপাপি ছেত্তুম্,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।

১২। ভগবাঃ।

উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি,
নাগো পূতিলতম্ ব দালয়িত্বা,
নাহম্ পুন উপেস্‌সম্ গব্ভ সেয়্যম্,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।

১৩ * * * * *

নিন্নঞ্চ থলঞ্চ পূরয়ন্তো,
মহামেঘো পাবস্‌সি তাবদেব,
সুত্বা দেবস্‌স বস্‌সতো,
ইমম্ অথম্ ধনিয়ো অভাসথঃ—

১৪

লাভাবত নো অনপ্পকা,
যে ময়ম্ ভগবন্তম্ অদ্দসাম,
শরণম্ তম্ উপেম চক্‌খুম্
সত্থা না হো হি তুবম্ মহামুনি।

১৫

গোপী চ অহঞ্চ অস্‌সবা,
ব্রহ্মচরিয়ম্ সুগতে চারমসে,
জাতি মরণস্‌স পারগা,
দুঃখস্‌স অন্তকরা ভবাম সে।

১৬। মারো পাপিমাঃ।

নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি,

বঙ্গানুবাদ।

১১। ধনিয়া।

সুদৃঢ়-নিখাত খীলা কিছুতে না টলে,
নব এই মুঞ্জদাম এমনি কঠিন,
বাছুরে ছিঁড়িতে নারে কোনরীতে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

১২। বুদ্ধদেব।

বৃষভ বন্ধন কাটি পলায় যেমতি,
যেমতি বিহরে নাগ বিদলি লতিকা,
প্রমুক্ত উদাস, কাটি গর্ভবাস,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

১৩ * * * * *

উচ্চ নীচ সর্ব্বস্থল করিয়া প্লাবন
বরষিল মহা মেঘ উঠিয়া তখন ;
দেখিয়া ধনিয়া, বিগলিত হিয়া,
বুদ্ধদেবে এই ভাবে করে নিবেদন,—

১৪। ধনিয়া।

সামান্য এ লাভ নহে, ওহে ভগবন্,
পাইনু যে ইথে মোরা তব দরশন
রাখ হে সুগতে, শরণ-আগতে,
ও পদে আশ্রয় আজি দেহ
মহামুনি।

১৫

আমি ও গৃহিণী মম, ধরি ও-চরণ,
ব্রহ্মচর্য্য আচরিব করিলাম পণ ;
জনম মরণ, কাটিয়ে বন্ধন,
তরি যাব, হবে সব দুঃখ বিমোচন।

১৬। পাপবুদ্ধি মার।

পুত্রবান্ পুত্রলাভে হয় পুলকিত,
গোপাল গোধন লাভে তেমনি
হর্ষিত ;

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
উপধী (১) হি নরস্স নন্দনা,	আসক্তি হইতে হয় নরের নন্দন,
ন হি সো নন্দতি যো নিরূপধী।	অনাসক্ত নিরানন্দে কাটায় জীবন।
১৭। ভগবাঃ।	১৭। বুদ্ধদেব।
সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা,	পুত্রবান্ পুত্রশোকে সদাই কাতর,
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি,	গোপাল গোধন তরে ব্যথিত অন্তর;
উপধী হি নরস্স সোচনা,	আসক্তিই মানবের দুঃখের কারণ,
ন হি সো সোচতি যো নিরূপধীতি।	অনাসক্ত জনে দুঃখ না হয় কখন।
ইতি।	ইতি।

(১) উপধি নিরূপধী :—

উপধি—বৌদ্ধ-দর্শনের ইহা একটি প্রয়োজনীয় শব্দ—ইহার অর্থ সংসার সম্পদ, ভেদক দ্রব্য, মায়া, আসক্তি।

উপধি = আসক্তি। নিরূপধী = অনাসক্ত।

২। তেবিজ্জ সুত্ত।*

(ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ।)

একদা বুদ্ধদেব বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে কোশলরাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 'মনসাকৃত' গ্রামে উপনীত হইলেন; গ্রামে পুষ্করসাতী, তারুখ্য প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর বসতি। তথায় তিনি অচিরাবতী নদীতীরস্থ এক আম্রবনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন।

সেই সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণযুবক তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা উভয়ে সত্যান্বেষী; ধর্ম্মালোচনায় অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের একজনের নাম বশিষ্ঠ ও অপরের নাম ভরদ্বাজ। বশিষ্ঠ যিনি, তিনি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন :—

মহাত্মন্, সত্যপথ কি, এ বিষয় লইয়া আমাদের মহা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, আমরা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমি বলি—যে পথ দিয়া ব্রহ্মের মিলন হয়, পুষ্করসাথী ব্রাহ্মণ যাহার উপদেশ দিয়াছেন সেই সত্যপথ; ইনি বলেন, ব্রহ্মবাদী তারুখ্য ব্রহ্মলাভের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। হে শর্ম্মণ, লোকে আপনাকে জগদ্গুরু বুদ্ধ বলিয়া জানে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই উভয় পথের মধ্যে কোন্ পথ ঠিক? এই ভিন্ন ভিন্ন পথ কি সকলি সত্য? এই মনসা-কৃত গ্রামে নানাদিক হইতে নানান রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইরূপ ঐ সমস্ত ধর্ম্মপথ কি সকলি আমাদিগকে গম্যস্থানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়? সকলি কি সরল সত্য পথ বলিয়া অনুসরণ করা যাইতে পারে?

বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বিবেচনায় এ সমস্ত পথই কি সোজা পথ? ঠিক পথ?

দুজনেই উত্তর করিলেন—হাঁ, আমরা তাহাই মনে করি।

বুদ্ধদেব কহিলেন—আচ্ছা, বল দেখি, সেই বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন, যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—তাঁহাদের গুরুর মধ্যে কি কেহ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন?

উত্তর—না।

---

* ত্রয়ীবিদ্যা সূত্র, Buddhist Suttas. Sacred Books of the East—Rhys Davids.

প্রশ্ন—অনেকানেক বেদরচয়িতা ঋষির নাম শ্রবণ করা যায়—যথা অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাঁহারা কি বলিয়াছেন—আমরা ব্রহ্মকে জানি, আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি?

ব্রাহ্মণেরা পুনর্ব্বার ইহার উত্তরে 'না' বলায়, বুদ্ধদেব দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'একটী কথা পাড়িলেন—

মনে কর, এই চৌরাস্তার মাঝখানে কোন এক ব্যক্তি একটী সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতেছেন—কিসের জন্য, না সেই সিঁড়ি দিয়া কোন এক বাড়ীতে উঠিতে হইবে। লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কৈ, বাড়ী কোথায়? যাহাতে চড়িবার জন্য এই সিঁড়ি নির্ম্মিত হইতেছে, সেই বাড়ী কোথায়? পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণে কি উত্তরে? ইহা ছোট, বড়, মাঝারি, কি আকারের বাড়ী? ইহা প্রাসাদ কি কুটীর? ইহার উত্তরে যদি নির্ম্মাতা বলেন, আমি তা জানি না, তখন লোকে কি তাহাকে উপহাস করিয়া বলিবে না, যে বাড়ীতে উঠিতে চাহ সে বাড়ী কোথায় তাহা জান না, সে বাড়ী কখন দেখ নাই, অথচ তাহার সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতে এত ব্যস্ত—এ কি কথা? ইহা কি বাতুলের প্রলাপ-বাক্য বলিয়া ধার্য্য হইবে না?

ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন—তাঁহার সে কথা পাগ্‌লামী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বুদ্ধদেব কহিলেন, যে ব্রহ্ম বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যাঁহাকে তাঁহারা জানেন না, যিনি তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর নহেন, ব্রাহ্মণেরা সেই ব্রহ্মের সহিত মিলন করাইয়া দিতে চান—সেই মিলনের পথ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের কথা কি বাতুলের প্রলাপবাক্য তুল্য অগ্রাহ্য নহে? তাঁহাদের ব্রহ্মোপদেশের কি কোন অর্থ আছে?

অন্ধ কর্ত্তৃক অন্ধ নীয়মান হইলে যাহা হয়, এও তাহাই। যে অগ্রগামী সেও কিছু দেখিতে পায় না, যে পশ্চাতে চলিয়াছে, সেও দেখিতে পায় না—ইহারাও সেই অন্ধের দল। বক্তাও অন্ধ, শ্রোতাও অন্ধ। এই সকল বেদবিৎ ব্রাহ্মণের উপদেশ সারহীন, অর্থহীন, তাৎপর্য্যশূন্য—কথাই সর্ব্বস্ব, তাহার কোন অর্থ নাই।

শোন বশিষ্ঠ, আর এক ব্যক্তি বলিতেছেন—এই নগরীর মধ্যে একটী পরমা সুন্দরী রমণী, যাহার জন্য আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। তাহার প্রতি আমার যে কি প্রগাঢ় প্রেম, কি অগাধ ভালবাসা, তাহা কি বলিব? লোকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এই পরমাসুন্দরী রমণী, যাহার জন্য তোমার মন এমন

চঞ্চল, এতই উতলা হইয়াছে,—এই রূপসী কিরূপ? ইনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—কোন্‌জাতীয়? ইনি কালো কি গৌরবর্ণ, ইহার নাম কি, নিবাস কোথায়?

ইহার উত্তরে যদি তিনি অন্ধকার দেখেন আর বলেন—আমি তা কিছুই জানি না, তখন লোকে কি তাঁহাকে উন্মাদ ভাবিয়া উপহাস করিবে না? তাঁহার কথা কি কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবে? কখনই না। পুনশ্চ মনে কর,—এই অচিরাবতী নদী বন্যার জলে ভরিয়া গিয়াছে—দুই পাড়ের উপর পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে—এমন সময়ে একজন কোন কার্য্যবশতঃ পরপার যাইবার ইচ্ছা করে। সে যদি নদীকে ডাকিয়া বলে, "হে নদী তোমার ও পারটা উঠাইয়া আমার কাছে নিয়ে এস",—তাহা হইলে কি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে?

ব্রাহ্মণেরা বলিল, "হে গৌতম, তাহা কখনই হইতে পারে না।"

বুদ্ধদেব কহিলেন,—তোমাদের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণদেরও এই দশা। যে সকল সদ্‌গুণ যথার্থ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ, তাহা তাহাদের অঙ্গে নাই, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব, তাহা হইতে তাহারা বিরত, অথচ তাহারা হে ইন্দ্র, হে সোম, হে বরুণ—ইন্দ্র সোম বরুণকে ডাকিয়া চীৎকার করে! এইরূপ প্রার্থনা, এই কাকুতি মিনতি, স্তবস্তুতির কি ফল? তাহাতে কি তাহাদের ইহলোকে ব্রহ্মলাভ হইবে, না মৃত্যুর পরে পর-লোকে ব্রহ্মের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে? এরূপ কি সম্ভব?

হে বশিষ্ঠ, আরো ভাবিয়া দেখ, এই নদী জলপ্লাবনে প্লাবিত হইয়াছে, পাড়ের উপর পর্য্যন্ত জল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কোন এক ব্যক্তি নদী পার হইতে চাহে, কিন্তু তার হাত পা কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধা, সে যদি এইরূপে শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া এ পাড়ে দাঁড়াইয়া ভাবে আমি নদী পার হইব, তাহা হইলে কি মনে কর তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে?

উত্তর—হে গৌতম, তাহা কখন হইতে পারে না।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাঁচটি শৃঙ্খলের কথা আছে, পঞ্চপাশ, পঞ্চবন্ধন, পঞ্চ আবরণ;—সে পাঁচটি কি কি?

কাম।

দ্বেষ, হিংসা।

অহংকার, আত্মাভিমান।

আলস্য।

বিচিকিৎসা—ধর্মের প্রতি সংশয়।

এই পঞ্চ মোহপাশ—পঞ্চ বন্ধন। এই বন্ধনে বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা আবদ্ধ, এই পঞ্চপাশে জড়িত হইয়া তাঁহারা চলৎশক্তি রহিত। হে বশিষ্ঠ, আমি সত্য বলিতেছি, এই ব্রাহ্মণেরা যতই বেদাভ্যাস করুন না কেন, কিন্তু যে সকল গুণে, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব, সে সকল গুণ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত, —সে সমস্ত অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাঁহারা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ। মোহপাশে জড়িত তাঁহাদের আত্মা দেহত্যাগানন্তর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবে, ইহা কদাপি সম্ভব নহে।

হে বশিষ্ঠ, তোমরা ত অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ, ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে তাঁহারা কি উপদেশ দেন?

ব্রহ্মের কি ধন-সম্পত্তি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে?

উত্তর—না।

ব্রহ্ম কি কাম ক্রোধে বিচলিত?

উত্তর—না।

তিনি কি দ্বেষ হিংসা পরবশ?

তিনি কি মদমাৎসর্য্য আলস্যের অধীন?

উত্তর—না।

তিনি সংযমী না ব্যসনী?

উত্তর—সংযমী।

তিনি পবিত্রস্বরূপ কি অপবিত্র?

উত্তর—পবিত্রস্বরূপ।

কিন্তু হে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-চরিত্র কি ইহার বিপরীত নহে?

তাঁহারা কি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন নহেন?

উত্তর—হাঁ।

তাঁহারা কি কামাসক্ত ক্রোধপরায়ণ নহেন?

উত্তর—হাঁ।

তাঁহারা কি দ্বেষ হিংসা বর্জ্জিত?

উত্তর—না।

তাঁহারা সংযমী অথবা বিলাসী?

উত্তর—বিলাসী।

তাঁহাদের অন্তরাত্মা পবিত্র না পাপ কলুষিত?

উত্তর—কলুষিত।

বুদ্ধদেব—ব্রাহ্মণেরা যখন সংসারাসক্তি হইতে বিমুক্ত হয় নাই, বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা যখন ইন্দ্রিয়সেবায় অহোরাত্র নিমগ্ন, কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মোহবন্ধনে আবদ্ধ—আর ব্রহ্ম, যিনি ইহার বিপরীত-ধর্ম্মা, তাঁহার সহিত মরণান্তর তাহারা মিলিত হইবে—ইহা কি কখন সম্ভব মনে কর? তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য কোথায়? আমি সত্য বলিতেছি এই সকল ব্রাহ্মণের উপদেশ ব্যর্থ, তাহাদের ত্রয়ীবিদ্যা পথশূন্য অরণ্য, নির্জ্জলা নিষ্ফলা মরুভূমি সমান। তাহাদের লক্ষ্য এক, কার্য্য অন্যরূপ। তাহারা তাহাদের গম্য স্থানে পৌঁছিবার প্রকৃত সরল পথ ছাড়িয়া বিপথে পদার্পণ করে, ও পথহারা পথিকের ন্যায় দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধদেব এইরূপ উপদেশ করিলে পর বশিষ্ঠ কহিলেন—

হে শর্ম্মণ, আমরা শুনিয়াছি—শাক্যমুনি সেই ব্রহ্ম-মিলনের পথ সম্যক্‌রূপে অবগত। আপনার নিকট হইতে আমরা সেই উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি—আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করুন, ব্রহ্মকুল উদ্ধার করুন।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

যে ব্যক্তি এই মনসাকৃত গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি এখানে আজীবন বাস করিতেছেন, তিনি কি এই গ্রামের তাবৎ পথঘাট বলিয়া দিতে পারেন না?

উত্তর—অবশ্যই পারেন।

এই পৃথিবীতে সেইরূপ তথাগত বুদ্ধ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন—তিনি বিজ্ঞানময়—মঙ্গল নিকেতন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ব্রহ্ম শর্ম্মন্ ব্রাহ্মণ—সুর, নর, মার, ভূত, প্রেত—সর্ব্ব চরাচর তিনি জানিতেছেন—সত্য তিনি নিজে জানিতেছেন এবং অন্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি জগদ্‌গুরু—সেই সত্য ধর্ম্ম তিনি জগতে প্রচার করেন—যে ধর্ম্মের আদি মধুর, অন্ত মধুর—মধুর যাহার গতি—যাহার উন্নতি মধুময়।

যখন কোন গৃহস্থ উচ্চবংশীয়ই হউন আর নীচকুলজাতই হউন—তথাগত-কথিত সত্য যখন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়—সে সত্য শ্রবণ করিয়া তিনি তথাগতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করেন—

সংসার কেবলই দুঃখময়—সংসারী ব্যক্তি মোহ-পাশে আবৃত বাসনাপঙ্কে নিমগ্ন—যিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, বায়ুর ন্যায় তাঁহার মুক্ত জীবন।

সংসারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারে পরিবৃত হইয়া, তিনি মহত্তর পবিত্রতর জীবনের স্বাদগ্রহে অক্ষম। অতএব অদ্য হইতে আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, শিরোমুণ্ডন ও ও গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রতে জীবন উৎসর্গ করিব।

এইরূপে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া, তিনি প্রাতিমোক্ষের নিয়মানুসারে আত্মসংযম অভ্যাস করেন। ইনি সত্যেতে রমণ করেন—ধর্ম্ম ইঁহার জীবনের ব্রত। ইনি পাপের কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ধর্ম্ম-নিয়মে নিয়মিত করেন—প্রত্যেক কথায় প্রতি কার্য্যে ইনি ধর্ম্মের আদেশ পালন করেন—ধর্ম্মপথ হইতে কদাপি বিচলিত হয়েন না। সাধু ইঁহার চরিত্র—ইন্দ্রিয়দ্বারের ঘাটেঘাটে শত শত প্রহরী নিযুক্ত—আত্মনির্ভর ইঁহার নির্ভর-যষ্টি—আত্মপ্রসাদে ইনি সদাই সুপ্রসন্ন—ইঁহার বিশুদ্ধ চিত্তক্ষেত্রে আনন্দের উৎস নিয়ত উৎসারিত হইতে থাকে।

সুগভীর ভেরীনিনাদ আকাশে উত্থিত হইয়া যেমন সহজে দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করে, ইঁহার প্রেমও সেইরূপ বিশ্বব্যাপী; ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ কাহাকেও ইনি অবহেলা করেন না—কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। ইঁহার প্রীতি, মৈত্রী, মমতা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিস্তৃত। সর্ব্ব জীবে ইঁহার দয়া বাৎসল্য। ইঁহার চক্ষে উচ্চ নীচে প্রভেদ নাই, আত্মপর সমান। ব্রহ্মলাভের এই একমাত্র পথ। যিনি সত্য অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন—দ্বেষহিংসা যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না—পবিত্র যাঁহার চরিত্র—কায়মনোবাক্যে যিনি ধর্ম্মের অষ্টবিধ মহামার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন—সেই যে ভিক্ষু সাধু পুরুষ, ব্রহ্মের সহিত তাঁহার জীবনের সাদৃশ্য আছে কি না?

উত্তর—অবশ্যই আছে।

এই ভিক্ষু সাধু পুরুষ দেহত্যাগানন্তর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব।

বুদ্ধদেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন—

হে প্রভো। আপনার এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম, যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহা আপনি গড়িয়া তুলিলেন—যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা প্রকাশ করিলেন—যে বিপথগামী তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিলেন—অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়া অন্ধকে চক্ষু দান করিলেন। প্রভো! আমরা বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি—ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতেছি—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—বৌদ্ধভ্রাতৃবর্গের শরণাপন্ন হইতেছি। অদ্য হইতে আমাদিগকে আপনার চিরভক্ত শিষ্যরূপে দীক্ষিত করিয়া কৃতার্থ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

ব্যাখ্যা

বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে সহজেই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়—ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত ও বিশ্বাস কি ছিল? তৎকালে প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধই বা কিরূপ ছিল? উল্লিখিত সূত্র হইতে এই প্রশ্নের উত্তর কিয়দংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ যুবকেরা মৃত্যুর পরে ব্রহ্মের সহিত মিলনের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, অর্থাৎ বৈদান্তিক মতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গিয়া, সে ব্রহ্মেতে কিসে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সরল পথ তাঁহারা জানিতে চাহেন—গৌতমের প্রতি তাঁহাদের প্রশ্নও তদনুযায়ী। বুদ্ধদেব যে উপায় বলিয়া দিলেন, যে পথ প্রদর্শন করিলেন, তাহা ধর্ম্মনীতিসূচিত সহজ মার্গ। আত্মসংযম—বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন—সন্ন্যাসগ্রহণ—চরিত্রশোধন—সার্ব্বভৌম মৈত্রী মমতা—এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মলাভের কোন ঐন্দ্রজালিকা উপায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

এই সূত্রে ব্রহ্মের সহিত মিলনের কথা, যাহা প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? বৌদ্ধধর্ম্মমতে তাহার অর্থ ঠিক করা সহজ নহে। ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, বুদ্ধের সময় পৌরাণিক ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই। বেদান্ত ও উপনিষদের ব্রহ্ম আর বৌদ্ধ ব্রহ্মা যে একই, এমনও মনে করিবেন না। নাম এক হইতে পারে, কিন্তু ভিন্নার্থে প্রয়োগ সন্দেহ নাই। আর্য্যধর্ম্ম প্রকৃতি-পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ মঞ্চে এক ব্রহ্মের উপাসনায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে এই বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসনার ভাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার কথা দূরে থাকুক, বৌদ্ধধর্ম্ম দেহাভ্যন্তরে আত্মার পৃথক সত্তাই স্বীকার করেন না, অথচ দেখিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস তাহার মধ্যে কতক অংশে স্থান পাইয়াছে—এই দুই ভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন ভাবের সামঞ্জস্য করা এক বিষম সমস্যা।

বৈদিক দেবতাগণ বৌদ্ধধর্ম্মে সাধুপুরুষের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাহার উর্দ্ধে পদনিক্ষেপ করেন না।—বড় জোর তাঁহারা বৌদ্ধ-ভিক্ষুর সমকক্ষরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। এই সকল দেবতার আরাধনা পূজার্চ্চনা বৌদ্ধধর্ম্মে আদিষ্ট হয় নাই। দেবতারা অমর নহেন, অন্যান্য জীবের ন্যায় তাঁহারাও মরণধর্ম্মশীল। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মগুণে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়া ক্রমে নির্ব্বাণরাজ্যে—হয়ত বৌদ্ধ অর্হৎ-মণ্ডলীর মধ্যে স্থান পাইতে পারেন। ব্রহ্মাও সেইরূপে কল্পিত। অপর জীবের ন্যায় তিনিও মৃত্যুর অধীন—তিনিও বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট সন্মার্গ অবলম্বন করিয়া, কালক্রমে নির্ব্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী।

সে যাহা হউক, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধমতে ব্রহ্ম ইতরজীব অপেক্ষা বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত সুরবৃন্দের মধ্যে যেমন সুরপতি দেবেন্দ্র। কথিত আছে যে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মে যখন কাশ্যপবুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা সাহক নামক পরম ভক্ত ভিক্ষু

বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতক টীকাকার বলেন যে, ব্রহ্মা বুদ্ধদেবের ভবিষ্যৎ জন্মধারণ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহবান ছিলেন, এবং তৎপরে বোধিসত্ত্বের জীবনে 'মার' রাক্ষস যখন তাহাকে অশেষ প্রলোভন ও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া ঘোরতর বিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই 'মার' দমনে ব্রহ্মা দুইবার সহায়তা করেন। 'মার' বিজয়ের পর যখন বুদ্ধদেব তাঁহার উপার্জ্জিত সত্য প্রচারে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া সে সংশয় ভঞ্জন করত, তাঁহাকে সত্য ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত করেন। আবার কথিত আছে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালে যে গগনভেদী গভীর শোকধ্বনি সমুত্থিত হয়, ব্রহ্মা সহাম্পতির কণ্ঠ হইতে প্রথমে সে বাণী উদ্গীরিত হইয়াছিল, ও পরবর্ত্তী কালে একবার বৌদ্ধধর্ম্ম-সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধনেতৃবর্গের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনপূর্ব্বক সে বিপ্লব প্রশমন করেন।

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বৌদ্ধজগতের সহিত ব্রহ্মার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। শুধু এই মর্ত্ত্যলোক নয়, কিন্তু অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে যে লোক-পুঞ্জ অবস্থাপিত, এক একজন ব্রহ্মা তাহার অধিপতিরূপে কল্পিত দেখা যায়।

এই ব্রহ্মার সহিত মিলন আর বৈদান্তিক ব্রহ্মেতে জীবাত্মার বিলীন হইবার ভাব যে একই, তাহা কে বলিবে? বৌদ্ধমতে সে মিলনের অর্থ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত একত্র সহবাস ভিন্ন আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই সহবাস-লাভ বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ নহে; বৌদ্ধমতে মনুষ্যজীবনের পরম গতি—চরম লক্ষ্য স্বতন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের সার উপদেশ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কর্ম্মগুণে, নিজ পুণ্যবলে, আত্মপ্রভাবে, স্বার্থবিসর্জ্জনে, সত্যোপার্জ্জনে, প্রেম, দয়া, মমতা বর্দ্ধনে, ইহজীবনে অথবা পরলোকে নির্ব্বাণরূপ পরমপুরুষার্থ সাধনে সমর্থ।

এই নির্ব্বাণমুক্তি কি—আলো কি অন্ধকার—জাগরণ কি মহানিদ্রা—অনন্ত-জীবন কিম্বা চিরমৃত্যু—শাশ্বত-আনন্দ অথবা চেতনাশূন্য মহানির্ব্বাণে জীবাত্মার অস্তিত্বলোপ;—এই নির্ব্বাণ মুক্তি কি? বৌদ্ধশাস্ত্রে সিন্ধু মন্থন করিয়া আপনারা তাহা স্থির করুন—আমি এইখানে এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।*

---

* এই ব্যাখ্যার ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, Rhys Davids 'তেবিজ্জ সুত্তের' টীকায় সেইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রের বুদ্ধ-কথিত ভাগে ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ঠিক বলা যায় না—মূল পালি না দেখিয়া ইহার মীমাংসা হয় না, কিন্তু ব্রহ্মা শব্দ ব্যবহৃত হইলেও—ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া—এই তত্ত্বে যে বুদ্ধের নিজের বিশ্বাস তাহা সপ্রমাণ হয় না। তিনি ব্রাহ্মণদের কথার সত্যতা ধরিয়া নিয়া ক্ষমতানুযায়ী ধর্ম্মপথ দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।